গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর গানের কাব্যমূল্য

খান আসাদুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খান আসাদুজ্জামান কর্তৃক উপস্থাপিত “গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর গানের কাব্যমূল্য” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. রফিকউল্লাহ খান)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ ও বিবর্তনে সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬) এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯)। বাংলা গানের বাণীবিন্যাসে তাঁরা যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের গীতবাণী থেকে দীক্ষা নিয়েই তাঁরা এই দুই শিল্পস্রষ্টার গীতবলয় থেকে মুক্তির জন্য সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মূল্যায়ন করে যে নতুন সঙ্গীতাদর্শের সন্ধান করেছেন, তাতে মূল্যবোধ-বিপর্যস্ত মানুষের নৈরাশ্যের পরিবর্তে প্রবল আশাবাদী উচ্চারণই প্রধান হয়ে উঠেছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভা আধুনিক জটিল বিশ্বব্যবস্থায় বিপন্ন মানুষের গতিশীল জীবন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁদের জীবন কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। সমকালীন ঘটনাবলি, ব্যক্তিক সংকট ও জৈবনিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁরা গীতবাণী সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এই দুই মহান শিল্পস্রষ্টার গীতবাণী দুর্যোগ-দুর্দিন-নৈরাশ্যেও পাঠক-শ্রোতার মনে আশার সঞ্চার করে, নতুন করে স্বপ্ন দেখার প্রেরণা জোগায়। তাঁদের গীতবাণীর নিহিতার্থে মনোযোগ দিলে লক্ষ করা যাবে, তাতে ইতিবাচক জীবনার্থ অন্বেষণের প্রয়াসই প্রবলভাবে প্রতীয়মান।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সদর্থক জীবনদৃষ্টি ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে জীবনকে পর্যবেক্ষন করেছেন এবং তারই প্রকাশ তাঁদের গীতবাণীতে লক্ষ করা যায়। সঙ্গীত ও জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে অপরিশুদ্ধ ভাবাবেগ থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাঁরা নিমজ্জিত হননি সরল তরল গীতধর্মিতায়, কিংবা কেবল মননঋদ্ধ উচ্চারণেও আচ্ছন্ন নয় তাঁদের সৃজনভুবন। বরং এই দুই ধারার সফল সমন্বয় করে তাঁরা নির্মাণ করেছেন এমন এক সঙ্গীতভাষা যা তাঁদেরকে জনতার গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সঙ্গীতের বাণীকে তাঁরা প্রতিদিনের পরিচিত আবহে এমন এক অবয়ব দিয়েছেন, যা তাঁদেরকে পৌছে দিয়েছে মাটি ও মানুষের কাছে। গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফলতার পেছনে সক্রিয় থেকেছে যে শিল্পদৃষ্টি ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য, বর্তমান অভিসন্দর্ভে তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত কোন সস্তা ব্যাপার নয়। এতে ঐতিহ্য-পরম্পরার অনুসৃতি যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি প্রচল কাঠামোকে স্বীকরণ করে অভিনবত্বের অনুসন্ধানও যে কোন সৃজনশীল প্রতিভার সহজাত প্রবণতা। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অর্জন এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট কবিমানসকে প্রভাবিত করে বলেই যে-কোন কবির বা গীতিকারের কবিতার বা গীতবাণীর স্বরূপ-সন্ধানে কবির পূর্ববর্তী শিল্পস্রষ্টাদের অবদান এবং স্বকালের প্রতিভাবান স্রষ্টাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'আধুনিক বাংলা গানের পটভূমি' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে তাই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিল্পভাবনা নির্মাণে অতীতের ধারাবাহিকতায় সমসাময়িক শিল্পসাহিত্য এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

‘গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ’ শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুই প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টার মানস-সংগঠনের মৌলসূত্র অন্বেষণের প্রয়োজনে তাঁদের সমগ্র জীবনকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষাজীবনের নানা পটপরিবর্তন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পবিশ্বাসকে কীভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

‘গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয়বৈচিত্র্য’ শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে এই দুই গীতবাণীস্রষ্টার গানের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয় বিশেণ্টষণের প্রয়োজনে প্রধান প্রবণতার আলোকে গানগুলোকে শ্রেণীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর আলোচনা-সাপেক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক কতিপয় গানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের মানসগঠনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়াস লক্ষ করা যাবে।

‘গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের শিল্প-প্রকরণ’ শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়কেপাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে গৌরীপ্রসন্ন এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টির আলোকে তাঁদের প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ ‘অলঙ্কার’। এই পরিচ্ছেদে গৌরীপ্রসন্ন এবং পুলকের গীতবাণীতে ব্যবহৃত বিবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার যেমন অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত ইত্যাদি নির্দেশ করে তাঁদের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত শিল্পদৃষ্টির নানা প্রান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ‘চিত্রকল্প’-র লক্ষ্য শব্দপ্রতিমা নির্মাণে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য স্বাতন্ত্র্য শনাক্ত করা। রোমান্টিক ভাবাদর্শের বাকপ্রতিমা সৃজনে তাঁদের কৃতিত্বও এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে কবির জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ এবং প্রতীকের দূরসঞ্চারী আলোক প্রক্ষেপে তাঁদের সৃজনভুবন কীভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়েছে তা-ই আলোচনা করা হয়েছে ‘প্রতীক’ শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদে। গৌরীপ্রসন্ন মমুজদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক গীতবাণী সৃষ্টিতে উজ্জ্বল অবদান রাখলেও যুগোত্তীর্ণ প্রেমের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের তাঁরা শরণ নিয়েছেন। ভারতীয় পুরাণের পাশাপাশি লোকপুরাণ বা লোকাকাহিনীর নানা অনুষঙ্গে তিনি মূলতঃ সমকালীন জীবনবাস্তবতাকেই চিত্রিত করেছেন। এই চিত্রায়ণের নানা দিক, সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশিত হয়েছে ‘পুরাণ’ শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদে। পঞ্চম

পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'ছন্দ' যেখানে গৌরীপ্রসন্ন ও পুলকের ছন্দভাবনার বিভিন্ন কৌশল, প্রসঙ্গ ও প্রবণতা আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান-বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এই দুই শিল্পস্রষ্টা আধুনিক বাংলা গানে অসামান্য অবদান রাখলেও তাঁদের কৃতিত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বা আলোচনা নেই বললেই চলে। তাই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তাঁদের অবদান বিষয়ে নানাজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং গৌরীপ্রসন্ন ও পুলকের পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের চৌম্বক অংশ এই অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। কিছু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থে গৌরীপ্রসন্ন এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সামান্য আলোচনা পাওয়া গেছে, যা এই অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি আলোকচিত্রও সংযুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে 'গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নির্বাচিত গান সংকলন' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে 'পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গান সংকলন'। আমরা মনে করি, গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার এবং পুলক বন্দোপাধ্যায়ের গীতবাণীর গভীরতা এবং বৈচিত্র্য অনুধাবনে এই গীতবাণীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বর্তমানে গবেষণাকর্মে গীতবাণীর কাব্যমূল্য বিচারের প্রয়োজনে অনেক গানেরই আংশিক উদ্ধৃতি করা হয়েছে। এই দুই গীতস্রষ্টার 'নির্বাচিত গান সংকলন' থেকে পূর্ণাঙ্গ গানটি বিবেচনা করা যাবে।

সবশেষে, 'উপসংহার' পর্বে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়বৈচিত্র্য এবং প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ, প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত বিষয়ের মৌল সূত্রগুচ্ছ উপস্থাপিত হয়েছে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সঙ্গীতসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের নিবিড় চর্যা ও চর্চায় এক সমৃদ্ধ গীতবাণীভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তাঁরা, যার অস্থিমজ্জায় স্বকালের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা চিত্রিত হলেও তাতে মানবমনের চিরন্তন অভিব্যক্তিই শিল্পসংহতি লাভ করেছে। কিন্তু তাঁদের গীতবাণী গ্রন্থকারে যা প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁদের সৃষ্টিসম্ভারের তুলনায় খুবই সামান্য। তবু এই দুই গীতবাণীস্রষ্টার গানের বিষয় বা শৈলি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহ তাঁদের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

গীতিবাণীর কাব্যমূল্য বিচারে আমরা বিষয় ও শিল্প-দুই দিকেই মনোযোগ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। ভাব ও ভাষার বন্ধন বিবেচনা করেই একজন কবির শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আধার ও

আধেয়ের যোগ এমন নিবিড় যে এর কোন একটির স্বতন্ত্র আলোচনায়ও অন্যটির উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই এই গবেষণাপত্রে বিষয়বৈচিত্র্য ও কাব্য-প্রকৌশল পাশাপাশি আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মূলপাঠ (text) হিসেবে দুটি গ্রন্থ গৃহীত হয়েছে। প্রথমটি গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা ১৯৯২ সাল, সম্পাদক শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, দ্বিতীয়টি গৌরীপ্রসন্ন গীতিসমগ্র, প্রথম খণ্ড, অসীমা প্রকাশনী, ২০০৩, কলকাতা, সম্পাদক শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতাবাণীর মূলপাঠ (text) গৃহীত হয়েছে এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা থেকে ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আমার প্রিয় গান' গ্রন্থ থেকে। গীতবাণীর উদ্ধৃতি শেষে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে গ্রন্থের গীতবাণী স্রষ্টার নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর নির্দেশ করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে বানানের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি অনুসরণ করা হলেও উদ্ধৃতিগুলোতে পূর্বসুরি লেখকদের নিজস্ব রীতিই রাখা হয়েছে। গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, অত্র গবেষণা তাঁদেরই নানামুখি গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণশীল দিক-নির্দেশনার উত্তরাধিকার।

প্রতিকূল বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে যথেষ্ট সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বানান ভুলসহ কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। সে- জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রর্থী ।

২

এই অভিসন্দর্ভ রচনার নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান গবেষণাকর্মটি তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনসহ অভিসন্দর্ভ রচনার সকল পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ধারণার সাহচর্য এবং শিল্পরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা আমার গবেষণারকর্মকে সাবলীল ও সহজতর করেছে। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণার প্রথম পর্যায়ে যৌথভাবে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, আমি তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমার সেমিনারে উপস্থিত থেকে এবং বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে আমাকে উপকৃত করেছেন। বিশেষ

করে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক ফাতেমা কাওছার, ড. মো. গোলাম আজম, জনাব চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিব ও জনাব সোহানা মাহবুব স্যারের বিজ্ঞ মতামত ও নির্দেশনা অভিসন্দর্ভ রচনায় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ প্রসংগে বিভাগীয় সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা এবং বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল- এর আন্তরিক সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

এই গবেষণাকর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনের গত ২০১১ সালের জুলাই মাসে আমাকে ভারত যেতে হয়। সেখানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তাঁরা হলেন গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের সভাপতি প্রিয়তোষ স্বরস্বতী, সহ সভাপতি দীপক সেনগুপ্ত, সম্পাদক কমল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট গৌরীপ্রসন্ন গবেষক শচীদুলাল দাশ, গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য কালজয়ী গানের সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ প্রমূখ। পিতা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানের বাণী সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। এ ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা করেন গৌরীপ্রসন্নের চাচাতো ভাই শিলাদিত্য মজুমদার। এ প্রসংগে বলতে চাই, শিলাদিত্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক আতিথেয়তার কথা আজীবন মনে থাকবে। এ মুহূর্তে তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার পরামর্শ কাজে নানা তথ্য উপাত্ত, উপাদান, মতামত ও যাবতীয় সহযোগিতা করে পরিণত পথে এগিয়ে নিতে যাঁদের উদ্‌যোগ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ‘সফেন’- এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যাংকার ডাঃ অনিশ কুমার সরকার, ডেসকোর সাবেক মহাব্যবস্থাপক বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম চৌধুরী, সরকারী তীতুমীর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ কে এম জাফর হোসেন, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক জুরাইন ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন -এর সত্ত্বাধিকারী জনাব রফিকুর রহমান মাহ্‌মুদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও কবি ড. তারেক রেজা, বন্ধু প্রতীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের প্রভাষক, কবি ও সংগীত শিল্পী ড. সাইম রানা, নূরুন্নেছা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও সংগীতশিল্পী জনাব খান মোঃ কামরুজ্জামান, পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সংগীতশিল্পী জনাব দেবাশীষ বসু প্রমূখ গুনী জনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণাকর্মটি কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণবিন্যাসের অত্যন্ত দুরূহ কাজটি সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে যারা কঠোর পরিশ্রম করেছে তারা হলো আমার অনুজপ্রতীম মোহাম্মদ মহসিন

হোসেন খান, মো. মিজানুর রহমান রুবেল ও মো. হাবিবুর রহমান। ওদের সাথে সম্পর্কটা আমার ধন্যবাদের নয়।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পিতা আলহাজ্ব খান আখতারুজ্জামান- কে, যিনি অভিসন্দর্ভ রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্র বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে গবেষণাকর্মে অবিচল রেখেছেন। এই মুহূর্তে খুব মনে পড়ছে আমার দাদী-মা মোসাম্মাৎ খাদিজা বেগম- কে, মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃ-বিয়োগের পর যিনি মায়ের মমতা আর অপরিসীম স্নেহ দিয়ে আমাকে বড় করে তুলেছেন, উচ্চ শিক্ষা লাভের স্বপ্ন এবং আকাংখাকে জাগিয়ে তুলেছেন। আজ দাদী-মা নেই, তবে আজকের এই অভিসন্দর্ভ রচনার ভিত্তি প্রস্তর তিনিই রচনা করে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর প্রতি এ ঋণ ও কৃতজ্ঞতা আমার জন্ম-জন্মান্তরের।

আরো একজনের অন্তহীন উৎসাহ, ত্যাগ ও নিরন্তর সহযোগিতা ছিল আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম শ্রম-উৎস; যিনি সংসারের কঠিন দায়িত্ব এবং নিজের পেশাগত কর্তব্য পালনের মাঝেও এই গবেষণাকর্ম সচল রাখতে আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি মাকসুদা আকতার খানম, আমার জীবন সংগ্রামের নিত্য- সহযাত্রী। সেই সাথে উল্লেখ করছি সময় ও সান্নিধ্যবঞ্চিত আমার আত্মজাদ্বয়- ‘ঐশ্বর্য’ ও ‘ঐশিকা’-কে। ওদের সে ত্যাগও কম কিছু নয়।

ঢাকা

জানুয়ারি, ২০১৫ (খান আসাদুজ্জামান)

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় (১০-২২)

আধুনিক বাংলা গানের পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায় (২৩-৪৯)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ

তৃতীয় অধ্যায় (৫০-৮৩)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক ববন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয়বৈচিত্র্য

চতুর্থ অধ্যায়

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের শিল্প-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ (৮৫-১০৫)

অলঙ্কার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১০৬-১২২)

চিত্রকল্প

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১২৩-১৫৭)

প্রতীক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (১৫৮-১৮৭)

পুরাণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১৮৮-১৯৭)

ছন্দ

পঞ্চম অধ্যায় (১৯৮-২৬০)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান-বিষয়ে

মাঠ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযোজন

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ (২৬১-৩৩৮)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের নির্বাচিত গান সংকলন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৩৩৯-৪০৮)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গান সংকলন

উপসংহার (৪০৯-৪১৪)

গ্রন্থপঞ্জি (৪১৫-৪২৩)

Dhaka University Institutional Repository

G¨ve÷v±

wcGBP wW Awfm›‘‡fi wk‡ivbvg

†MŠixcmb gRg‘vi I cjK e‡›‘¨vcva¨vq -Gi Mv‡bi Kve¨gj¨

M‡elK :

Lvb Avmv‘¾vgvb

†iwR‡÷kb bs- 138, wk¶vel 2008-2009

cb: †iwR‡÷kb bs- 163, wk¶vel 2013-2014

evsjv wefvM, XvKv wekwe‘¨vj

Dhaka University Institutional Repository

GB g‡g cZ¨qb Kiv hv‡"Q †h, Lvb Avmv'¾vgvb KZK Dc¯wcZ Ò‡MŠixcmb gRg'vi I cjK e‡›'¨vcva¨vq -Gi Mv‡bi Kve¨gj¨Ó kxlK Awfm›'fwU Avgvi ZËveav‡b iwPZ| GB Awfm›'f ev Gi †Kv‡bv Ask M‡elK Ab¨ †Kvb cwZôv‡b ev wekwe'¨vj‡q wWwMi Rb¨ Dc¯vcb K‡ibwb|

(W. iwdKDjøvn Lvb)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ ও বিবর্তনে সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬) এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯)। বাংলা গানের বাণীবিন্যাসে তাঁরা যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের গীতবাণী থেকে দীক্ষা নিয়েই তাঁরা এই দুই শিল্পস্রষ্টার গীতবলয় থেকে মুক্তির জন্য সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মূল্যায়ন করে যে নতুন সঙ্গীতাদর্শের সন্ধান করেছেন, তাতে মূল্যবোধ-বিপর্যস্ত মানুষের নৈরাশ্যের পরিবর্তে প্রবল আশাবাদী উচ্চারণই প্রধান হয়ে উঠেছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভা আধুনিক জটিল বিশ্বব্যবস্থায় বিপন্ন মানুষের গতিশীল জীবন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁদের জীবন কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। সমকালীন ঘটনাবলি, ব্যক্তিক সংকট ও জৈবনিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁরা গীতবাণী সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এই দুই মহান শিল্পস্রষ্টার গীতবাণী দুর্যোগ-দুর্দিন-নৈরাশ্যেও পাঠক-শ্রোতার মনে আশার সঞ্চার করে, নতুন করে স্বপ্ন দেখার প্রেরণা জোগায়। তাঁদের গীতবাণীর নিহিতার্থে মনোযোগ দিলে লক্ষ করা যাবে, তাতে ইতিবাচক জীবনার্থ অন্বেষণের প্রয়াসই প্রবলভাবে প্রতীয়মান।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সদর্থক জীবনদৃষ্টি ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে জীবনকে পর্যবেক্ষন করেছেন এবং তারই প্রকাশ তাঁদের গীতবাণীতে লক্ষ করা যায়। সঙ্গীত ও জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে অপরিশুদ্ধ ভাবাবেগ থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাঁরা নিমজ্জিত হননি সরল তরল গীতধর্মিতায়, কিংবা কেবল মননঋদ্ধ উচ্চারণেও আচ্ছন্ন নয় তাঁদের সৃজনভুবন। বরং এই দুই ধারার সফল সমন্বয় করে তাঁরা নির্মাণ করেছেন এমন এক সঙ্গীতভাষা যা তাঁদেরকে জনতার গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সঙ্গীতের বাণীকে তাঁরা প্রতিদিনের পরিচিত আবহে এমন এক অবয়ব দিয়েছেন, যা তাঁদেরকে পৌছে দিয়েছে মাটি ও মানুষের কাছে। গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফলতার পেছনে সক্রিয় থেকেছে যে শিল্পদৃষ্টি ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য, বর্তমান অভিসন্দর্ভে তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

AvawbK evsjv Mv‡bi cUf‚wg

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ উপন্যাসের শুরুতেই আমরা লক্ষ করি, অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনের নানা আয়োজনের খবর জানাচ্ছেন তিনি। যদিও পাঠক হিসেবে আমরা জানি, পুরো উপন্যাসে অবিনাশ ঘোষালের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো নয়। তবুও এই গল্পের গভীরতর তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন লেখক। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো'। (২০০৬ : ৫/৩৩৯)। সন্ধ্যার প্রদীপ আলোক সঞ্চারে কতোটা সার্থকতার স্বাক্ষর রাখবে, তা অনেকাংশে সকালের সলতে পাকানোর প্রকৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বর্তমান গবেষণাকর্মে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের কাব্যমূল্য বিচারে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাই আধুনিক বাংলা গানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

আমরা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে লক্ষ করবো, বাঙালির সমাজ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ওই পর্যায়ে পূর্ব গৌরব হারিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারের পরিসমাপ্তি তো অন্ধকারে হতে পারে না। আলো জ্বালানোর তীব্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হয়। বাঙালিকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরানোর জন্য সেই সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল কয়েকজন যুগান্তকারী মনীষীর। চিরস্মরণীয় অগ্রদূতগণ হলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৮২), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) প্রমুখ। এই প্রবল প্রতিভাধর ও যুগান্তকারী মনীষীগণের 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়' এর প্রতিভাসে অগণিত বাঙালির নব-জন্মান্তর হয়েছিল সেই সময়ে। ফলে বাঙালির চেতনায়, সমাজে, শিক্ষায়, ধর্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই নবজাগরণ এবং এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় থাকলেও, মানতেই হবে উনিশ শতক বাঙালির যুগান্তর কাল। মনীষীগণ এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ অনুগামীগণের মাধ্যমে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বাংলায়। এই নবজাগরণের মাধ্যমে জাগ্রত হয়েছিল পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং প্রাচ্যাভিমান। এভাবেই স্বদেশ-চেতনার এবং জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। উনিশ শতকের যুগান্তরকালে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা গেলেও, সংগীতের ক্ষেত্রে বাঙালি অচলায়তনেই বন্দি ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দ্রোহভাবনায় এবং সংগীতনায়কত্বে বাংলা গান সে সময়ে উচ্চাঙ্গসংগীতের কঠোর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে বাণীবদ্ধ করেছেন, আর যা-কিছু তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে তার অমৃত-আস্বাদকেও তিনি আনন্দের সঙ্গেই শিল্পের অবয়ব দিয়েছেন। সাহিত্যের সকল পথেই তাঁর পায়ের চিহ্ন প্রবল এবং প্রাতিস্বিক। পাঠের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালির প্রাণের মানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-বিশ্বের যে সৌরভ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেখানে তিনি তারও বেশি কিছু, আমাদের প্রাণাধিক শিল্পস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্যও তাই এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> শব্দের অনিবার্য সঞ্চয়ে কবিতার যে-আবেগ চেতনার উপরিতলে দোলা দেয়, গানে তা-ই মর্মের মাঝখানে অনায়াসে ঠাঁই করে নেয়। গানের সুরে আছে সেই ধ্বনি যা সহজে সহৃদয়ের কাছে নানা ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে বারবার। সেজন্যেই সাধারণত গানের বাণীকে সুর থেকে আলাদা করলে একটি নিষ্প্রাণ কাঠামো ছাড়া কিছুই মেলে না। বোধ করি, কেবল রবীন্দ্রনাথের গানই ব্যতিক্রম। তার যেসব গানের সুর এখনো আমার অশ্রুত, তাদের মূল তাই আমার কাছে কিছু মাত্র কম নয়। নিছক কবিতা হিসেবে পড়লেও যে-অন্তর্গত সুর গুনগুনিয়ে ওঠে আমার সকল চৈতন্যে, অনেক প্রসিদ্ধ সংগীতকারের সৃষ্টিতেও তেমন অনুরণন জাগে না। হয়তো সে আমার অক্ষমতা, অসামর্থ্য; কিন্তু সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের জয়। তিনি পাষাণেও অনর্গল ফলগুধারা বইয়ে দিতে পারেন। তার প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা ও পরিণামের সাথে অভিন্ন সম্পর্কে মুহূর্তেই আমি আন্দোলিত হয়ে উঠি। এবং বারবার। এমনি তীব্র ও অব্যর্থ সেই সংগ্রাম। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৯১ : ২৪২)

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বজোড়া হলেও নিজের অন্তর্গত উপাসনা ও উপলব্ধি তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। গীতসুধার জন্য আমৃত্যু তৃষিত ছিলেন তিনি। এই তৃষ্ণা নিবারণের নানা আয়োজনের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পিসত্তার মৌলকাঠামো। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন।' (সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৭ : ২৬)। বলার অপেক্ষা রাখে না, রবীন্দ্রনাথের পাঠক যত, তার চেয়ে তাঁর শ্রোতার সংখ্যা অধিক। এমন কোন বাঙালি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার কান সক্রিয় অথচ রবীন্দ্রনাথকে শ্রবণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কাব্যসংগীত তথা আধুনিক বাংলা গানই সমকালে এবং পরবর্তীকালেও বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পগণকে অনুপ্রাণিত করেছে নব সৃষ্টির জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্বসূরি মনীষীগণকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, তেমনই বাংলা গানের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-

বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এতো বৈচিত্র্য আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। তাঁর শোনা প্রাচীন বাংলা গান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এ অত্যন্ত বাঙালির গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচেনি। বাঙালির প্রাণের সঙ্গে গানের সম্পর্ক যে কতো গভীর ও বিবিড় তা রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোন বাঙালি শিল্পস্রষ্টা অনুভব করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতস্রষ্টা হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট আমাদের বিবেচনায় রাখা দরকার। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তাই তাঁর মানসকাঠামো নির্মাণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক:

> জোড়াসাঁকের ঠাকুর পরিবার ছিলেন সংগীতের যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীত নয়, প্রাচীন বাংলা গানেরও সমাদর ছিল এই পরিবারে। সে জন্য ছোটবেলা থেকেই দুই ধারার গান শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথের সংগীতানুরাগই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, তাঁর অন্তলীন স্রষ্টা সত্তারও ঘুম ভেঙ্গেছিল অতি অল্প বয়সে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং লোকসংগীত ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ব্রহ্মসংগীত, বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। ‘ব্রহ্মসংগীত’- এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত পদ্ধতিই (শুদ্ধ এবং একটি রাগে সুর নির্মাণ) অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গানের বাণী ও ভাব প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনে, একটি বিশেষ রাগে আবদ্ধ থাকার প্রচলিত ও কঠোর নিয়মে শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে তাঁর স্রষ্টা সত্তা সম্মত ছিল না। নবসৃষ্টি সুগভীর আর্তি তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই আলোড়নই তাঁর মনে দ্রোহভাবনা জাগিয়েছিল। কেন বাংলার সমস্ত গানকে উচ্চাঙ্গসংগীতের কঠোর নিয়ম শৃংখলিত থাকতে হবে? সুরের আধিপত্য মানার জন্য কেন বাণী হবে অবহেলিত? অথচ বাংলার নিজস্ব সংগীতে চিরদিনই তো বাণীর সমাদর! তবে কেন নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া? (জয়তী গঙ্গোপাধ্যায় ২০০৯ : ১৮)

রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটি, দেশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি জানতেন মাটির সঙ্গে সংযোগ না থাকলে কোনো সংস্কৃতিই বেশিদিন বাঁচতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত যেন একটি গাছের ফুলের মত। কোনো এক বিশেষ বাগানের মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে গাছটি তার ফুলের সৌরভ বিস্তারিত করে দেয় সীমাহীন আকাশের দিকে। কিন্তু প্রাণরস সে আহরণ করে সেই বাগানের মাটি থেকেই। সঙ্গীতের সৌরভও তেমনি সার্বজনীন, চিরকালীন এবং সীমাহীন; কিন্তু তারও প্রাণরস আসবে এক বিশেষ দেশ ও কালের মাটি থেকেই। এই মাটির সঙ্গে যোগ না থাকলে সঙ্গীত প্রাণহীন হতে বাধ্য। সে জন্যই সত্যদ্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কৃতি থেকে উৎকৃষ্ট কিছু গ্রহণ করেও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করেছেন সমস্ত জীবন। সেই প্রাণরস রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতকে

Dhaka University Institutional Repository

সজীব করে রেখেছে বলে, আজও আমরা উজ্জীবিত হই। বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গানের মাধ্যমে। কিন্তু সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান সমস্ত বাঙালির কাছে পৌঁছাতে পারেনি। প্রথম কারণ, সমস্ত গানই তখন শিক্ষিত ও রক্ষণশীল অনেক বাঙালির কাছে ব্রাত্য ছিল। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ গণ্ডীতে সে সময় আবদ্ধ ছিল প্রচারের অভাবে। পরবর্তীকালে পঙ্কজকুমার মল্লিকই শীর্ষে আবদ্ধ সেই গানকে ভাগীরথের মতো প্রথম প্রবাহিত করেছিলেন সমতলে- জনগণের মাঝে। ক্রমশ বেসিক রেকর্ড, বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে বাঙালি জীবনে, মননে। কিন্তু তিরিশের দশকের আগেই হয়তো তাঁর গান সাধারণ মানুষের শ্রবণে ধরা দিতে পারত, যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় সমস্ত বাংলায় অনুষ্ঠান করছিলেন তাঁর বাবার, অতুল প্রসাদের এবং নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য।

উচ্চাঙ্গসংগীতের অন্ধ অনুকরণ করলে বাংলা গান নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় ব্যয় করেন নি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দ্রেহাভাবনার মূলেও ছিল বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়বদ্ধতা। শুধু উচ্চাঙ্গসংগীত কেন, পৃথিবীর সমস্ত সংগীত থেকে গ্রহণে তার আপত্তি ছিল না কোনো দিনও। কিন্তু তিনি চিলেন নবসৃষ্টির পক্ষপাতী। নবসৃষ্টির প্রেরণাতেই তিনি নিজের গানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছেন বারবার। এই পরিবর্তনের পথ ধরেই বাংলা গান তার নিজস্ব গতিপথটি খুঁজে পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকেই আমরা বাংলা গানে নবসৃষ্টির পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাই। তাঁর প্রায় সমকালেই পেয়েছি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনকে। কিছু পরে অতুলপ্রসাদ সেনকে। দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের অবদান সম্পর্কে আধুনিক বাংলা গানের বিখ্যাত গবেষক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন:

> আধুনিক বাংলা গানের ভিত্তি স্থাপনে রবীন্দ্রনাথসহ চারজন এমন প্রবল গীতিকারকে আমরা পেয়ে যাই যে আমাদের গান হয়ে ওঠে স্বয়ম্ভর এবং বিশিষ্ট। পুরোনো বাংলা গানের নানা রূপরীতি যেমন এদের গানে সুষ্ঠুভাবে সমীকৃত হয় তেমনই ওস্তাদি হিন্দুস্থানি গানের সর্বব্যাপী দাপট সেই গানে প্রতিহত হয়। শিষ্ট বাঙালি অর্জন করে তার নিজের গান, নতুন কালের নবীন পরিবেশে। (সুধীর চক্রবর্তী : ১৩৯৪ : ১৪)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নবজাগরণের ছোঁয়া লাগা শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির বাঙালিকেই গবেষক শ্রী চক্রবর্তী 'শিষ্ট বাঙালি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদ সংগীত সৃজন করেছিলেন আপন-আপন হৃদয়ের আবেগে। কিন্তু পঞ্চগীতিকবি নামে সুপরিচিত পাঁচজনের কনিষ্ঠজন-কাজী নজরুল ইসলাম যখন সংগীত সৃজনে যুক্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর সৃষ্টি সুখের উল্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানির বিপুল চাহিদা। ১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানিতে কর্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করার সূত্রে তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল সেই চাহিদা পূর্ণ করার। সে কাজটি তিনি হয়তো জীবিকার তাগিদে করেছেন, কিন্তু তাতে কবির প্রাণের সংযোগ থাকায় বাংলা সঙ্গীতের দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়েছে।

নজরুলের গানে গানপাগল বাঙালি এতটাই মেতে উঠেছিল যে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে তাঁর গানের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। সব থেকে বিস্ময়জনক ঘটনা এই যে, ওই দুটি দশকে রবীন্দ্রনাথের গানও নজরুলের গানের মতো জনপ্রিয় হয়নি সাধারণ শ্রোতার কাছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গানের অনিবর্চনীয়-অতীন্দ্রিয় বাণী সাধারণ মানুষকে সেই যুগে সেভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। বরং নজরুলের গানের সহজ সরল ইন্দ্রয়গ্রাহ্য বাণী এবং বিচিত্র সুরের মায়াজাল জন্মলগ্ন থেকেই গণদেবতার মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর সৃষ্টিসত্তার অন্তর্গত স্বভাবে তাঁর প্রেমচেতনা প্রবলভাবে বহমান। নজরুল প্রেমের গান, আধুনিক গান, শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী গান–প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার গান রচনা করেছেন। বাঙালির লোকপ্রেমচেতনার প্রত্নপ্রতীক শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধার সম্পর্কের রসায়নে নজরুল যুগপৎ প্রেম ও লোকজীবননির্ভর গান লিখেছেন। (রহমান হাবিব ২০০৯ : ১৩-১৪)

সঙ্গীতের বিদগ্ধ পাঠক ও শ্রোতামাত্রই জানেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার কারণে গ্রামোফোন কোম্পানি আরও অনেক বেশি রেকর্ড করায় আগ্রহী হলে, প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন-নতুন গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীর । বাংলা সংগীত জগতে নজরুলের আগমন সঙ্গীতের দিগন্তকে বহুদূর প্রসারিত করে।

নবজাগরণের প্রভাবে প্রভাবিত শিক্ষিত, প্রগতিশীল বাঙালিই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন নতুন যুগের নতুন ধারার গানকে। কারণ, তাদের তৃষিত হৃদয় বাংলা উপন্যাস ও গীতিকবিতার রোম্যান্টিকতায় অন্য ভুবনের সন্ধান পেলেও রেকর্ডের গানে তখনও পায়নি। রেকর্ডের গানে ছিল ভক্তিগীতি, টপখেয়াল, কৌতুকগীতি, পল্লীগীতি, নাটকের গান, বাংলা টপ্পা প্রভৃতির আধিপত্য। প্রচলিত ও পুরোনো ধারার এই সমস্ত গান প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে পারলেও নব্য যুগের অগ্রপথিক বাঙালি শ্রোতাগণকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারছিল না। রোমান্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নবীন বাঙালি সম্ভবত রেকর্ডের গানের বাণী ও সুরে অচিন লোকের সন্ধান পেতে চাইছিলেন। শুধু তাই নয়, রাগসংগীতের কঠিন শৃঙ্খলামুক্ত বাংলা গানকে তাঁরা একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছিলেন। কণ্ঠ মেলাতে পারলে, গুনগুন করে গাইতে পারলে, অন্তত মনে মনে গাইত পারলে, তবেই তো গানকে আপন করে পাওয়া যায়।

অন্য ভুবনের সন্ধানী ভাবুক, রোমান্টিক ও শিক্ষিত বাঙালি গানের মাধ্যমেও স্বপ্নলোকের চাবির সন্ধান করছিলেন বলেই কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানের মাধ্যমেও যেন সেই প্রার্থিত সম্পদ তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন। এই গানের কথা বলতে গেলেই গীতিকবিতার কথা এসে যায়। আমরা জানি প্রাচীন গ্রিসে

Dhaka University Institutional Repository

বাণীযন্ত্র বা লায়ার বাজিয়ে যে কবিতা গান করা হত তাকেই লিরিক বলত। লিরিককেই আমরা বাংলায় গীতিকবিতা বলি। গান গাওয়া হোক বা না হোক গীতিকবিতায় কিন্তু গীতিধর্মিতা অন্তর্লীন থাকে। সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি থেকে গীতিকবিতার জন্ম হয়। তাই গীতিকবিতা একান্তভাবে কবিজীবনীর সঙ্গে জড়িত, অবশ্য তার সঙ্গে মর্তজীবনের সম্পর্ক থাকে অল্প। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কল্পনা, সৌন্দর্যও সংগীতের পাখায় ভর করে এক নিটোল রসমূর্তি ধারণ করে, সেই সংগীতময় বাকমূর্তির নাম গীতিকবিতা।

আমাদের এই বাংলায় মধ্যযুগেও প্রচুর গীতিকবিতা রচিত এবং গীত হলেও, সেই গীতিকবিতার ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়েও ধর্মীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বেশি। অনেক সময় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেলেও, সেই অনুভূতি আড়াল খুঁজেছে। আধুনিক যুগের কবির মতো মধ্যযুগের কবি অকপটে বলতে পারেন নি– 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল।' এই ব্যাকুলতারই শিল্পসংহত প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছেন কবিবৃন্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনো কোনো শাক্তপদে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সেই সময়ের কবির গান এবং বাংলা টপ্পায়ও মাঝে মাঝে ধরা দিয়েছে ব্যক্তিগত অনুভূতি। এরপর আধুনিক যুগে ঈশ্বর গুপ্তর দু'চারটি কবিতায় গীতিকবিতার কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলেও ১৮৬২ সালে মধুসূদন দত্ত রচিত 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটির মাধ্যমে যথার্থ আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, বায়রণ ও শেলির লেখার মাধ্যমে ১৭৯৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক গীতিকবিতার যে প্রবল প্লাবন এসেছিল, তারই উচ্ছ্বসিত ঢেউ বাংলার আধুনিক কবিদেরও প্রস্তাবিত করেছিল। ১৮৬২ সালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মাধ্যমে রোমান্টিক গীতিকবির যাত্রা শুরু হতেই, যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য গীতিকবি। গীতিকবিতার সমস্ত উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা গীতিকবিতার অভূতপূর্ব রূপ, রস, অনুভব এবং সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর লেখা গীতিকবিতার শিল্পরূপ, আবেগ, রোমান্টিকতা এবং প্রত্যয় বাঙালিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আবেগ ও রোমান্টিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও গানের ক্ষেত্রে তাঁর লেখার মনকে ছোঁয়া সহজ ছিল না। তা ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং অনুপ্রাণিত হওয়ার উৎসাহ তিনি বারবার দিয়েছেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য গগনে সূর্যসম। তাঁর গান বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জীবনের যাবতীয় অনুভব ও উপলব্ধিকে গীতবাণীতে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

একটি প্রশ্ন এখানে বিবেচনার দাবি রাখে, প্রকৃতি এবং নারী প্রেমই যদি গীতিকবিতার রচনার প্রধান উপাদান হয়, তবে কী অপরাধ করলেন কাজী নজরুরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেশ রায়, প্রণব রায়, হীরেন বসু, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গীতিকবিগণ প্রেমগীতি লিখে? আর প্রেমের অনুসঙ্গ হিসেবে ফুল, পাখি, চাঁদ, মালা প্রভৃতি নির্দোষ শব্দ যদি কবির বারবার গীতিকবিতায় এসেই থাকে, তাতেই বা কার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখেছেন। অকৃত্রিম আবেগে লেখা বলেই গীতিকবিতার গীতিধর্মিতাও অক্ষুণ্ন ছিল গীতিকবিদের লেখায়। সুর সংযোজন করা হোক বা না হোক সেই সব গীতিকবিতার অন্তর্লীন সুরের অনুরণন হৃদয়ে ঝংকার তোলে। বলাবাহুল্য, সংবেদনশীল সুরস্রষ্টাগণ অশ্রুত সুরের অনুরণন শুনতে সমর্থ হতেন বলেই, তাঁদের সুরসৃজনে গীতিকবিতা সুরের আকাশে গানের পাখি হয়ে সানন্দে ডানা মেলে দিত। এভাবেই সে সময়ে অভিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও, গীতিকবি এবং সুরস্রষ্টার মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য সফল গানের।

বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলামের গানের অভূতপূর্ব চাহিদার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। নজরুলও জানতেন সে কথা। কিন্তু বাণিজ্যিক জগতকে কুক্ষিগত করে রাখতে চাননি কবি। বরং মজলিশী নজরুল অনুজপ্রতীম সঙ্গীত ব্যক্তিত্বগণের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলতে চেয়েছিলেন। উৎসাহিত করেছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে আসা গীতিকবি, সুরস্রষ্টা এবং শিল্পগীণকে। এমনকি বিভাজনপদ্ধতির প্রতিও তাঁর ছিল গভীর আস্থা। আর এ জন্যই তাঁর লেখা অসংখ্য গীতিকবিতায় সুর দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত, শৈলেন দত্তগুপ্ত, ধীরেন দাস, দুর্গা সেন, সুবল দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরস্রষ্টাগণ। সমস্ত কিছু ভাগ করে নিতে জানতেন বলেই, নজরুল ছিলেন সকলের প্রিয় কাজীদা। আর সে জন্যই বাংলা কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছাড়া, যাঁর প্রভাব খুব বেশি লক্ষ করা যায়, তিনি হলেন নজরুল ইসলাম।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম– এই পঞ্চগীতিকবির মাধ্যমে পাওয়া কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানের সমৃদ্ধ পৃথক ভাণ্ডারের পাশেই। তিরিশের দশক থেকে বাংলা গানের আর একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের গড়ে উঠতে থাকে বেসিক ডিস্ক ও ছায়াছবির গানের মাধ্যমে। একজন সমালোচক বলেছেন :

> তিরিশ দশকের কিছু পূর্ব থেকেই বাংলা গানের প্রবহমান ধারাতে নব আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসতে থাকে। বাংলা 'আধুনিক' গানের সৃষ্টি হয় ঐ সময়ের কিছু পরে অর্থাৎ তিরিশি দশকের শুরুতে। এই 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ গীতধর্মের সাঙ্গীতিক রীতিকে বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের সৃষ্টি বলেই এ গান 'আধুনিক' এমন নয়, এই আধুনিকতা মূর্ত হয়েছে ঐ গীতির অভিনব সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্যে। সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা গভীর দার্শনিক অভিব্যক্তিময় কাব্য অপেক্ষা সরল সর্বজনবোধ্য পদ রচনা এবং সর্বপ্রকার নিয়মবদ্ধতা পরিহার করে বহু বিচিত্র মিশ্রিত অথচ সুখশ্রাব্য সুর-সংযোজনার সাধারণত ঐ বিশেষ সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাৎপর্যের সার্বিক রূপায়ণ হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ নব ধারার গীতকর্মের গোড়াপত্তন এবং প্রাথমিক বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

> নজরুল ইসলামের হাতেই সাফল্যের সঙ্গে হয়েছিল তাঁর বহু বিজিত্র পর্যায়ের গানের একটি ধারাতে (কাব্যগীতি), উল্লিখিত যুগের প্রসারমাণ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলি থেকে। যার মধ্যে গ্রামোফোন এবং সবাক চলচ্চিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (অনুপ ঘোষাল ১৪০৮ : ১৭৩)

আধুনিক গান বলতে যদিও আমরা বেসিক ডিস্কের বিশেষ ধারার বাংলা গানের কথাই বুঝি, কিন্তু এই বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেই দেখব আধুনিক বাংলা গানের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছায়াছবির বাংলা গানেও আমরা পাই। সামান্য যেটুকু প্রভেদ, তা হল চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও কাহিনির প্রয়োজন অনুযায়ী গীতিকবিকে গান লিখতে হয় এবং সেই অনুসারে সুর দিতে হয় সুরস্রষ্টাকে। বেসিক ডিস্কের ক্ষেত্রে গীতিকার এবং সুরকারের যে অবাধ স্বাধীনতা থাকে, ছায়াছবির গানের ক্ষেত্রে অবশ্য তা থাকে না। কিন্তু তিরিশের দশক থেকে প্রায় সমস্ত গীতিকার, সুরকার এবং অনেক শিল্পী সংগীতের এই দুটি বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই, একটি ক্ষেত্রের কথা বলতে গলে অন্য ক্ষেত্রটির কথাও স্বাভাবিক কারণেই এসে যায়। শিল্পসমালোচক অরুণ সরকার এই সময়ের প্রধান গীতিকারদের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা তাঁর বিবেচনা ও মন্তব্যের শরণ নিতে চাই :

> আধুনিক বাংলা গানের আঙিনায় যে সব গীতিকার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলেশ রায়, হীরেন বসু, হিমাংশু দত্ত, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, শ্যামল গুপ্ত, কমল ঘোষ, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (অরুণ সরকার ২০০৬ : ১৫২)

একথা বলা বোধকরি অত্যুক্তি হবে না যে, বেসিক ডিস্কের আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে ছায়াছবির বাংলা গানের তফাৎ আকাশপাতাল নয়। সমকালীন অনুভবের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন বা সারস্বত অভিব্যক্তির শৈল্পিক প্রকাশে এই দুই ধারার গান একই সমতালে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক বাংলা গানের নবনির্মাণ ও বিকাশে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ব দুটি প্রতিষ্ঠান দূরদর্শন ও আকাশবাণীর ভূমিকা থাকলেও সঙ্গীতের বিকাশে তাঁদের সাধ্যের তুলনায় তা ছিল খুবই কম। অন্যদিকে চলচ্চিত্র শিল্প ও সঙ্গীতকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। গ্রামোফোন কোম্পানিও সারাবছর ধরে আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশে তৎপর থাকে না। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> শারদ অর্ঘ্য রূপে তাঁরা বের করেন বেশ কিছু আধুনিক গান। সকলেই মোটামুটি নামকরা বা ব্যবসাসফল (যেমন রুনা লায়লা বা স্বপ্না চক্রবর্তী) শিল্পী। তবু গ্রামোফোন কোম্পানীর এই শারদীয় প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। এই উপলক্ষে তাঁরা ‘শারদ অর্ঘ্য’ নামে ঝকঝকে একটি পুস্তিকা প্রচার করে। গত কয়েক বছরের ‘শারদ অর্ঘ্য’ ঘাঁটলে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় আমাদের এখনকার ভাগ্যবান

আধুনিক গানের শিল্পীদের। তাঁদের নাম : লতা-আশা-রাহুল-মান্না-সন্ধ্যা-অনুপ-মানবেন্দ্র-তরুণ-পিন্টু হাজারি-স্বপ্না-বনশ্রী-অরুন্ধুতী-হৈমন্তী-আরতি-শিবাজী-শ্রাবন্তী-দ্বিজেন-শ্রীরাধা।

গীতিকারদের মধ্যে থাকেন : গৌরীপ্রসন্ন, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী, সুনীলবরণ, প্রবীর মজুমদার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ, মুকুল দত্ত। সুরকারদের গড়পড়তা তালিকা : সলিল-হেমন্ত-মান্না-স্বপন-রাহুল-বাপ্পী-ভূপেন হাজারিকা-অজয় দাস-অশোক রায়-দিনেন্দ্র-অভিজিৎ-প্রবীর-অনল-নীতা সেন। (সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৭ : ২০৪)

সমালোচকের উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে আধুনিক বাংলা গানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধিতে উদার পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বিষয়ে গবেষকের এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধায় গীতবাণী রচনায় আত্মনিয়োগ করে আধুনিক বাংলা গানে বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi I cjK e‡›`¨vcva¨v‡qi gvbmMVb I wkí‡ev‡ai ¯^iƒc

হাজার বছরের বাংলা গানের ইতিহাসে আধুনিক গান একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বাংলা গানের বিবর্তনের পথপরিক্রমায় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ত্রিশ- এর দশকের পর থেকে পঞ্চগীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর হাত হয়ে বাংলা গান তার স্বকীয় ধারা পেয়েছে। পরবর্তী কালে দেখা যায় তাঁদের উত্তরসুরী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সলিল চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, অনিল ভট্টাচার্য, কবি পেমেন্দ্র মিত্র, মোহিনী চৌধুরী, মিরাদেব বর্মণসহ অনেক খ্যাতনামা গীতিকারের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বাংলা গানের ভূবনে ব্যতিক্রমী ও সমৃদ্ধ কাব্যমূল্য সৃষ্টিতে এ দু'জন রচিত গান যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। এ পর্যায়ে আমরা সংগীতের এই মহান গীতবাণী স্রষ্টাদ্বয়ের জন্মপরিচয়, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষাজীবন, সাহিত্যচর্চা, সংগীতচর্চা ও সামাগ্রিক জীবন তথা মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ উম্মোচনের প্রয়াস পাবো:

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৪ তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত জীবনে আমাদের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী গান। সেই সব গানের জন্য আজও তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না। অথচ গৌরীপ্রসন্নর পিতা ভারত বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ভেবেছিলেন পুত্র গৌরীপ্রসন্ন বড়ো হয়ে পিতার মতোই বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু সুপণ্ডিত মানুষটির সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। কিন্তু কেন হয়নি সে কথা জানার জন্য আমাদের অতীতে পাড়ি দিতে হবে।

এই সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী মজুমদার পরিবারের আদিনিবাস ছিল পূর্ব বঙ্গের পাবনা জেলায়। কিন্তু গৌরীপ্রসন্নর জন্মের আগেই তাঁরা কলকাতায় বসাবাস শুরু করেন। ১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতাতেই গৌরীপ্রসন্নর জন্ম হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী মীরা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা এবং কলকাতা টেলিফোন বিভাগের কর্মকতা ছিলেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বয়স তখন চার কী পাঁচ। সেসময় তাঁর এক কাকা (আই.সি.এস. জে.এন. তালুকদার) বিলেত থেকে একটা গ্রামোফোন এনে গৌরীপ্রসন্নর মাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই গান শুনে শুনে গৌরীপ্রসন্নর মনে সংগীতানুরাগের জন্ম হয়। একটু বড়ো হওয়ার পরে সংগীতানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে সাহিত্যপ্রীতিও জেগেছিল। এ ছাড়া তাঁর মনে কবিতা লেখার বাসনাও অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১১/১২ বছর বয়স থেকেই তিনি বাংলায় কবিতা লেখা শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর জ্যেঠতুতো দাদা প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক ভূমেন মজুমদার এবং পিতৃবন্ধু ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভূমেন মজুমদার নিজেও গল্প-কবিতা লিখতেন।অনুমান করা যায় মজুমদার পরিবার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন। সেই আগ্রহ সঞ্চরিত হয়েছিল গৌরীপ্রসন্নর মনেও পরিবার সূত্রেই।

কিশোর গৌরীপ্রসন্ন তখন গভীর আগ্রহে বাংলা কবিতা লিখছেন। নিজের কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখতে কোন কবির না সাধ হয়! গৌরীপ্রসন্নরও হয়েছিল। সেই আশাতেই একটি পত্রিকাতে কবিতা পাঠান। কিন্তু সেই কবিতা ফেরত আসায় গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন জগবন্ধু স্কুলের মেধাবী ছাত্রটি। অভিমানে বাংলা কবিতা লেখা বন্ধ করে ইংরেজি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা ইংরেজি কবিতা পড়ে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন তাঁর ছোটো মেসোমশাই তারাদাস বাগচী। তিনি নিজেও ইংরেজি কবিতা লিখতেন। সেই কবিতা প্রকাশিত হতো বিদেশে পত্রিকায়। এই মেসোসমশাই-এর আগ্রহে ও তৎপরতায় গৌরীপ্রসন্নর লেখা ইংরেজি কবিতা বিলেত ও আমেরিকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের সংগীত সম্মিলনীতে কিছুদিন গান-বাজনা শেখেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সেসময় সংগীত সাধন গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে গান এবং মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের কাছে বেহালা শেখেন গৌরীপ্রসন্ন। গৌরীপ্রসন্নর পিতাই তাঁকে সংগীত সম্মিলনীতে ভর্তি করিছিলেন বন্ধু প্রিয়রঞ্জন সেনের পরামর্শে। অনুমান করা যায় মেধাবী কিশোর- ছেলেটির মধ্যে তাঁর পিতৃবন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনগণ নানাবিধ সম্ভাবনা দেখে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন নানা ভাবে। গান বাজনা ভালোবাসলেও কিন্তু বেশিদিন শিখতে পারেননি গৌরীপ্রসন্ন। মনে হয় লেখাপড়া ও কবিতা লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। পিতা গিরিজাপ্রসন্ন কিন্তু পুত্রের ইংরেজিতে কবিতা লেখা পছন্দ করেননি। তিনি পুত্রকে পুনরায়

মাতৃভাষায় কবিতা লিখতে বলেন। পিতার আদেশ অমান্য করেননি গৌরীপ্রসন্ন। এবার কৃতকার্য হলেন তিনি। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বাংলা কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৫ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। পাশ করে ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন ১৬ বছর বয়স। সেসময় শান্তিনিকেতনের ছাত্র অরূপ মিত্র তাঁকে গান লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। সম্ভবত গৌরীপ্রসন্নর লেখা পড়ে অরূপ মিত্র বুঝেছিলেন যে সফল গীতিকবি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে গৌরীপ্রসন্নর। তিনি যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়েই গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয় সংগীতশিল্পী বিমল ভূষণের সঙ্গে। সংগীতানুরাগের সূত্রেই দু'জনের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। সেসময় 'জজ সাহেবের নাতনি' ছবিতে (১৯৪৩ মুক্তিপ্রাপ্ত) শচীন দেববমর্নের সুরে 'বড়ো নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদে রে' গানটি গেয়ে বিমলভূষণ বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। সম্ভবত সেই কারণেই কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি তাঁর কণ্ঠে গান রেকর্ড করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

গৌরীপ্রসন্নর লেখা দুটি গান-'আমি বুঝতে পারি না কি আছে তোমার মনে'। এবং শুধু পত্র ঝরায় অলস চৈত্রবেলা' নিজের সুরে নিজের কণ্ঠে বিমলভূষণ রেকর্ড (জি.ই.-২৯৪৬) করেন। গৌরীপ্রসন্ন এবং বিমলভূষণের সেই প্রথম রেকর্ড ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গান দুটি তেমন জনপ্রিয় না হলেও গৌরীপ্রসন্নর লেখা 'ভালোবাসা যদি অপরাদ হয় তবে অপরাধী আমি' গানটি জনপ্রিয় হতেই গীতিকার গৌরীপ্রসন্নও বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯৪৭ সালের পূজায় বিখ্যাতগায়ক ও সুরকার সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে এবং অপরেশন লাহিড়ীর কণ্ঠে মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ডে জে.এন.ডি. ৫৮৮৭) গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গৌরীপ্রসন্নর মজুমদারের লেখা আরও কয়েকটি গান প্রকাশিত হলেও, সেই গানগুলি তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না, সে জন্য তিনি প্রায় সব রেকর্ড কোম্পানির জন্য গান লিখতে পেরেছিলেন।

একজন নিকট আত্নীয়ের সূত্রে গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয়েছিল ভারতের প্রত ইম্প্রেসারিও বা প্রমাদ পরিবোশক হরেন ঘোষের সঙ্গে। ঘোষ মহাশয়ের মাধ্যমেই চিত্রপরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয়েছিল। হরেন ঘোষের সুপারিশেই পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমে 'অরক্ষনীয়' এবং তারপর 'প্রিয়তমা' ছবিতে গান লেখার সুযোগ দেন গৌরীপ্রসন্নকে।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও প্রথমে মুক্তি পেয়েছিল 'প্রিয়তমা' (১৯৪৮ সালের ২১ মে) ছবির সঙগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' এবং 'স্বামী' ছবির জন্য গান লেখার পর গৌরীপ্রসন্ন ১৯৫০ সালে যুক্ত হয়েছিলেন 'শ্রী তুলসীদাস' ছবির কিছু গান লেখার জন্য। এই ছবির সূত্রেই সংগীত পরিচালক অনুপম ঘটক গৌরীপ্রসন্নর প্রতভার সন্ধান পান।

এরপর গৌরীপ্রসন্ন সমর, জিঘাংসা, রাজমোহনের বৌ, প্রতিধ্বনি, নতুন পাঠমাল, শুভদা, মায়াকানন, সাত নম্বর কয়েদি, বৌদির বোন, হরিলক্ষ্মী, বনহংসী, এবং শুভযাত্রা ছবির জন্য গান লিখলেও ১৯৫৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত অগ্নিপরীক্ষা ছবির বিপুল সংগীতসাফল্যে সংগীত পরিচালক অনুপম ঘটক এবং গৌরীপ্রসন্ন স্মরণযোগ্য গানের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই ছবির ' কে তুমি আমাকে ডাকো', 'যদি ভুল করে ভুল মধুর হল', 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২২) 'ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্ন ভরা সম্ভাষণ'(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৪)- গানগুলি মানুষের বুকে ঝড় তুলেছিল সুরের জাদুতে, গানের বাণীর কাব্যময়তায় রোমান্টিকতায় এবং ছন্দের দোলায়।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই মনোমুগ্ধকর গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে আজও কালজয়ী হয়ে আছে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া-'জীবন নদীর জোয়ার ভাটায় কত ঢেউ ওঠে পড়ে/ সে হিসাব কভূ রাখে কি কালের খেয়া (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২৫)।' এই গানটি শুনলে অনুভব করা যায় গৌরীপ্রসন্ন একজন যথার্থ মরমি কবি ছিলেন। মানব জীবনের পরম সত্যকে তিনি শুধু অনভবই করেননি, ভাষায় রূপও দিয়েছিলেন যথার্থ স্রষ্টার মতো।

সাহিত্যের ছাত্র গৌরীপ্রসন্ন (ইংরেজিতে এবং বাংলায় এম.এ) জানতেন গীতিকবি ধর্মর। মরমিয়া গীতিকবি গৌরীপ্রসন্ন গান লিখেছেন মধুর ও সহজ কথায়। সেইসব গান সহজেই ছুঁয়েছে মানুষের মন। বলাবাহুল্য গৌরীপ্রসন্নর লেখা গীতিকবিতার গীতিময় আবেদন অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগীত পরিচালকগণকে।

১৯৫১ সালে মীরা দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। নিঃসন্তান গৌরীপ্রসন্নর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যাই হোক, গানে-গানে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো নিবিড়। সেই আন্তরিক সম্পর্কের সূত্রে আমরা ফিরে যাব। ১৯৬৪ সালে গান লিখলেন 'সপ্তর্ষি', 'বিভাগ', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'প্রভাতের রঙ', 'কাঁটাতার', 'নতুন তীর্থ', 'মহাতীর্থ কালীঘাট', ছবির জন্য। 'বিভাস' ও 'নতুন তীর্থ' ছবির গান ভালো হলেও, সুপারহিট না হওয়ায় কালজয়ী হয়নি। হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ স্মরণে রেখেছেন।

১৯৬৫ সাল। কলম থামানোর উপায় নেই গৌরীপ্রসন্নর। 'তৃষ্ণা', 'আলোর পিপাসা', 'মহালগ্ন', 'অন্তরাল', 'রাজকন্যা', 'ভারতের সাধক', 'সূর্যতপা', 'তাপসী', ছবির জন্য গান লেখেন তিনি। সুধীন দাশগুপ্তের সংগতি পরিচালিত 'অন্তরাল ছবির গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শ্যামল ত্রির গাওয়া 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা', 'তুমি কি এমনি করেই', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া- 'ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ কাঁকনে কি সুর' এবং সন্ধ্যা-শ্যামলের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া– 'সারাদিন তোমার কথাই মনে পড়ে' আজও শুনতে ভালো লাগে।

শ্যামল মিত্রর পরিচালনায় 'রাজকন্যা' ছবির গানও জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'এ যেন অজানা এক পথ'- উত্তমকুমারের লিপে অপূর্ব লেগেছিল। বিখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলের গাওয়া- 'নেই সেই পূর্ণিমা রাত' শুধু শ্রোতাদেরই ভালো লাগেনি, এই গানটি আশা ভোঁসলেরও প্রিয় গান।

১৯৬৬ সালে গৌরীপ্রসন্ন গান লেখেন- 'সুশান্ত শা', রাজদ্রোহী', 'শুধু একটি বছর', 'হারানো প্রেম' এবং 'লবকুশ' ছবির জন্য। রাজদ্রোহী, ছবির সংগীত পরিচালনা করেন ওস্তাদ আলি আকবর খান। এই ছবির সব গান মনে না– পড়েলেও মনে আছে শ্যামল মিত্রর গাওয়া– 'কোথাও আমার নেই সময় থামার'। 'শুধু একটি বছর' ছবির কাহিনিও গৌরীপ্রসন্নর লেখা। রবীন চট্টোপাধ্যায় এই ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। হেমন্তের গাওয়া 'স্বপ্ন জাগানো রাত', 'যে আমার মন নিয়েছে' আজও শুনতে ভালো লাগে।

১৯৬৭ সাল। উত্তম-অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনীত সফল ছায়াছবি 'নায়িকা সংবাদ' এর গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য গান লেখেন মোহিনী চৌধুরী (পৃথিবী আমারে চায়' খ্যাত) এবং গৌরীপ্রসন্ন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'এই পূর্ণিমা রাত' হেমন্তর স্বর্ণকণ্ঠে এবং 'আজ চঞ্চল মন যদি'– সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠে অতি শ্রবণ সুখকর হয়েছিল।

'বালিকা বধূ' ও সংগীত সাফল্য অর্জন করেছিল। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের গানের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নর লেখা গানও ব্যবহার করেন। এই ছবির বিখ্যাত হোলির গান 'লাগ লাগ রঙ্গের ভেল্কি লাগ পরাণে লেগেছে ফাগুয়া' আমাদের মনেও রং লাগিয়ে দেয়।

'খেয়া' ছবির সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র নিজেই গেয়েছিলেন– 'আমার মন এখানে রাখাল রাজা'। এই ছবিতে হেমন্ত গেয়েছিলেন, 'বিধিরে, এই খেয়া বাইব কত আর'।

Dhaka University Institutional Repository

'দুষ্টু প্রজাপতি'র সংগীতসফল 'এন্টনি ফিরিঙ্গী'র জন্য গান লেখেন প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন। অনিল বাগচী এই ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়ারী ঝাড়' গানটি মান্না দে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দু'জনেই আলাদা করে গেয়েছিলেন।

গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'আমি যামিনী তুমি শশী হে' গানটি করেন মান্না দে। 'আমি যে জলসাঘরে' এবং 'আমি যামিনী' শুধু জনপ্রিয় হয়নি, কালজয়ীও হয়েছে।

১৯৬৮ সাল। 'পথে হল দেখা'র পর 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির কাহিনি ও গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন। এরপর 'পরিশোধ' ও 'রক্তলেখা' ছবির জন্য গান লেখেন তিনি। দুঃখের বিষয় কালের গতিতে গানগুলি আজ স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

> গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সাথে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্নাদে'র ছিল দারুণ একটি সখ্যতা। শিল্পী মান্নাদে তাঁর প্রথম আধুনিক গান এবং প্রথম বাংলা ছবির গান দুটি-ই করেছিলেন গৌরীপ্রসন্নের গীতবাণীতে। গান লেখার ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা হলো তাঁর সহজ, সরল ও সাবলীন প্রকাশ ভঙ্গি। মান্না দে'র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা তাঁর প্রমাণ পাই: আসলে প্রথম থেকে আমি গৌরীবাবুর, মানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানই গাইতাম। আমার প্রথম আধুনিক গান- 'কতদুরে আর নিয়ে যাবে বলো' এবং 'হায় হায় গো, রাত যায় গো' ওঁর লেখা। একইভাবে প্রথম বাংলা ছবি 'অমর ভূপালী'-তেও গৌরীবাবুর লেখা গানই আমি গিয়েছিলাম। গৌরীবাবুর সঙ্গে সে-সময় একটা সুন্দর বোঝাপড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার। গৌরীবাবুর সিনেমার পরিবেশ, পরিস্থিত এবং কে গাইছেন, কে লিপ দিচ্ছেন এ-সব বুঝে নিয়ে এত সুন্দর গান লিখে ফেলতেন যে ভাবা যায় না। এই একইভাবে বাংলা আধুনিক গানও তিনি এত ভাল লিখতে পারতেন, যে সত্যি বিস্ময়কর। (মান্না দে ২০০৫: ১৯২)

ঠিক কবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের ক্যানসার হয়েছিল তা জানা না গেলেও, সেই কঠিন রোগের কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট পরাজিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন-' গৌরীদা ক্যানসারে মারা যান। তাঁর মতো এত বড়ো একজন গীতিকার বম্বের অতিসাধারণ এক হাসপাতালে প্রায় মাটিতে শুয়েই শেষের দিনগুলো এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটান। এ কথা ভাবতে পারা যায়? তাঁর তো রাজার মতো চলে যাওয়ার কথা, একটা ভিখিরির মতো তাঁর মৃত্যু কেন হবে?

হয়! সব সময় কি হিসেব মেলে? 'দেয়ানেয়া' ছবির জন্য গৌরীপ্রসন্নর লেখা গানটা মনে পড়ে যায়- 'জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখ হিসাব নিকাশ/কিছুই রবে না।' কিছুই থাকে না? তাকে স্মৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে কালজয়ী সৃষ্টি। আর সেই সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাও। যতদিন বাংলা আধুনিক এবং ছায়াছবির গান থাকবে, ততদিন গৌরীপ্রসন্নও থাকবেন তাঁর লেখা অসাধারণ অসংখ্য গানের মাধ্যমে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা যার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় রচিত হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে বেদনার এক অব্যক্ত সুর। বেদনার মধ্যেই মহাকাব্যের সৃষ্টি, এটা একটা চিরন্তন প্রবাদ। মহাকাব্যও রচিত হয়েছিল আত্মার কান্না থেকেই। তাঁর রচনার এই অশ্রুত কান্না উৎকর্ষতা এনছে। গৌরীপ্রসন্ন রচনার অভিব্যক্তি একে বারেই অভিনব। শব্দচয়ন, ছন্দ, কাব্য, রস সবকিছুতে এসেছে চূড়ান্ত আধুনিকতা। গৌরীপ্রসন্নর রচনায় আছে এমন এক বৈশিষ্ট্য যা সব কিছু কেই ছাঁপিয়ে গেছে। তাই একটা কালে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আবদ্ধ নন, তিনি চিরকালীন এক মহান শিল্পস্রষ্টা হিসাবে আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

সংগীত শিল্পী ও সুরস্রষ্টা নীতা সেন যিনি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অনেক গীতবাণীকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন এবং পাশাপাশি সুরারোপও করেছেন; কবি সম্পর্কে তাঁর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলোঃ

> স্রষ্টার ভাব প্রকাশ করবার যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে সবই তিনি প্রকাশ করতে পারবেন তা প্রেমেরই হোক, দেশ বন্দনার হোক আর মাটির কথাই হেকা। গৌরীপ্রসন্ন এই অনায়াস প্রকাশ ভঙ্গিমাই তাঁর গানকে করে তুলেছে কালজয়ী। চিত্রনাট্য চাহিদার যে গান তিনি লিখেছেন তাঁর মধ্যেও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ভাবনার ব্যাকুলতা থেকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে দেশের প্রতি ভালবাসার এক রোমান্টিক আবেদন। নানান সমস্যা উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। মানুষের কথা, যন্ত্রনার কথা, এখানেই তাঁর মানবিকতা। আবার সেখানে তাঁর ঈশ্বরীয় অনুভূতির এক পবিত্র স্বত্ত্বা খুঁজে পাওয়া গেছে সেখানে গৌরীপ্রসন্ন দার্শনিক, আত্মার সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পরিস্ফুট। গৌরীপ্রসন্নকে খুঁজে পাওয়া যায় এক মহান বিরাট ব্যক্তিত্বে। শুধু স্রষ্টা নন, মানুষ গৌরীপ্রসন্ন এবং তার কাব্যিক সত্ত্বা মিলেমিশে একাকার, সেখানে কোন তঞ্চকতা নেই, সবই খোলামেলা। তাই তাঁর মহান সৃষ্টির মাঝে খুঁজে পাই এক খাঁটি নির্ভেজাল দরদী মানুষকে। গৌরীপ্রসন্ন তাই চিরকালের, চিরদিনের। তিনি চলে গেছেন। দিয়েছেন অনেক, পেয়েছেন সামান্য। কতটুকু মূল্য দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি চাননি কিছুই কিন্তু আমাদের কি করার সময় শেষ হয়েছে! (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : মুখবন্ধ)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে আমরা গীতবাণীর স্রষ্টা হিসাবে পেলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন নানামুখি শিল্প প্রতিভার এক সমন্বিত প্রকাশ। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন যে একাধারে সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, কবি, দার্শনিক, তাঁর কত টুকুই বা আমাদের কাছে উম্মোচিত হয়েছে? অথচ সেই কৈশর বয়সেই তাঁর লেখা কবিতা ইউরোপ, আমিরিকার পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। যখন ভাবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অনেক পরিশ্রমের সৃষ্টি উপন্যাসের পাণ্ডলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে আছে, পড়ে আছে অনেক কাব্য এবং গীতি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ, তখন সে দায়বদ্ধতা থেকে সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে আমরাও কি মুক্ত হতে পারি? এ সব তিনি নিজের অন্তরঙ্গ প্রেরণায় সৃষ্টি করেছেন, আর নিজের কাছে আপন করে

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন। প্রকাশে বিমুখ ছিলেন তিনি। কিন্তু কেন? এই 'কেন'র উত্তর নেই। প্রচারবিমুখ প্রকাশ বিমুখ গৌরীপ্রসন্ন এমনি এক সত্তা। এত বড় জ্ঞানী মানুষটার নাম Intellectual গোষ্ঠিতে খোদিত হয় নি তেমন করে। মানুষের অজস্র শ্রদ্ধা ভালবাসা পেলেও তাঁকে ভূষিত করা হয়নি তেমন কোন বিশেষ খেতাবে। অথচ যে পুরস্কার তাঁর একান্তভাবে পাপ্য তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। অহংকারের অলংকারে ভূষিত হতে চাননি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তিনি মানুষের ভালোবাসা চেয়েছিলেন। সেই ভালোবাসাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেতাব, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/আমি তোমাদেরই লোক।' বাংলা গানের ইতিহাসে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার 'আমাদের লোক' হিসেবেই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

cjK e‡›`¨vcva¨vq

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩১-১৯৯৯) মানে গান, কবিতা, কথাসাহিত্য, চিত্রকলা তথা বহুমুখী শিল্পপ্রতিভার এক অনন্য সমন্বয় । শিল্পী মাত্রই কল্পনা প্রমুখ। আকাশ, বাতাস, নদী, মাটি এই বিশ্বচরাচর ছায়া ফেলে তাঁর মনে। এই অনুভূতি চির শ্বাশ্বত। এই রূপরসবোধ পুলকের কলমে ছন্দে হয়েছে কবিতা; আর সুরে হয়েছে গান।

তাঁর গানের বিষয়বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে প্রেম, পূজা, প্রকৃতি ও স্বদেশের গানে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ ও আবেগ অনুভূতির নানা বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর মন চিরন্তণ সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করে থাকে। শিল্পের সাধনা বার বার নব নব চেতনা পাওয়া। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক বন্ধন জীবনের ছন্দ রূপ। এই মহত্তম অনুভূতির মধ্যে কবি, গীতিকার ও সাহিত্যিকগণ সেদিন আর এদিনের মিল-বন্ধন খুঁজে ফেরে। আর এদিনই নিয়ে যাবে আগামী দিনে। সেখানেই সৃষ্টির গৌরব এবং স্থিতি ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত গীতিকার ও শিল্পস্রষ্টা। তিনি ২ মে ১৯৩১ সালে কলকাতার হাওড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা বেলমতি দেবী। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরদাদা জমিদার শিব গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ও শিল্পানুরাগী। তাঁর স্ত্রীর নাম কেকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই সন্তান, পুত্র পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মিঠু ও কন্যা বাসন্তিকা মুখোপাধ্যায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের পৈত্রিক নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। তাঁর পিতা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধায় শৈশব থেকেই ছবি আঁকতেন। তিনি সব রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দক্ষ ছিলেন। গান গাইতেন, পত্র পত্রিকায় কবিতাও লিখতেন। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। জমিদার পবিরাবের এই সুদর্শন, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সন্তান বাংলা ছায়াছবির নির্বাক যুগের নায়ক ছিলেন। তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীকান্ত ছায়াছবিতে। এছাড়া তিনি 'মহানিশা' সহ বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এমন সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে বড় হয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন বিশিষ্ট কবি বা গীতবাণী স্রষ্টা হবেন তাতে আশ্চার্যের কি আছে ! পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনামূলক গ্রন্থে তারই একটি উদ্ধৃতিতে এই সত্যের প্রতিভাস লক্ষ করা যায় :

> আমার পিতৃদেব কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নির্বাক যুগের চিত্রনায়ক। তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের এই শ্রীকান্ত দিয়েই চিত্রা সিনেমার দ্বারোদঘাটন হয়। বাবা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। তারই সূত্রে অনেক শিল্পী, অনেক জ্ঞানী ও গুনীজন আমাদের বাড়ি ‘সালকিয়া হাউসে’ আসতেন। বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার, সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ এবং গীতিকার ও সুরকার হীরেন বসু। ওঁরা যখন আসতেন তখন গান, বাজনা সিনেমা নিয়ে অনেকরকম আলোচনা হত। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৮)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অত্যন্ত মননশীল এবং সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত চর্চার বিষয় ছিল ঐতিহ্যগত এবং পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। সেজন্য অতি অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে অসামান্য শিল্পপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এবং তারই ফলে গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে বাংলা গানের ভূবনে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অবিসংবাদিত নাম। গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি খুব অল্প কম বয়সেই গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন; যা তার আত্ম জীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা পাই;

> বাবার কাছ থেকে দিদি গানটা তুলছেন। আমি পায়ে পায়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেখানে। গান তো আমরা খুবই শুনতাম। কিন্তু এ গানের যেন একটা কোথায় বিশেষত্ব ছিল। গান শেষ হতেই বাবা বললেন, এটা কার সুর কার লেখা জানো? দিদি উত্তর দিল, জানি। হীরেনবাবুর। আর গেয়েছেন মিস লাইট। এর রেকর্ড আমি শুনেছি।
>
> আমার কানে তখন কিন্তু বাজছিল একটাই কথা, তা হল, হীরেনবাবুর লেখা। তা হলে গানও লেখা যায়! বোধ হয় তখনই নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলাম। তাই তো, মাসে মাসে এত যে নতুন গান বের হচ্ছে সেগুলি কেউ না কেউ নিশ্চয়ই লিখছে। গানও লেখা যায়, গানও মানুষ লেখে। সম্ভবত ক্লাস নাইন থেকেই আমার গান লেখা শুরু হলো। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৮)

শিল্পী, কবি মাত্রই আবেগপ্রবণ। নব নব সৃষ্টির নেশায় নিমগ্ন থাকেন তাঁরা। গীতবাণীস্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। জীবনে প্রথম চলচ্চিত্রের গান লেখার আনন্দ প্রকাশ করেন এভাবে:

> কাফি, বেহাগ, ইমন, জয়জয়ন্তী, মল্লার, বাহার, সব যেন একসঙ্গে বেজে উঠতে লাগল আমার বুকের মধ্যে। পরে একদিন সরোজদার কাছ থেকে ‘অভিমান’ ছবির গানের সিচুয়েশনগুলি নিয়ে এলাম। রাত জেগে জেগে লিখে ফেললাম গান। ওঁদের ভাল লাগল। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৯)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বয়সে গীতবাণীর স্রষ্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য। তাই কখনো কখনো বিষয়টি সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

> এইচ-এম.ভি-র তদানিন্তন অধিকর্তাও এই অল্পবয়সী গীতিকারকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন গান আপনার লেখা তো? গানের কথা কিন্তু কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় পড়ে। মামলা হলে মুশকিলে পড়ে যাবেন। আমি বলেছিলাম, রামবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। রামবাবুর সুরের ওপর লিখেছি। এই রামচন্দ্র পাল সম্ভবত প্রথম বাঙালি সুরকার যিনি স্যুট-টাই পরে কলকাতায় বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ১০)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা যেমন তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিস্মিত হই, তেমনি তাঁর প্রকরণপরিচর্যার শৈল্পিক মাধুর্য ও আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তিনি পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, ও স্বদেশ প্রেমের আশ্রয়ে একদিকে যেমন তাঁর গানকে বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি প্রকরণ পরিচর্যায়ও রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গানে অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, প্রতীক ইত্যাদির অলঙ্কারের শিল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে গীতবাণীকে করেছেন কাব্যময় যা শিল্প বিচারের মাপকাঠিতে হয়ে উঠেছে যুগোত্তীর্ণ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এক মহান শিল্পী, বাংলা আধুনিক গানের অন্যতম যুগস্রষ্টা। চলনে, বলনে, পোশাকে আশাকে গুরু গম্ভীর, ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া থাকলে ভিতরে ভিতরে বড্ড হাশি খুশি, প্রাণ খোলা শিশুর সরলতায় সমুজ্জ্বল এক মহান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বড় অভিমানী। প্রকৃত শিল্পীরা হয়তো এমনি হন। গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে বাংলা গানে তাঁর অবস্থান অনস্বীকার্য। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নানা জটিলতা ও অসংগতির সাথে মিলাতে না পেরে মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। সমাজ ও সংসারের প্রতি প্রচণ্ড অভিমান ও ঘৃণা থেকে মনে মনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ গঙ্গায় ঝাপ দেন তিনি। এর ঠিক দুদিন পর অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ আড়িটলা লঞ্চ ঘাট থেকে তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। সুতরাং ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু দিবস ধার্য করা হয়। গীতবাণী স্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে কবি, আবৃত্তিকার, চিত্রকার ও কথাসাহিত্যিক। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানও গাইতে পারতেন তিনি। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের একটি গানে তিনি লিখেছেন:

যখন এমন হয়

জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা

ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই

রেলের লাইনে মাথা রাখি

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টাকি

মাগো সে কি তুমি ।।

লাঞ্ছনা শুধু লাঞ্ছনা

স্বজনের কটু গঞ্জনা

দিন রাত শুনে নে যখন

সারাটি গায়ে আগুন লাগে

যখন ভালোবাসা

বহু পথ ধুয়ে

চলে যায় দূর থেকে দূরে

বন্ধুর দরজায় যত কিছু করাঘাত

যায় বিকলে।

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টাকি

মাগো সে কি তুমি।।

সে কি তুমি মা।।

(সুর ও শিল্পী: মান্না দে)

প্রতিটি মানুষের শেষ এবং চিরন্তন পরিণতি তাঁর মৃত্যু। এটি জীবন মাত্রেরই এক অলঙ্ঘনীয় পরিণাম এবং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত। তারপরও মৃত্যু আমাদের কাছে সব সময়ই বেদনার ও হিম-শীতল অনুভূতিময়। আর তা যদি হয় অস্বাভাবিক মৃত্যু তাহলে সেই বেদনার রঙ হয়ে ওঠে আরও নীল এবং গভীর থেকে গভীরতর। শিল্পস্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এভাবে চলে যাওয়া আমাদের হৃদয়ে তেমনি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। আসলে মহামানব বা মহান স্রষ্টারা হয়তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে থাকেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্ভবত তাঁর শেষ পরিণাম আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে এমন হৃদয়স্পর্শী গীতবাণী তাঁর বীণায় পূর্বেই ঝংকৃত হবে কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi Ges cjK e‡›`¨vcva¨v‡qi Mv‡bi welq‰ewPÎ¨

গানের ভেতর দিয়ে এই বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডকে দেখার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর ও বাণীর আশ্রয়ে জগতের সৌন্দর্য ও আনন্দকে নিজের করে নিয়েছেন তিনি, বলেছেন : 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি'। বিশ্বকবির এই অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে যে-কোন গীতবাণীস্রষ্টার মনের কথাটিই বোধকরি মুদ্রিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহস করে যে কথাটি উচ্চারণ করেছেন, অন্য গীতিকাররা হয়তো সেই সত্যটিকেই নানা অবয়বে ধারণ করার প্রয়াস পান। জীবনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে পাঠ করার প্রত্যয় না থাকলে একজন গীতস্রষ্টা তাঁর পাঠক বা শ্রোতার জীবনকে স্পর্শ করার অধিকার লাভ করেন না।

কবিতা ও সঙ্গীতের পার্থক্য সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, এই দু'য়ের মধ্যে গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সম্পর্কে সংগীত গ্রন্থের 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়– সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।' (২০০৬ : ১৭/৩১৬)। যদিও এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন, গানের কবিতা অর্থাৎ গীত-বাণী ও সাধারণ কবিতা বিচার করার তুলাদণ্ডটি ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবু গানের কবিতা বলার মধ্যেই কবিতা হিসেবে গানের বাণীর সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে গানের কবিতা বা সঙ্গীতকে কবিতা পাঠের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলতে বোধকরি গানের সুর-তাল-লয়ের আনুগত্য বুঝিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীকে সঙ্গীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি দিলেও উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবেই তা পাঠককে পরিতৃপ্ত করে। পাঠকের অতৃপ্তিকেও উস্কে দেয় তাঁর গীত-বাণী। এই অতৃপ্তি অনুসন্ধিৎসারই অন্য নাম। 'গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত'– রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন, যাঁর কণ্ঠ নেই, কিংবা যাঁর কানও যথেষ্ট সতর্ক নয়, কেবল পাঠের ভেতর দিয়ে রবিরশ্মির উষ্ণতায় পল্লবিত হতে চান যিনি, তাঁর কাছেও রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয় এবং তাঁর প্রাণে তা অনাস্বাদিত প্রণোদনা সৃষ্টি করে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর পাঠক হিসেবেও আমরা গানের ঝর্নাধারায় স্নান করার আগেই কবিতার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতে পারি।

একজন গীতিকারের বাণীর বিষয়-বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয়। কারণ মানুষের চিন্তা ও কল্পনা কতো বিচিত্র পথে যে পরিভ্রমণ করে

তার হিসেব নেয়া এক অর্থে অসম্ভবই বটে। তবু মানুষ অসম্ভবের পাথার পেরুনোর চেষ্টা করে। এই চেষ্টার শেষটা তৃপ্তিদায়ক না হলেও ক্ষতি নেই, অতৃপ্তির মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে, একজন শিল্পস্রষ্টা তো সেই আনন্দের দিকেই আমাদের পথনির্দেশ করেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি এই বিস্ময়বোধকে শব্দবন্দি করে জীবন ও জগতের আনন্দযজ্ঞে অংশগ্রহণের শক্তি সঞ্চয় করি।

†MŠixcmb gRg‘vi

জীবনকে অপরিসীম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ করার অসামান্য কারিগর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬)। গীতবাণীতে মানুষের জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। মানুষের আনন্দ-বেদনাকে শিল্পের মহিমা দিয়েছেন তিনি। তাঁর গানের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের নানা দিকে আলোক প্রক্ষেপের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। গৌরীপ্রসন্নর গানের বিষয়ানুগ শ্রেণিকরণে আমরা তাঁর গীতবাণীকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করতে চাই। যেমন - পূজা বিষয়ক গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেম বিষয়ক গান, প্রকৃতি বিষয়ক গান । এছাড়া বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক গান ও ছড়া গান নামে আরো দুটি বিভাগ করা যেতে পারে। এ-পর্যায়ে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর আলোকে এই শ্রেণিকরণের সার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের প্রয়াস পাবো।

cRv we lqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ পূজা। এ পর্বে নিজেকে নিবেদনের এক শিল্পঋদ্ধ নজির স্থাপন করেছেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন, সমর্পণের মধ্যে ফাঁকি থাকলে প্রার্থিত গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। তিনি সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন করেই তাঁর পূজা-পর্বের গীতবাণীতে পূর্ণ করে তোলেন নি, স্রষ্টার সত্যকে শিল্পে রূপ দেয়ার গৌরবদৃপ্ত কাজটিও সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। পূজা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের শরণ নেয়া যেতে পারে :

> যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে "আমি কী– আমার চরম মূল্য কোথায়।" বলা বাহুলক্ষ্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব

> ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকলরকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১০/৬৬৫)

রবীন্দ্রনাথের এই বিবেচনা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পূজা-পর্যায়ের গানের মর্মবাণী উদ্ধারে সহায়ক হতে পারে বলে আমরা মনে করি। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে যা অসমর্থিত বলে প্রতীয়মান হয়, সমর্পণের ভাষায় তা-ই অপরিসীম তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিবেচনা মাথায় রেখে পরম স্রষ্টাকে লাভ করা যায় না। এখানে কেবলই দেবার মানসিকতা নিয়ে মাথা নতকরে দাঁড়াতে হয়। তাহলে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর শক্তি লাভ করা যায়। প্রসঙ্গত আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি মন্তব্য শরণ নিতে চাই :

> ‘ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। প্রেমময় ভগবান খোঁজেন তাঁর মনের মতো ভক্তকে; পিপাসিত ভক্তি খোঁজে তার মনের মতো পাত্রকে। খোঁজার শেষ নেই, তবে পথে চলতে চলতে কিছু তো পায় পান্থজনেরা, নইলে অন্ধকার রাত্রিতে উপলবন্ধুর কন্টক-সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে।’ (Ave mqx` AvBqe 1980 : 21)

গৌরীপ্রসন্ন সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে মেলে দেয়ার মাধ্যমে নিজেকেই যেন নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস পেয়েছেন। ভগবানের কাছে তিনি অক্ষমের মতো দাঁড়াতে পছন্দ করেন না। নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকে গৌরবান্বিত করার প্রয়াসই তাঁর গীতবাণীতে প্রধানরূপে প্রতীয়মান।

†`kvZ¥‡evaK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে স্বদেশের মুখ নানা রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের প্রতিটি ধুলিকণার দিকে গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়েছেন তিনি। দেশকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে একজন মানুষের মানসগঠন ও মূল্যবোধের স্বরূপ সনাক্ত করা যেতে পারে। মুখে নানা কথা বলা হলেও সাধারণ অর্থে দেশ বলতে ভদ্রলোকের দেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারনত আমরা জনসাধারণকে তুচ্ছ ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করে থাকি। আমাদের মজ্জাগত এই অসুস্থতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন গৌরীপ্রসন্ন। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বিভেদ সৃষ্টির কাজটি সহজ হলেও গৌরীর দেশাত্মবোধক গানের মর্মবাণী মিলনের মন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের বিচ্ছিন্নতার কারণেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না। তাঁর মতে, বহুকে এক করে তোলার মধ্যেই দেশহিতের সাধনা যথার্থতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

†cg welqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের প্রেম বিষয়ক গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। পূজা-পর্যায় এবং দেশাত্মবোধক গানের মতোই তিনি প্রেমকে বিচিত্র অবয়বে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির গানে যখনই ফাগুন ও ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই রঙিন স্বপ্নের বার্তা নিয়ে তাঁর হৃদয়-কাননে এসে উপস্থিত হয়েছে অভিনব এক ঝাঁক প্রজাপতি। অবশ্য ভ্রমরকেও আমন্ত্রণ জানাতে ভুল করেন নি কবি। প্রজাপতির রঙের বাহার আর ভ্রমরের গুঞ্জরণে যে প্রাণবন্ত প্রতিবেশ রচিত হয়েছে, সেখানেই কবির গানের পাখিরা প্রাণের বীণায় আনন্দের ঝংকার তুলেছে। কবির প্রেমের গানে প্রকৃতিকে দর্শক বা শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি, নিসর্গের গানে সেই প্রকৃতিই শিল্পী বা অভিনেতা হিসেবে আমাদের চৈতন্যের মঞ্চ অধিকার করে রাখে। আর আড়ালে দাঁড়িয়ে কবি সেই আনন্দ-আয়োজন উপভোগ করে আমোদিত হন, কখনো-বা কষ্টের কাঁটা তার ডিঙিয়ে নিসর্গের মধ্যে নিজের নির্ভরতা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করেন। তাই বৃষ্টিস্নাত দিনে কবির বীণা মেঘমল্লার রাগে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে। প্রজাপতির দূর বনান্তে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যে হারানোর দিনের গান মনে পড়ে যায় কবির। তিনি পাখির চোখ কিংবা আম্রপাতায় নতুন দিনের স্বরলিপি পাঠ করেন, আর প্রকৃতির নব-আনন্দে জেগে ওঠার মধ্যে আবিষ্কার করেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবির প্রেমের কবিতা। কবি যে প্রকৃতি-কন্যার প্রেমে গান গেয়ে ওঠেন, সেই কন্যার অধরে ফাগুনের আগুন দেখে পুলকিত হন তিনি, আর সেই অধর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা গানের মালা হয়ে কবির কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। গৌরীর গীতবাণীকে আমরা নানা শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হলেও লক্ষ করবো, তাঁর একই গীতবাণীতে নানা বিষয়ের সার্থ সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে প্রেমের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি বারবার প্রকৃতির দ্বারে হাত পেতেছেন।

cKwZ welqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিসর্গের নানা আয়োজনে তাঁর গীত-বাণীর আনন্দ-উদ্‌যাপনকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করেছেন। প্রকৃত অর্থে কবির অন্তরের অপ্রকাশিত অভিব্যক্তিই তাঁর চারপাশের পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

wewPÎ welqKwfwËK Mvb

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার পূজা, প্রেম, স্বদেশ বন্দনা ও প্রকৃতি আশ্রয়ী গানের পাশাপাশি আরও বহুবিচিত্র অঙ্গের বাণীবিন্যাসে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সংগীত ভান্ডারকে।

cjK e‡›`¨vcva¨vq

কর্ম ও সৃজনের যুগলস্রোতে স্নাত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯)। গীতস্রষ্টা হিসেবে বিচিত্র বিষয়কে শব্দবন্দি করেছেন তিনি। গীতবাণীর সান্নিধ্যেই তিনি সবচেয়ে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। জীবনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করার যে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন, তা-ই তাঁর সৃষ্টিকর্মে যুক্ত করেছে এক বিচিত্র ব্যঞ্জনা ও অভিনব শিল্পঋদ্ধি। বাংলা গানের দীর্ঘ পথযাত্রার বাঁকবদলের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক অভিনিবেশও লক্ষ করার মতো। তাঁর গীতবাণীর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা পাঠকের চৈতন্যে আলোড়ন তোলে। গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি ধ্বনিমাধুর্যের মোহনরূপে মুগ্ধ হয়েছেন। এই মুগ্ধতার পথ ধরেই তিনি গীত-বাণীর ঝর্নাতলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আধুনিক বাংলা গানকে কবিতার ঐশ্বর্য উপহার দিয়েছেন তিনি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয়ানুগ শ্রেণিকরণে আমরা তাঁর গীতবাণীকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করতে চাই। যেমন- পূজা বিষয়ক গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেম বিষয়ক গান ও প্রকৃতি বিষয়ক গান। বর্তমান আলোচনায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর আলোকে তাঁর গানের বিষয়বৈচিত্র্য, স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করার প্রয়াস পাবো।

cRv welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজা-বিষয়ক গীত-বাণীতে পূজার অর্ঘ্য হিসেবে নিজেকে নিবেদনের গতিবিধি ও গভীরতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর নিবেদন ও নির্মাণের নিজস্বতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব এবং সঙ্গত কারণেই এই পর্যবেক্ষণে আমরা তাঁর গীতবাণীতে বিম্বিত পূজা বা সমর্পণের আশ্রয় নেব।

পুলকের সমগ্র নিবেদনের মধ্যেই দেবতা ও প্রিয় পরস্পরের হাত ধরে পথ চলেছে, এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বৈপরীত্য বা ভেদরেখা স্বীকার করেননি তিনি।

†'kvZ¥‡evaK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ-প্রেমের গানে জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ব ও দায়িত্ববোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন, জন্মভূমি জন্মসূত্রে পাওয়ার ব্যাপার নয়, কাজের মাধ্যমে স্বদেশকে নিজের করে নিতে হয়। তাঁর গীতবাণীতে তাই আমরা লক্ষ করি দেশের মানুষের জন্য নিজেকে নিবেদনের প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে।

†cg welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গানেরই প্রধান উপজীব্য প্রেম। প্রেম-বিষয়ক গীত-বাণীর মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণের আয়োজনকে শব্দবন্দি করেছেন তিনি। পুলকের সুরবাণীর পথে প্রেমের দর্পণে নিজেকে দেখার নানা আয়োজন লক্ষণীয়। যার চকিত চাহনী কবির সৃজনভাবনাকে সচল-সবল-সাবলীল করে তোলে, কবি তাকেই উপহার

Dhaka University Institutional Repository

দেন গীত-সুধার গর্বিত শব্দমালা। ব্যক্তিগত বিবর থেকে বাইরে এসে আলোর ঝর্নাধারায় জলের গুঞ্জরণে অন্তরের অতল থেকে অভিনব অভিব্যক্তির ঐশ্বর্যে গানকে সিক্ত করেন কবি। এ-যেন শূন্যতার আড়াল ভেঙে পূর্ণতার দিকে হাত বাড়ানোর প্রলোভন। ধূপের সুগন্ধ যেমন তার শর্তহীন আত্মত্যাগের অর্থবহ পরিণাম, তেমনি তাঁর গানের বাণী জীবনকে অকাতরে প্রেমের সৌন্দর্য ও দীপ্তির হাতে সমর্পণের সার্থক ও শিল্পসম্মত রূপায়ণ। আর এ-জাতীয় গান অন্তরে যে প্রাণের সাড়া এনে দেয়, নাড়া দেয় শিল্পীর স্বরতন্ত্রীতে, তাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক বাংলা গানে প্রেমকে খুব সহজ-সরল ও সস্তা বিষয়ে পরিণত করার নজির কম নেই। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা প্রেমের গানকে এই দুর্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

cKwZ welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতির গান আধুনিক বাংলা গীতবাণীর এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রকৃতি-আশ্রয়ী গানকে ঋতুসঙ্গীতও বলা যেতে পারে। ষড়ঋতুতে বাংলার প্রকৃতির যে লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা পুলকের গানে চমৎকার শিল্পসংহতি নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। পুলক অনুধাবন করেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দেশ করে বস্তুকে বিচার করা খুবই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং তাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে প্রকৃতি ও সঙ্গীতের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সঙ্গীত শিল্পতত্ত্বের একটি অতিগভীর সত্যকে প্রকাশ করছে এবং এই সম্বন্ধের যথার্থ উপলব্ধির উপরেই এর সবচেয়ে কঠিন কঠিন সমস্যা মীমাংসা এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের সমাধান নির্ভর করছে।

চতুর্থ অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi I cjK e‡›`¨vcva¨v‡qi Mv‡bi wkí-cKiY

চতুর্থ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

Aj¼vi

কবিতার অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজন কবি যতো বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকার সংগত কারণেই ততো স্বাধীন নন। কারণ গীতিকার তাঁর সৃষ্টিকর্মকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনে সুরকার ও শিল্পীর অভিপ্রায়কে মূল্য দেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীতবাণীর প্রকরণ আলোচনায় অলঙ্কার অনুসন্ধানে আমরা লক্ষ করেছি, অলঙ্কার বাহুল্যে তাঁদের গীতিবাণী কখনোই শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে পড়েনি, আমাদের গৃহকর্মনিপুনা বধূটির মতোই প্রাঞ্জল-চঞ্চল-হাস্যময় তাঁদের শিল্পকর্মের ভাষা যা আপন প্রাণের উচ্ছালতায় অন্যজনের হৃদয়কে একটু স্পর্শই কেবল করে না, প্রবল নাড়াও দিয়ে যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত অলঙ্কারে কোন রকম অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় না দিয়ে তা গীতিকবির ভাবকে পাঠক ও শ্রোতার বোধের সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

wPÎKí

চিত্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে একজন কবি তাঁর অন্তগর্ত সৌন্দর্য তথা শিল্প-সত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক তৈরির প্রয়াস পান। চিত্রকল্পে আমরা কেবল চিত্রের অন্বেষণ করি না, সেই চিত্রের স্রষ্টার চিত্তকেও অনুধাবণ করতে চাই। প্রাকরণিক আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর অধিকাংশ চিত্রকল্পে তাঁদের প্রকৃতি, প্রেম, বিরহ, সৌন্দর্যচিন্তা এবং জীবন সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গেই তাঁরা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। গীতবাণীকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতেই হয়। তাই চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁরা মানুষের কাছের এবং একান্ত অনুভবের জিনিসকেই গীতবাণীর উপকরণ বা প্রেরণা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সরল ভাষায় অনুভবের নিবিড় পরিচর্যায় তাঁরা তাঁদের ভাবনাকে গ্রথিত করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে শব্দের শক্তি নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দিয়ে ঝর্ণার মতো গান গেয়ে উঠেছে। প্রতীকী অর্থমাত্রায় ঋদ্ধ শব্দাবলি তাঁদের চিত্রকল্পে নতুন মাত্রা এনেছে।

চতুর্থ অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

cZxK

গীতবাণীতে ব্যবহৃত প্রতীকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি প্রতীকের দূরসঞ্চারী আলোক প্রক্ষেপে তাঁদের সৃজনভুবনও হয়েছে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত । তাঁরা প্রতীকের ভেতর ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের বর্ণিল অভিজ্ঞতাকে, যা গভীরতর রহস্যের ধারণ হিসেবে পাঠকের চিন্তা শক্তিকে নানা দিকে নিক্ষেপ করে। গীতবাণীতে তাঁরা অন্ধকার, আকাশ, আগুন, হরিণ, বালুচর, নদী, ভ্রমর, কাটা, কোকিল, চাঁদ, ঝড় ইত্যাদি প্রতীকী শব্দ ব্যবহারে মাধ্যমে মানব জীবনের নানা প্রান্তকে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীক তাঁদের প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সুগভীর উপলব্ধির বর্ণিল প্রান্তরকে চিহ্নিত করেছে।

চতুর্থ অধ্যায় ।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ciY

শিল্পসাহিত্যে পুরাণ কিংবা পৌরাণিক অনুসঙ্গের ব্যবহারে একজন স্রষ্টার ঐতিহ্য সংলগ্নতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন কবি যতটা স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকারের পক্ষে তা নানা কারণে সম্ভব হয় না। গীতিকারকে বক্তব্যের সরলতা ও সুরের সীমাবদ্ধতা মেনেই শব্দকে সাজাতে হয়। গীতবাণীতে প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনে বিচিত্র অনুসঙ্গ বিধৃত হলেও প্রেমই মুখ্য উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। সেই কারণে প্রেম আশ্রয়ী পুরাণ ও পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্রের অধিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে রাধা-কৃষ্ণই প্রধান পৌরাণিক চরিত্র। তবে আরো নানা পুরাণ আশ্রয়ী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁরা। যেমন ললিতা, বিশাখা, সূর্পর্ণখা, সুখ-সারি, বেহুলা-লক্ষীন্দর, নদের চাঁদ, ইন্দ্র, রাম, ইত্যাদি যা তাঁদের গীতবাণীকে শিল্প সমৃদ্ধ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায় ।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

Q›‘

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য পদচারণা চোখে পড়ার মতো। অক্ষরবৃত্তই তাঁদের গীতবাণীর প্রধান ছন্দ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতিও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষপাত লক্ষ করার মতো। তাঁদের বিপুল সংখ্যক গীতবাণী মাত্রাবৃত্তে রচিত। মাত্রাবৃত্তের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে পাঠক শ্রোতার কল্পনা প্রতিভা যেমন আন্দোলিত হয়েছে, তেমনি মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে অভিনবত্ব। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বরবৃত্তের সুর লঘু হলেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরবৃত্ত ছন্দের গীতবাণী নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে ধারণ করেছে। তাঁদের স্বরবৃত্তে আড়ষ্ঠতা নেই বলেই সকল বিষয়কেই তা গতি দিতে পেরেছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছন্দের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে গীতবাণী সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন বলেই তাঁদের গীতবাণী পাঠে আমরা কবিতা আস্বাদনেরই আনন্দ লাভ করি।

পঞ্চম অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi Ges cjK e‡›‘¨vcvav‡qi Mvb-wel‡q

gvV chv‡q M‡elYv †_‡K cvß Z_¨ ev mv¶vrKv‡ii ¸iæZcY Ask ms‡hvRb

পঞ্চম অধ্যায়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান-বিষযে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এই দুই শিল্পস্রষ্টা আধুনিক বাংলা গানে অসামান্য অবদান রাখলেও তাঁদের কৃতিত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বা আলোচনা নেই বললেই চলে। তাই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তাঁদের অবদান বিষয়ে নানাজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং গৌরীপ্রসন্ন ও পুলকের পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের চৌম্বক অংশ এই অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। কিছু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থে গৌরীপ্রসন্ন এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সামান্য আলোচনা পাওয়া গেছে, যা এই অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি আলোকচিত্রও সংযুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

†MŠixcmb gRg‘v‡ii wbewPZ Mvb msKjb

Ges

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi wbewPZ Mvb msKjb

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে 'গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নির্বাচিত গান সংকলন' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে 'পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গান সংকলন'। আমরা মনে করি, গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার এবং পুলক বন্দোপাধ্যায়ের গীতবাণীর গভীরতা এবং বৈচিত্র্য অনুধাবনে এই গীতবাণীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বর্তমানে গবেষণাকর্মে গীতবাণীর কাব্যমূল্য বিচারের প্রয়োজনে অনেক গানেরই আংশিক উদ্ধৃতি করা হয়েছে। এই দুই গীতস্রষ্টার 'নির্বাচিত গান সংকলন' থেকে পূর্ণাঙ্গ গানটি বিবেচনা করা যাবে।

Dcmsnvi

চল্লিশের দশক হতে আশির বাংলা আধুনিক গানের এক স্বর্ণ যুগ। তাই হারানো দিনের গান শুনতে গিয়ে আমরা বারবার এই কালখণ্ডের মধুর গীতসুধায় সিক্ত হই। এই সময়ের অনেক গানই হারিয়ে যায় নি, বরং শ্রোতা হিসেবে আমরা কালজয়ী কিছু গানের সুর ও বাণীর রাজ্যে হারিয়ে যাই। গানের বাণী আমাদের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে অন্তরের অন্দরমহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাতে কণ্ঠশিল্পীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকলেও গীতিকার ও সুরকারের অন্তর্গত সৌরভ ও সমৃদ্ধি বিষয়ে সচেতন পাঠক-শ্রোতার আগ্রহ তৈরি হওয়া অসম্ভব কিংবা অসঙ্গত নয়। একটি সফল গানে গীতিকার-সুরকার-শিল্পীর মধ্যে কার ভূমিকা অধিক সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তর্কবিতর্কের আড়ালে কারো অবদানই হারিয়ে যায় না বলে আমরা মনে করি।

গীতিকার সুরকার আর শিল্পী– এই ত্রয়ী স্রষ্টার সফল সম্মিলনে বিশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে আশির দশকে বাংলা গান যে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছিল বলেই এই সময়ের গানে আমরা খুঁজে পাই বাঙালির চিরকালীন আনন্দ-বেদনার চলচ্ছবি।সংগত কারণেই তৎকালীন বাংলা আধুনিক গান হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সুমিষ্ঠ, আবেগঘন মর্মস্পর্শী ও প্রাসংগিক। ঐ গানগুলো তৎকালীন সময়ে যেমন প্রতিটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিল, তেমন আজকের দিনেও সমানভাবে আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়। তাই এই সময়ের গানগুলোকে আমরা 'হারানো দিনের গান' না বলে 'চিরদিনের গান' বা 'চিরকালের গান' বলাই যথার্থ বলে মনে করি। বংলা গানের স্বর্ণ যুগে গান রচনার ক্ষেত্রে যে সকল গীতিকারের পরিচয় মিলে, কিংবা বলা যায়, বাংলা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের গান যে সব গীতিকারের হাতে প্রাণ পেয়েছিল তাঁরা হলেন -সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২), হীরেন বসু (১৯৩০-১৯৮৭), শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৬৩), অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩), বানী কুমার (১৯০৭-১৯৭৪), সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪), অনিল ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৪৪), গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬), প্রণব রায় (১৯১১-৭৫), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) , জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), মোহিনী চৌধুরী (৯১৯২০-১৯৮৭), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭), সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৫), অনল চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮-) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা বাংলা আধুনিক গানকে কবিতার ঐশ্বর্য দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের পর বাংলা সংগীতের আকাশে ব্যতিক্রমী এক শিল্পমূল্য সৃষ্টি করে বাংলা আধুনিক গানকে এই দুই গীতবাণীর স্রষ্টা যে জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন তা বাংলা আধুনিক গানকে এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা যেমন তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বিস্মিত হই, তেমনি তাঁদের প্রকরণ পরিচর্যার শৈল্পিক মাধুর্যও আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তাঁরা পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, ও স্বদেশপ্রেমের আশ্রয়ে একদিকে যেমন তাঁদের গানকে বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি প্রকরণ পরিচর্যায়ও রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গানে অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, প্রতীক ইত্যাদি অলঙ্কারের শিল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে গীতবাণীকে করেছেন কাব্যময়; যা শিল্প বিচারের মাপকাঠিতে হয়ে উঠেছে যুগোত্তীর্ণ।

জীবনের রূপ চিরন্তন সত্য নিয়ে প্রবাহিত হয় চরম উপলব্ধিতে। তাই মহান স্রষ্টা কখনোও অতীত বা সমাপ্তিতে মুছে যায় না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দিন মুছে যাবেন না। তাঁদের অন্তরতম উপলব্ধি ছিল, জীবন থেকে কিছুই বাদ দেওয়া যায় না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নবযাত্রা। সত্যর সন্ধানে তাঁদের জীবন দর্শন ঘটেছে। মন যেখানে উদার উন্মুক্ত, সেখানে সময়ের কোন ভাগাভাগি নেই।

মানুষ তাঁর অস্তিত্বের বিকাশ ঘটায় প্রকৃতি পরম্পরা ও বর্তমানকে নিয়ে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিধারার সমন্বয়ে তাঁদের মনের অভিব্যক্তিকে রূপায়িত করেছেন। বৈচিত্র্য আর নৈপুণ্যে ভরিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিকে। সে রত্ন অন্বেষণে রত্ন মিলবে-এ বিশ্বাস আমাদের অন্তরের। বাংলা গীতিসাহিত্যে যাঁদের নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর, সৃজনশীল এবং সমসাময়িক কালের স্পন্দনকে ধারণ করেই কালজয়ী শিল্পস্রষ্টা। তাঁদের গানের বাণী এবং সৃজনপ্রতিভা পর্যালোচনা করে আমরা উপলব্ধি করেছি, তাঁদের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, আবার কিছু কিছু বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধায় হলেন একই বৃন্তে বিকশিত দুটি কুসুম। আর এঁদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কিংবদন্তী শিল্পী মান্নাদে। বাংলা আধুনিক গানের অন্যতম রূপকার ও বাণী স্রষ্টা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে শিল্পী মান্নাদে'র উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁদের শিল্প জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মান্নাদে ১৯৫৩ সালে তাঁর জীবনের প্রথম বাংলা আধুনিক গান 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বলো' এবং 'হায়-হায় গো রাত যায় গো' গান দুটি গেয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্নের কথায় এবং বাংলা প্রথম চলচিত্রের গান ' অমর ভূপালীর 'কথাও ছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। পরবর্তীকালে গৌরীপ্রসন্নের অসংখ্য আধুনিক ও চলচিত্রের গান মান্নাদে তাঁর কন্ঠে ধারণ করেন। পক্ষান্তরে ১৯৬০ সালে মান্নাদে প্রথম পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান 'আমার যদি না থাকে সুর' এবং 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই' গান দুটি গেয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মান্নাদের জীবনের সিংহভাগ গানের কথা লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতশাস্ত্রে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মান্না'দে বুঝতে পেরেছিলেন যে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন এই দুই সংগীতস্রষ্টার মধ্যে যদি একটি সুন্দরের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা যায় তবে তা বাংলা আধুনিক গানের বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে একটি ইতিবাচক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, যা বাংলা সংগীতের জন্য অভূতপূর্ব সুফল বয়ে আনবে। কার্যত তাই-ই হয়েছে। যখনই গৌরীপ্রসন্ন একটি ভাল গান লিখতেন, তাঁর জবাবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি ভাল গান লেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। গৌরীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটতো। তখন সুন্দরকে সৃষ্টি করার এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কিছু ভাল গান। এ প্রসঙ্গে শিল্পী মান্নাদে'র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতির স্মরণ নেওয়া যাক।

> গীতিকার হিসেবে গৌরীবাবু এবং পুলকবাবু দু'জনের দক্ষতাই প্রশ্নাতীত। তাই দু'জনের গান লেখার মধ্যে যদি একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা এনে দেওয়া যায়, তা হলে বাংলা গানের পক্ষেই তা আরও স্বাস্থ্যকর

Dhaka University Institutional Repository

> হয়ে উঠবে। তাই গৌরীবাবুকে বললাম ওইরকমভাবে। আর সেই প্রতিযোগিতার প্রভাবেই গৌরীবাবু প্রথমে লিখছেন- 'ওগো বর্ষা তুমি ঝরো নাকো অমন করে'। তার উত্তরে পুলকবাবু প্রথমে লিখলেন- 'তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার'। আবার গৌরীবাবু লিখলেন- 'যদি কাগজে লেগো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে'। তার উত্তরে আবার পুলকবাবু লিখলেন- 'আমার ভালবাসার রাজপ্রাসাদে'। (মান্নাদে ২০০৫ : ২০৩)

গান লেখার ব্যাপারে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনই ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মান্নাদের উদ্ধৃতি থেকে আমরা এই সত্যের প্রমাণ পাই : 'গৌরীবাবুর সঙ্গে সে-সময় একটা সুন্দর বোঝাপড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। গৌরীবাবু সিনেমার পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং কে গাইছেন, কে লিপ দিচ্ছেন এ-সব বুঝে নিয়ে এত সুন্দর গান লিখে ফেলতেন যে ভাবা যায় না। এই একইভাবে বাংলা আধুনিক গানও তিনি এত ভাল করে লিখতে পারতেন, যে সত্যি বিস্ময়কর।' (মান্নাদে ২০০৫: ১৯২)। আবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মান্নাদে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'গান লেখার ব্যাপারে পুলকবাবুর প্রতিভার কোনও সীমা ছিল না। যে-কোনও অবস্থার মধ্যে, যে-কোনও পরিস্থিতি বা সেন্টিমেন্টের গান পুলকবাবুকে একটু ধরিয়ে দিলেই, উনি তাঁর থেকে লিখে দিতে পারতেন অপূর্ব সব গান। ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথা থেকেই উনি অসাধারণ সব গান লিখে ফেলতে পারতেন।' (মান্নাদে ২০০৫ : ১৯৬)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয় বিশ্লেষণে আমরা উভয়ের গানেই প্রেম, প্রকৃতি, পূজা ও স্বদেশ এই চারটি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করি এবং এর মধ্যে দু'জনই প্রেমের গান মূলত বেশি লিখেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক দুজনেরই দেশের গান রচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য এই যে, সাধারণত আমরা দেশকে মায়ের মূর্তিতে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম দেশকে প্রেয়সীর মূর্তিতে নির্মাণ করলেন এভাবে– 'কত যে সাগর নদী, পেরিয়ে এলাম আমি কত পথ হলামও যে পার/তোমার মত এত অপরূপ সুন্দর কাউকে তো দেখিনিতো আর/ প্রিয়তমা মনে রেখ, অনুপমা মনে রেখ।'(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ২৯৪) পৌরাণিক চরিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা দু'জনই মূলত রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রের আশ্রয়ের তাঁদের সময়ের মানুষের অন্তগর্ত প্রেম সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গীতবাণীতে গৌরীপ্রসন্ন লিখেছেন, 'ললিতা গো বলে দে, কোন পথে গেল শ্যাম?। বিশাখা গো বলে দে কোন পথে গেল শ্যাম? মূরলীর ধনি তার, আমারে ডাকে আর, আর তো শুনি না রাধা নাম।' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৩৯) আবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ললিতা গো, ওকে আজ চলে যেতে বল, ও ঘাটে জল আনিতে যাবনা যাবনা, ও সখি অন্য ঘাটে চলনা।' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৬৭) এখানে ললিতা চরিত্র শ্রীমতি রাধার ষোলশত গোপীদের অন্যতম পৌরাণিক চরিত্র।

এক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণ ব্যবহারে তাদের স্বাতন্ত্য লক্ষ করা যায়। যেমন রামায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সূর্পণখা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতবাণীতে এই চরিত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি শ্লেষাত্মক ইংগিত প্রদান করেছেন, লোভী দোকানদারের কবলে পড়ে খদ্দেরের কি বেহাল অবস্থা হয় তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে এভাবে- 'সূর্পণখার নাক কাটা যায় উই কাটে বই চমৎকার, খদ্দেরকে জ্যান্ত ধরে গলা কাটে দোকানদার।' সূর্পণখা চরিত্রটি পুলকের প্রাণের স্পর্শে লাভ করেছে ভিন্নতর মাত্রা। এভাবেই গৌরীপ্রসন্ন ও পুলকের গানে পুরাণের চরিত্রসমূহ লাভ করেছে অভিনবত্ব ও গভীরতর ব্যঞ্জনা।

Dhaka University Institutional Repository

গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক দুজনেই অনেক উঁচু মানের গীতস্রষ্টা। তাঁদের রচিত গান আমাদের বাংলা গানের ভাণ্ডারকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে, এ দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে দুজনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এই যে প্রকাশ ভঙ্গির দিক দিয়ে গৌরীপ্রসন্নের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল অথচ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ যেমন– 'এই মেঘলা, দিনে একলা, ঘরে থাকে নাতো মন, কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৬), 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু, কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০২)। আবার পুলকের ভাষা অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর, কাব্যময় এবং অত্যন্ত শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। যেমন– 'কি দেখলে তুমি আমাতে, কত সহজ এ-কথা জানানো কত যে কঠিন কী দেখেছি আমি এ-কথা তোমাকে বোঝানো!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১৪০), 'আমার ভালবাসার রাজ প্রাসাদে নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে আমার মনের ময়ূর মরেছে ওই ময়ূর মহলেই দেখি শুধু মুকুটটাতো পরেই আছে রাজা শুধু নেই' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১০৬)। এরকম অসংখ্য গান খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে একই বিষয় কখনো কখনো দুজনকে আলোড়িত করলেও তাঁদের দুজনের প্রকাশভঙ্গি এবং অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে বিপুল পার্থক্য চোখে পড়ে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীত-বাণী রচনায় প্রকরণ-পরিচর্যায় যেমন যত্নশীল থেকেছেন, তেমনি গানের কথায় সার্থকতার সঙ্গে কবিতার দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা ও সঙ্গীতের অন্তর্ভেদী অনুরণন সম্পন্ন করেছেন। সুন্দরের আহ্বানে তাঁরা যেমন সাড়া দিয়েছেন, অসুন্দরের আঘাতেও মুখ ফিরিয়ে নেন নি কখনো। তাই গানের বাণী এই গীতস্রষ্টাদ্বয়ের জীবনার্থের স্মারক হয়ে উঠেছে। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে তাঁরা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সঙ্গীতে জীবনবীক্ষার প্রকাশে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো তাঁদের পরিশীলিত রুচির সঙ্গে আপোষ করেননি। এমন কোনো গানের বাণী তাঁরা রচনা করেননি যে গানটি চোখে পড়ার মতো দুর্বল বা নিম্নমানের। গানে তাঁরা প্রাণের চেয়ে পাণ্ডিত্যকে কখনোই প্রাধান্য দেননি বরং শিল্প-প্রতিভার বিকাশে একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর মতোই শিশুর সরলতায় খেয়ালিপনার প্রভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই তাঁদের গানের বাণী কোন আরোপিত ভাব বা অনুভবের ভারে শ্লথগতি হয়ে পড়েনি। যে গতিশীলতা জীবনের সজীবতানির্দেশক, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গীত-বাণীতে সেই গতিই গভীরতর ব্যঞ্জনায় বিকশিত হয়েছে। তাই বাংলা গানের ইতিহাসে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দুই শিল্পপ্রতিভার জন্য অক্ষয় আসন রচিত হয়ে গেছে। শিল্পসাহিত্যের কিংবা সারস্বত-সাধনার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, ইতিহাসের চেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মানুষের হৃদয়। বাঙালি পাঠক-শ্রোতার অন্তরের গভীরতর প্রদেশে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস সোনার হরফে লিপিবদ্ধ থাকবে।

MšcwÄ

K. gjMš

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচনা সংগ্রহ-১. (সম্পাদক : শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : গৌরীপ্রসন্ন গীতিসমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, অসীমা প্রকাশনী. কলকাতা, ২০০৩

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯

L. mnvqK Mš

অনুপ ঘোষাল : গানের ভুবনে, প্রকাশক- শ্রী দেবব্রত কর, কলকাতা, ১৪০৮

আবদুল মান্নান সৈয়দ : ছন্দ, প্রথম প্রকাশ, অবসর প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ২০০১

আবু সয়ীদ আইয়ুব : পান্থজনের সখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

ইসরাফিল শাহীন : পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

করুণাময় গোস্বামী : রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড- দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১

জয়ন্তী ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২

জয়ন্তী গঙ্গোপাধ্যায় : তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৯

জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা-২০০২

Dhaka University Institutional Repository

তারেক রেজা : কবিতা : কালের কণ্ঠস্বর, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯

: সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০

: কবিতার মন-মর্জি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১২

: রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দ বিকাশ, রূপ ও রীতি, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৩

নরেন বিশ্বাস : অলঙ্কার-অন্বেষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কালিকলম, ঢাকা, ১৯৮৮

নীলা গোস্বামী : নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকার, প্রকাশক-শ্রীমতি গৌরী চক্রবর্ত্তী, কলকাতা, ২০০৫

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় : কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ২০০৭

প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দ পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭

প্রথম চৌধুরী : প্রবন্ধসংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮

বরুণকুমার চক্রবর্তী : গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা ২০০৩,

বলরাম মণ্ডল : পুরাণ বিচিত্রা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩

বর্ণিক রায় : প্রতীক অরণ্য, প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা, ১৯৭৬

: কবিতা : চিত্রিত ছায়া, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৮

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র-স্মৃতি [সম্পা. বিশ্বনাথ দে], ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬১

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : কবিতায় বাকপ্রতিমা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ : নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংরা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

: বাংলাদেশের সাহিত্য, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯

বুদ্ধদেব বসু : স্বদেশ ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০ শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (অনুবাদ গ্রন্থ), প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

: আধুনিক বাংলা কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৩

: কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯

বেগম আকতার কামাল : বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

মান্না দে. : জীবনের জলসা ঘরে, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ২০০5

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : হারানো দিনের গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

: ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০5

: পঞ্চ-গীতিকবির গান, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদিরাম দাস : বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪

মঞ্জুভাষ মিত্র : আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৬,

মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

মাহবুব সাদিক : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

: কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : বাংলা কবিতার ছন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৯

রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪

: সাহিত্যের পথে, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৮৮

: বিচিত্র প্রবন্ধ, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৯

: ছন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক-প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬

: রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম-সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬

	:	গীববিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭১
রাজ্যেশ্বর মিত্র	:	রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, [সম্পাঃ পুলিনবিহারী সেন], বাক্-সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৬৮
রূপায়ণ ভট্টাচার্য	:	হৃদয়ে লেখো নাম মান্না, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০
শঙ্খ ঘোষ	:	শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২
	:	ছন্দের বারান্দ, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭
	:	নিঃশব্দের তর্জনী, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাসম কলকাতা, ১৩৭৮
	:	এ আমির আবরণ, প্যাপিরাসম কলকাতা, ২০০৮
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	:	উপমা কালিসাদস্য, ন্ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৩
শান্তিদেব ঘোষ	:	রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫
শাজাহান রহমান	:	বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
শাজাহান ঠাকুর	:	বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
শিখা দত্ত	:	আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০২
শ্যামলকুমার ঘোষ	:	কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ, বইঘর, কলকাতা, ১৩৯৪
শ্রীশচন্দ্র দাশ	:	সাহিত্য-দন্দর্শন, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৯২

সরকার আমিন : বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪

: কবিতার কালান্তর, সান্যাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬

সাঈদ-উর-রহমান : পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অনূদিত) : সঙ্গীতে সুন্দর (মূল : এডুয়ার্ড হ্যান্‌স্‌লিক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : পৌরাণিক অভিধান, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২

সুধীর চক্রবর্তী : আধুনিক বাংলা গান, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯৪

: বাংলা গানের সন্ধানে, অরুণা প্রকাশনী,কলকাতা, ১৩৯৭

: গান হতে গানে, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অক্ষরে অক্ষরে, দ্বিতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৮৪

: কবিতার বোঝাপড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

: কেন লিখি, (সম্পাদিত, প্রণব বিশ্বাস সহযোগে), প্রথমমিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিমার্স,কলকাতা, ২০০০

সুমিতা চক্রবর্তী : আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৬

: আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতয় পর্যায়, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২

সুশীল কুমার রুদ্র : বাংলা ছন্দের রূপ ও তত্ত্ব, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ২০০২

সৈকত আসগর : বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক, বাংলা একাডেমি একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ আলী আহসান : কবিতার রূপকল্প, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

: কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, বইঘর চট্টগ্রাম, ১৩৭৫

: আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭০

স্তেফান মালার্মে : সাহিত্য ও সঙ্গীত (অনুবাদক : হারুন-উর রশিদ : তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০

হুমায়ুন আজাদ : আধার ও আধেয়, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

M. mnvqK Bs‡iwR Mš

C.D. Lweis : The Poetic Image, Jonathan Capc, London, 1968

Dhaka University Institutional Repository

C.M. Bowra : The Haritage of Symbolism, Macmilan & Co. London, 1977

Herbert Read : Collected Essays in Literary Criticism, 2^{nd} cdition, Reprinted, MCMLiv. Faber & Faber Ltd. London, 1950

I.A. Richards : Practical Criticism, Pclican Books, London, 1960

Lillian Feder : Ancient Myth in Modern Poetry, Princeton University Press. Princeton, 1971

M.H. Abrams : A Glossary of Literary Terms, Reprinted, Macmilan Indian Limited, New Delhi,. 1997

Stephan J. Brown : The World of Imagery, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London. 1927

Stephen Spender : The Struggle of the Modern, University Paperbacks, London, 1965 William J. Handy &

Max Westbrook [ed.] : Twentieth Century Criticism: The Major Statements, Indian Edition, Light & Life Publishers. New Delhi, 1976

N. cÎcwÎKvq cKwkZ mnvqK-ceÜ

জীবেন্দু রায় : আধুনিক কবিতার নানা প্রসঙ্গ, আলোক আসর, ৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯০, কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ : 'কবিতা বিচার', ঐকতান, সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

AvawbK evsjv Mv‡bi cUfwg

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

AvawbK evsjv Mv‡bi cUfwg

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ উপন্যাসের শুরুতেই আমরা লক্ষ করি, অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনের নানা আয়োজনের খবর জানাচ্ছেন তিনি। যদিও পাঠক হিসেবে আমরা জানি, পুরো উপন্যাসে অবিনাশ ঘোষালের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো নয়। তবুও এই গল্পের গভীরতর তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন লেখক। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো'। (২০০৬ : ৫/৩৩৯)। সন্ধ্যার প্রদীপ আলোক সঞ্চারে কতোটা সার্থকতার স্বাক্ষর রাখবে, তা অনেকাংশে সকালের সলতে পাকানোর প্রকৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বর্তমান গবেষণাকর্মে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের কাব্যমূল্য বিচারে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাই আধুনিক বাংলা গানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

আমরা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে লক্ষ করবো, বাঙালির সমাজ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ওই পর্যায়ে পূর্ব গৌরব হারিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারের পরিসমাপ্তি তো অন্ধকারে হতে পারে না। আলো জ্বালানোর তীব্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হয়। বাঙালিকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরানোর জন্য সেই সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল কয়েকজন যুগান্তকারী মনীষীর। চিরস্মরণীয় অগ্রদূতগণ হলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৮২), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) প্রমুখ। এই প্রবল প্রতিভাধর ও যুগান্তকারী মনীষীগণের 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়' এর প্রতিভাসে অগণিত বাঙালির নব-জন্মান্তর হয়েছিল সেই সময়ে। ফলে বাঙালির চেতনায়, সমাজে, শিক্ষায়, ধর্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই নবজাগরণ এবং এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় থাকলেও, মানতেই হবে উনিশ শতক বাঙালির যুগান্তর কাল। মনীষীগণ এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ অনুগামীগণের মাধ্যমে এই আন্দোলন ছড়িয়ে

পড়েছিল সমগ্র বাংলায়। এই নবজাগরণের মাধ্যমে জাগ্রত হয়েছিল পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং প্রাচ্যাভিমান। এভাবেই স্বদেশ-চেতনার এবং জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। উনিশ শতকের যুগান্তরকালে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা গেলেও, সংগীতের ক্ষেত্রে বাঙালি অচলায়তনেই বন্দি ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দ্রোহভাবনায় এবং সংগীতনায়কত্বে বাংলা গান সে সময়ে উচ্চাঙ্গসংগীতের কঠোর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে বাণীবদ্ধ করেছেন, আর যা-কিছু তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে তার অমৃত-আস্বাদকেও তিনি আনন্দের সঙ্গেই শিল্পের অবয়ব দিয়েছেন। সাহিত্যের সকল পথেই তাঁর পায়ের চিহ্ন প্রবল এবং প্রাতিস্বিক। পাঠের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালির প্রাণের মানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-বিশ্বের যে সৌরভ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেখানে তিনি তারও বেশি কিছু, আমাদের প্রাণাধিক শিল্পস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্যও তাই এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> শব্দের অনিবার্য সঞ্চয়ে কবিতার যে-আবেগ চেতনার উপরিতলে দোলা দেয়, গানে তা-ই মর্মের মাঝখানে অনায়াসে ঠাঁই করে নেয়। গানের সুরে আছে সেই ধ্বনি যা সহজে সহৃদয়ের কাছে নানা ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে বারবার। সেজন্যেই সাধারণত গানের বাণীকে সুর থেকে আলাদা করলে একটি নিষ্প্রাণ কাঠামো ছাড়া কিছুই মেলে না। বোধ করি, কেবল রবীন্দ্রনাথের গানই ব্যতিক্রম। তার যেসব গানের সুর এখনো আমার অশ্রুত, তাদের মূল তাই আমার কাছে কিছু মাত্র কম নয়। নিছক কবিতা হিসেবে পড়লেও যে-অন্তর্গত সুর গুনগুনিয়ে ওঠে আমার সকল চৈতন্যে, অনেক প্রসিদ্ধ সংগীতকারের সৃষ্টিতেও তেমন অনুরণন জাগে না। হয়তো সে আমার অক্ষমতা, অসামর্থ্য; কিন্তু সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের জয়। তিনি পাষাণেও অনর্গল ফলগুধারা বইয়ে দিতে পারেন। তার প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা ও পরিণামের সাথে অভিন্ন সম্পর্কে মুহূর্তেই আমি আন্দোলিত হয়ে উঠি। এবং বারবার। এমনি তীব্র ও অব্যর্থ সেই সংগ্রাম। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৯১ : ২৪২)

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বজোড়া হলেও নিজের অন্তর্গত উপাসনা ও উপলব্ধি তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। গীতসুধার জন্য আমৃত্যু তৃষিত ছিলেন তিনি। এই তৃষ্ণা নিবারণের নানা আয়োজনের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পিসত্তার মৌলকাঠামো। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন।' (সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৭ : ২৬)। বলার অপেক্ষা রাখে না, রবীন্দ্রনাথের পাঠক যত, তার চেয়ে তাঁর শ্রোতার সংখ্যা অধিক। এমন কোন বাঙালি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার কান সক্রিয় অথচ রবীন্দ্রনাথকে শ্রবণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কাব্যসংগীত তথা

আধুনিক বাংলা গানই সমকালে এবং পরবর্তীকালেও বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পগণকে অনুপ্রাণিত করেছে নব সৃষ্টির জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্বসূরি মনীষীগণকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, তেমনই বাংলা গানের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এতো বৈচিত্র্য আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। তাঁর শোনা প্রাচীন বাংলা গান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এ অত্যন্ত বাঙালির গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচেনি। বাঙালির প্রাণের সঙ্গে গানের সম্পর্ক যে কতো গভীর ও বিবিড় তা রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোন বাঙালি শিল্পস্রষ্টা অনুভব করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতস্রষ্টা হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট আমাদের বিবেচনায় রাখা দরকার। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তাই তাঁর মানসকাঠামো নির্মাণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক:

> জোড়াসাঁকের ঠাকুর পরিবার ছিলেন সংগীতের যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীত নয়, প্রাচীন বাংলা গানেরও সমাদর ছিল এই পরিবারে। সে জন্য ছোটবেলা থেকেই দুই ধারার গান শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথের সংগীতানুরাগই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, তাঁর অন্তলীন স্রষ্টা সত্তারও ঘুম ভেঙ্গেছিল অতি অল্প বয়সে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং লোকসংগীত ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ব্রহ্মসংগীত, বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। 'ব্রহ্মসংগীত'- এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত পদ্ধতিই (শুদ্ধ এবং একটি রাগে সুর নির্মাণ) অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গানের বাণী ও ভাব প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনে, একটি বিশেষ রাগে আবদ্ধ থাকার প্রচলিত ও কঠোর নিয়মে শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে তাঁর স্রষ্টা সত্তা সম্মত ছিল না। নবসৃষ্টি সুগভীর আর্তি তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই আলোড়নই তাঁর মনে দ্রোহভাবনা জাগিয়েছিল। কেন বাংলার সমস্ত গানকে উচ্চাঙ্গসংগীতের কঠোর নিয়ম শৃংখলিত থাকতে হবে? সুরের আধিপত্য মানার জন্য কেন বাণী হবে অবহেলিত? অথচ বাংলার নিজস্ব সংগীতে চিরদিনই তো বাণীর সমাদর! তবে কেন নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া? (জয়তী গঙ্গোপাধ্যায় ২০০৯ : ১৮)

রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটি, দেশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি জানতেন মাটির সঙ্গে সংযোগ না থাকলে কোনো সংস্কৃতিই বেশিদিন বাঁচতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত যেন একটি গাছের ফুলের মত। কোনো এক বিশেষ বাগানের মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে গাছটি তার ফুলের সৌরভ বিস্তারিত করে দেয় সীমাহীন আকাশের দিকে। কিন্তু প্রাণরস সে আহরণ করে সেই বাগানের মাটি

থেকেই। সঙ্গীতের সৌরভও তেমনি সার্বজনীন, চিরকালীন এবং সীমাহীন; কিন্তু তারও প্রাণরস আসবে এক বিশেষ দেশ ও কালের মাটি থেকেই। এই মাটির সঙ্গে যোগ না থাকলে সঙ্গীত প্রাণহীন হতে বাধ্য। সে জন্যই সত্যদ্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কৃতি থেকে উৎকৃষ্ট কিছু গ্রহণ করেও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করেছেন সমস্ত জীবন। সেই প্রাণরস রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতকে সজীব করে রেখেছে বলে, আজও আমরা উজ্জীবিত হই। বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গানের মাধ্যমে। কিন্তু সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান সমস্ত বাঙালির কাছে পৌঁছাতে পারেনি। প্রথম কারণ, সমস্ত গানই তখন শিক্ষিত ও রক্ষণশীল অনেক বাঙালির কাছে ব্রাত্য ছিল। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ গণ্ডীতে সে সময় আবদ্ধ ছিল প্রচারের অভাবে। পরবর্তীকালে পঙ্কজকুমার মল্লিকই শীর্ষে আবদ্ধ সেই গানকে ভাগীরথের মতো প্রথম প্রবাহিত করেছিলেন সমতলে- জনগণের মাঝে। ক্রমশ বেসিক রেকর্ড, বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে বাঙালি জীবনে, মননে। কিন্তু তিরিশের দশকের আগেই হয়তো তাঁর গান সাধারণ মানুষের শ্রবণে ধরা দিতে পারত, যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় সমস্ত বাংলায় অনুষ্ঠান করছিলেন তাঁর বাবার, অতুল প্রসাদের এবং নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য।

উচ্চাঙ্গসংগীতের অন্ধ অনুকরণ করলে বাংলা গান নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় ব্যয় করেন নি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দ্রেহাভাবনার মূলেও ছিল বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়বদ্ধতা। শুধু উচ্চাঙ্গসংগীত কেন, পৃথিবীর সমস্ত সংগীত থেকে গ্রহণে তার আপত্তি ছিল না কোনো দিনও। কিন্তু তিনি চিলেন নবসৃষ্টির পক্ষপাতী। নবসৃষ্টির প্রেরণাতেই তিনি নিজের গানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছেন বারবার। এই পরিবর্তনের পথ ধরেই বাংলা গান তার নিজস্ব গতিপথটি খুঁজে পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকেই আমরা বাংলা গানে নবসৃষ্টির পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাই। তাঁর প্রায় সমকালেই পেয়েছি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনকে। কিছু পরে অতুলপ্রসাদ সেনকে। দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের অবদান সম্পর্কে আধুনিক বাংলা গানের বিখ্যাত গবেষক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন:

> আধুনিক বাংলা গানের ভিত্তি স্থাপনে রবীন্দ্রনাথসহ চারজন এমন প্রবল গীতিকারকে আমরা পেয়ে যাই যে আমাদের গান হয়ে ওঠে স্বয়ম্ভর এবং বিশিষ্ট। পুরোনো বাংলা গানের নানা রূপরীতি যেমন এদের গানে সুষ্ঠুভাবে সমীকৃত হয় তেমনই ওস্তাদি হিন্দুস্থানি গানের সর্বব্যাপী দাপট সেই গানে প্রতিহত হয়। শিষ্ট বাঙালি অর্জন করে তার নিজের গান, নতুন কালের নবীন পরিবেশে। (সুধীর চক্রবর্তী : ১৩৯৪ : ১৪)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নবজাগরণের ছোঁয়া লাগা শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির বাঙালিকেই গবেষক শ্রী চক্রবর্তী 'শিষ্ট বাঙালি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদ

সংগীত সৃজন করেছিলেন আপন-আপন হৃদয়ের আবেগে। কিন্তু পঞ্চগীতিকবি নামে সুপরিচিত পাঁচজনের কনিষ্ঠজন-কাজী নজরুল ইসলাম যখন সংগীত সৃজনে যুক্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর সৃষ্টি সুখের উল্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানির বিপুল চাহিদা। ১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানিতে কর্মগ্রহণ করার সূত্রে তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল সেই চাহিদা পূর্ণ করার। সে কাজটি তিনি হয়তো জীবিকার তাগিদে করেছেন, কিন্তু তাতে কবির প্রাণের সংযোগ থাকায় বাংলা সঙ্গীতের দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়েছে।

নজরুলের গানে গানপাগল বাঙালি এতটাই মেতে উঠেছিল যে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে তাঁর গানের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। সব থেকে বিস্ময়জনক ঘটনা এই যে, ওই দুটি দশকে রবীন্দ্রনাথের গানও নজরুলের গানের মতো জনপ্রিয় হয়নি সাধারণ শ্রোতার কাছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গানের অনিবর্চনীয়-অতীন্দ্রিয় বাণী সাধারণ মানুষকে সেই যুগে সেভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। বরং নজরুলের গানের সহজ সরল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাণী এবং বিচিত্র সুরের মায়াজাল জন্মলগ্ন থেকেই গণদেবতার মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর সৃষ্টিসত্তার অন্তর্গত স্বভাবে তাঁর প্রেমচেতনা প্রবলভাবে বহমান। নজরুল প্রেমের গান, আধুনিক গান, শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী গান–প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার গান রচনা করেছেন। বাঙালির লোকপ্রেমচেতনার প্রত্নপ্রতীক শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধার সম্পর্কের রসায়নে নজরুল যুগপৎ প্রেম ও লোকজীবননির্ভর গান লিখেছেন। (রহমান হাবিব ২০০৯ : ১৩-১৪)

সঙ্গীতের বিদগ্ধ পাঠক ও শ্রোতামাত্রই জানেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার কারণে গ্রামোফোন কোম্পানি আরও অনেক বেশি রেকর্ড করায় আগ্রহী হলে, প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন-নতুন গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীর । বাংলা সংগীত জগতে নজরুলের আগমন সঙ্গীতের দিগন্তকে বহুদূর প্রসারিত করে।

নবজাগরণের প্রভাবে প্রভাবিত শিক্ষিত, প্রগতিশীল বাঙালিই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন নতুন যুগের নতুন ধারার গানকে। কারণ, তাদের তৃষিত হৃদয় বাংলা উপন্যাস ও গীতিকবিতার রোম্যান্টিকতায় অন্য ভুবনের সন্ধান পেলেও রেকর্ডের গানে তখনও পায়নি। রেকর্ডের গানে ছিল ভক্তিগীতি, টপখেয়াল, কৌতুকগীতি, পল্লীগীতি, নাটকের গান, বাংলা টপ্পা প্রভৃতির আধিপত্য। প্রচলিত ও পুরোনো ধারার এই সমস্ত গান প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে পারলেও নব্য যুগের অগ্রপথিক বাঙালি শ্রোতাগণকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারছিল না। রোমান্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নবীন বাঙালি সম্ভবত রেকর্ডের গানের বাণী ও সুরে অচিন লোকের সন্ধান পেতে চাইছিলেন। শুধু তাই নয়, রাগসংগীতের কঠিন শৃঙ্খলামুক্ত বাংলা গানকে তাঁরা একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছিলেন। কণ্ঠ মেলাতে পারলে, গুনগুন করে গাইতে পারলে, অন্তত মনে মনে গাইত পারলে, তবেই তো গানকে আপন করে পাওয়া যায়।

অন্য ভুবনের সন্ধানী ভাবুক, রোমান্টিক ও শিক্ষিত বাঙালি গানের মাধ্যমেও স্বপ্নলোকের চাবির সন্ধান করছিলেন বলেই কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানের মাধ্যমেও যেন সেই প্রার্থিত সম্পদ তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলন। এই গানের কথা বলতে গেলেই গীতিকবিতার কথা এসে যায়। আমরা জানি প্রাচীন গ্রিসে বাণীযন্ত্র বা লায়ার বাজিয়ে যে কবিতা গান করা হত তাকেই লিরিক বলত। লিরিককেই আমরা বাংলায় গীতিকবিতা বলি। গান গাওয়া হোক বা না হোক গীতিকবিতায় কিন্তু গীতিধর্মিতা অন্তর্লীন থাকে। সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি থেকে গীতিকবিতার জন্ম হয়। তাই গীতিকবিতা একান্তভাবে কবিজীবনীর সঙ্গে জড়িত, অবশ্য তার সঙ্গে মর্তজীবনের সম্পর্ক থাকে অল্প। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কল্পনা, সৌন্দর্যও সংগীতের পাখায় ভর করে এক নিটোল রসমূর্তি ধারণ করে, সেই সংগীতময় বাকমূর্তির নাম গীতিকবিতা।

আমাদের এই বাংলায় মধ্যযুগেও প্রচুর গীতিকবিতা রচিত এবং গীত হলেও, সেই গীতিকবিতার ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়েও ধর্মীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বেশি। অনেক সময় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেলেও, সেই অনুভূতি আড়াল খুঁজেছে। আধুনিক যুগের কবির মতো মধ্যযুগের কবি অকপটে বলতে পারেন নি– 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল।' এই ব্যাকুলতারই শিল্পসংহত প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছেন কবিবৃন্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনো কোনো শাক্তপদে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সেই সময়ের কবির গান এবং বাংলা টপ্পায়ও মাঝে মাঝে ধরা দিয়েছে ব্যক্তিগত অনুভূতি। এরপর আধুনিক যুগে ঈশ্বর গুপ্তর দু'চারটি কবিতায় গীতিকবিতার কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলেও ১৮৬২ সালে মধুসূদন দত্ত রচিত 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটির মাধ্যমে যথার্থ আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা হয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, বায়রণ ও শেলির লেখার মাধ্যমে ১৭৯৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক গীতিকবিতার যে প্রবল প্লাবন এসেছিল, তারই উচ্ছ্বসিত ঢেউ বাংলার আধুনিক কবিদেরও প্রস্তাবিত করেছিল। ১৮৬২ সালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মাধ্যমে রোমান্টিক গীতিকবির যাত্রা শুরু হতেই, যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য গীতিকবি। গীতিকবিতার সমস্ত উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা গীতিকবিতার অভূতপূর্ব রূপ, রস, অনুভব এবং সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর লেখা গীতিকবিতার শিল্পরূপ, আবেগ, রোমান্টিকতা এবং প্রত্যয় বাঙালিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আবেগ ও রোমান্টিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও গানের ক্ষেত্রে তাঁর লেখার মনকে ছোঁয়া সহজ ছিল না। তা ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং অনুপ্রাণিত হওয়ার উৎসাহ তিনি বারবার দিয়েছেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য গগনে সূর্যসম। তাঁর গান বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জীবনের যাবতীয় অনুভব ও উপলব্ধিকে গীতবাণীতে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

একটি প্রশ্ন এখানে বিবেচনার দাবি রাখে, প্রকৃতি এবং নারী প্রেমই যদি গীতিকবিতার রচনার প্রধান উপাদান হয়, তবে কী অপরাধ করলেন কাজী নজরুরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেশ রায়, প্রণব রায়, হীরেন বসু, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গীতিকবিগণ প্রেমগীতি লিখে? আর প্রেমের অনুসঙ্গ হিসেবে ফুল, পাখি, চাঁদ, মালা প্রভৃতি নির্দোষ শব্দ যদি কবির বারবার গীতিকবিতায় এসেই থাকে, তাতেই বা কার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখেছেন। অকৃত্রিম আবেগে লেখা বলেই গীতিকবিতার গীতিধর্মিতাও অক্ষুণ্ন ছিল গীতিকবিদের লেখায়। সুর সংযোজন করা হোক বা না হোক সেই সব গীতিকবিতার অন্তর্লীন সুরের অনুরণন হৃদয়ে ঝংকার তোলে। বলাবাহুল্য, সংবেদনশীল সুরস্রষ্টাগণ অশ্রুত সুরের অনুরণন শুনতে সমর্থ হতেন বলেই, তাঁদের সুরসৃজনে গীতিকবিতা সুরের আকাশে গানের পাখি হয়ে সানন্দে ডানা মেলে দিত। এভাবেই সে সময়ে অভিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও, গীতিকবি এবং সুরস্রষ্টার মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য সফল গানের।

বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলামের গানের অভূতপূর্ব চাহিদার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। নজরুলও জানতেন সে কথা। কিন্তু বাণিজ্যিক জগতকে কুক্ষিগত করে রাখতে চাননি কবি। বরং মজলিশী নজরুল অনুজপ্রতীম সঙ্গীত ব্যক্তিত্বগণের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলতে চেয়েছিলেন। উৎসাহিত করেছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে আসা গীতিকবি, সুরস্রষ্টা এবং শিল্পগীণকে। এমনকি বিভাজনপদ্ধতির প্রতিও তাঁর ছিল গভীর আস্থা। আর এ জন্যই তাঁর লেখা অসংখ্য গীতিকবিতায় সুর দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত, শৈলেন দত্তগুপ্ত, ধীরেন দাস, দুর্গা সেন, সুবল দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরস্রষ্টাগণ। সমস্ত কিছু ভাগ করে নিতে জানতেন বলেই, নজরুল ছিলেন সকলের প্রিয় কাজীদা। আর সে জন্যই বাংলা কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছাড়া, যাঁর প্রভাব খুব বেশি লক্ষ করা যায়, তিনি হলেন নজরুল ইসলাম।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম– এই পঞ্চগীতিকবির মাধ্যমে পাওয়া কাব্যসংগীত তথা আধুনিক গানের সমৃদ্ধ পৃথক ভাণ্ডারের পাশেই। তিরিশের দশক থেকে বাংলা গানের আর একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের গড়ে উঠতে থাকে বেসিক ডিস্ক ও ছায়াছবির গানের মাধ্যমে। একজন সমালোচক বলেছেন :

> তিরিশ দশকের কিছু পূর্ব থেকেই বাংলা গানের প্রবহমান ধারাতে নব আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসতে থাকে। বাংলা 'আধুনিক' গানের সৃষ্টি হয় ঐ সময়ের কিছু পরে অর্থাৎ তিরিশি দশকের শুরুতে। এই 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ গীতধর্মের সাঙ্গীতিক রীতিকে বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের সৃষ্টি বলেই এ গান 'আধুনিক' এমন নয়, এই আধুনিকতা মূর্ত হয়েছে ঐ গীতির অভিনব সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্যে। সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা গভীর দার্শনিক

> অভিব্যক্তিময় কাব্য অপেক্ষা সরল সর্বজনবোধ্য পদ রচনা এবং সর্বপ্রকার নিয়মবদ্ধতা পরিহার করে বহু বিচিত্র মিশ্রিত অথচ সুখশ্রাব্য সুর-সংযোজনার সাধারণত ঐ বিশেষ সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাৎপর্যের সার্বিক রূপায়ণ হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ নব ধারার গীতকর্মের গোড়াপত্তন এবং প্রাথমিক বিকাশ নজরুল ইসলামের হাতেই সাফল্যের সঙ্গে হয়েছিল তাঁর বহু বিজিত্র পর্যায়ের গানের একটি ধারাতে (কাব্যগীতি), উল্লিখিত যুগের প্রসারমাণ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলি থেকে। যার মধ্যে গ্রামোফোন এবং সবাক চলচ্চিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (অনুপ ঘোষাল ১৪০৮ : ১৭৩)

আধুনিক গান বলতে যদিও আমরা বেসিক ডিস্কের বিশেষ ধারার বাংলা গানের কথাই বুঝি, কিন্তু এই বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেই দেখব আধুনিক বাংলা গানের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছায়াছবির বাংলা গানেও আমরা পাই। সামান্য যেটুকু প্রভেদ, তা হল চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও কাহিনির প্রয়োজন অনুযায়ী গীতিকবিকে গান লিখতে হয় এবং সেই অনুসারে সুর দিতে হয় সুরস্রষ্টাকে। বেসিক ডিস্কের ক্ষেত্রে গীতিকার এবং সুরকারের যে অবাধ স্বাধীনতা থাকে, ছায়াছবির গানের ক্ষেত্রে অবশ্য তা থাকে না। কিন্তু তিরিশের দশক থেকে প্রায় সমস্ত গীতিকার, সুরকার এবং অনেক শিল্পী সংগীতের এই দুটি বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই, একটি ক্ষেত্রের কথা বলতে গলে অন্য ক্ষেত্রটির কথাও স্বাভাবিক কারণেই এসে যায়। শিল্পসমালোচক অরুণ সরকার এই সময়ের প্রধান গীতিকারদের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা তাঁর বিবেচনা ও মন্তব্যের শরণ নিতে চাই :

> আধুনিক বাংলা গানের আঙিনায় যে সব গীতিকার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলেশ রায়, হীরেন বসু, হিমাংশু দত্ত, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, শ্যামল গুপ্ত, কমল ঘোষ, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (অরুণ সরকার ২০০৬ : ১৫২)

একথা বলা বোধকরি অত্যুক্তি হবে না যে, বেসিক ডিস্কের আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে ছায়াছবির বাংলা গানের তফাৎ আকাশপাতাল নয়। সমকালীন অনুভবের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন বা সারস্বত অভিব্যক্তির শৈল্পিক প্রকাশে এই দুই ধারার গান একই সমতালে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক বাংলা গানের নবনির্মাণ ও বিকাশে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ব দুটি প্রতিষ্ঠান দূরদর্শন ও আকাশবাণীর ভূমিকা থাকলেও সঙ্গীতের বিকাশে তাঁদের সাধ্যের তুলনায় তা ছিল খুবই কম। অন্যদিকে চলচ্চিত্র শিল্প ও সঙ্গীতকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। গ্রামোফোন কোম্পানিও সারাবছর ধরে আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশে তৎপর থাকে না। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

শারদ অর্ঘ্য রূপে তাঁরা বের করেন বেশ কিছু আধুনিক গান। সকলেই মোটামুটি নামকরা বা ব্যবসাসফল (যেমন রুনা লায়লা বা স্বপ্না চক্রবর্তী) শিল্পী। তবু গ্রামোফোন কোম্পানীর এই শারদীয় প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। এই উপলক্ষে তাঁরা 'শারদ অর্ঘ্য' নামে ঝকঝকে একটি পুস্তিকা প্রচার করে। গত কয়েক বছরের 'শারদ অর্ঘ্য' ঘাঁটলে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় আমাদের এখনকার ভাগ্যবান আধুনিক গানের শিল্পীদের। তাঁদের নাম : লতা-আশা-রাহুল-মান্না-সন্ধ্যা-অনুপ-মানবেন্দ্র-তরুণ-পিন্টু হাজারি-স্বপ্না-বনশ্রী-অরুন্ধুতী-হৈমন্তী-আরতি-শিবাজী-শ্রাবন্তী-দ্বিজেন-শ্রীরাধা।

গীতিকারদের মধ্যে থাকেন : গৌরীপ্রসন্ন, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী, সুনীলবরণ, প্রবীর মজুমদার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ, মুকুল দত্ত। সুরকারদের গড়পড়তা তালিকা : সলিল-হেমন্ত-মান্না-স্বপন-রাহুল-বাপ্পী-ভূপেন হাজারিকা-অজয় দাস-অশোক রায়-দিনেন্দ্র-অভিজিৎ-প্রবীর-অনল-নীতা সেন। (সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৭ : ২০৪)

সমালোচকের উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে আধুনিক বাংলা গানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধিতে উদার পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বিষয়ে গবেষকের এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধায় গীতবাণী রচনায় আত্মনিয়োগ করে আধুনিক বাংলা গানে বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আধুনিক বাংলা গানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা রকম নেতিবাচক আলোচনা শোনা যায়। অথচ আমরা জানি, আধুনিক গান অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই যুগধর্মকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছে। বর্তমানের প্রতি উন্নাসিকতা প্রকৃত অর্থে উজ্জ্বল অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের ইঙ্গিত দেয়। 'কালের যাত্রার ধবনি' শ্রবণের মতো কান যাঁদের আছে, তাঁরা জানেন, বিচিছন্নভাবে সময়কে পাঠ করার মধ্যে ভয়ানক বিপদ আছে। সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের প্রয়োজনেই বাস্তবজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করে সঙ্গীতের সমুদ্রে অবগাহন করতে হবে। সাধারণের রুচির প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে নিজের রুচিকে উচ্চতর ভাবার মধ্যে রুচিহীনতারই প্রমাণ মেলে। তাই আধুনিক বাংলা গান নিয়ে হতাশ হওয়ার মধ্যে যে নৈরাশ্যের পদধবনি শোনা যায় তা অস্বাস্থ্যকর। বাংলা গানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন:

আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, সঙ্গীত হিসাবে এর কোনও সার্থকতা নেই। অথচ এর চাহিদা যে যথেষ্ট, তার প্রাণ কম নয়। যে সঙ্গীত একান্ত অকিঞ্চিৎকর তার শ্রোতা সমধিক আর যে সঙ্গীত সারবান তার শ্রোতা স্বপ্ন এমন ঘটনাকে বিরুদ্ধে ঘটনা বলেই স্বীকার করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উঠবে যে, যদি আধুনিক গান একান্তই অসার হয়ে থাকে তবে তার শ্রোতার সংখ্যা এতো ভারি কেন? অনেকে বলবেন, সাধারণ বহু শ্রোতার রুচির বালাই নেই- তারা হাল্কা গানের

পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? অনেক সাধারণ শ্রোতাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপভোগ করতেও দেখা যায়। আসলে এর কারণটা অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে; সাধারণ শ্রোতার রুচির ওপর দোষ দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। (রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৯৭৩ : ১৬৭)

সমালোচক বাংলা গানের সামগ্রিক মূল্যায়নে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচেনার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্য বা সঙ্গীত সাধারণত ঐতিহ্যকে স্বীকার করে এবং ঐতিহ্য সৃষ্টিতেও তৎপর হয়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্টির ভেতর নিজেদের সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন। গানের ভেতর দিয়ে একজন শিল্পস্রষ্টা কেবল পাঠক বা শ্রোতার অন্তরকেই স্পর্শ করার সুযোগ পান না, তিনি নিজের অন্তকরণকেও স্পর্শ করেন। সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

আমি যখন গান বাঁধি তখনি সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে-প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ-সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম–

যবে কাজ করি,
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি,
ভালোবাসে ভগবান।

এ কথা বলি কেন?– এইজন্যে যে, গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে নতুন ক'রে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এ-সব এর তুলনায় বাহ্য– এই'ই হল সারবস্তু– কেননা, এ হল আনন্দলোকের বস্তু, যে লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গান করি না সব চেয়ে সূক্ষ্ম– ethereal- তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১৬/৫৮১-৮২)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গীতবাণী রচনায় রবীন্দ্রনাথের মতোই গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁদের গীতবাণী পাঠ করে পাঠক হিসেবে আমরা আমাদের অন্তর্গত শক্তি ও সম্ভাবনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি।

বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর একাত্মতা ছিল বলেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক গান রচনায় ব্যক্তিত্বচিহ্নিত শিল্পস্রষ্টা হিসেবে সম্মানিত ও স্বীকৃত হয়েছেন। ইতিহাসের প্রকৃত পৃষ্ঠা থেকে পাঠ নিয়েছেন তাঁরা, সেই সঙ্গে যুগধর্মের প্রতিও অবিচার করেন নি। তাই

স্বকালের যাবতীয় অনুষঙ্গের অনুরণন সত্ত্বেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী চিরকালীন শিল্পসম্পদে পরিণত হয়েছে।

Z_¨wb‡‘k

১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারক-গ্রন্থ {সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

২. অরুণ সরকার, বাংলার গান বাংলার গান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬

৩. অনুপ ঘোষাল, গানের ভুবনে। প্রকাশক:শ্রী দেবব্রত কর, কলকাতা, ১৪০৮

৪. রাজ্যেশ্বর মিত্র,বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৩

৫. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা গানের সন্ধানে, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৭

৬. সুধীর চক্রবর্তী, গান হতে গান, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৮

৭. সুধীর চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা গান, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৩৯২

৮. জয়ন্তী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড-অষ্টাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬

১০. রহমান হাবিব, বাংলা গানের ভাবসম্পদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi I cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi gvbmMVb I wkí‡ev‡ai ¯iƒc

দ্বিতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi I cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi gvbmMVb I wkí‡ev‡ai ¯iƒc

হাজার বছরের বাংলা গানের ইতিহাসে আধুনিক গান একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বাংলা গানের বিবর্তনের পথপরিক্রমায় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ত্রিশ- এর দশকের পর থেকে পঞ্চগীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর হাত হয়ে বাংলা গান তার স্বকীয় ধারা পেয়েছে। পরবর্তী কালে দেখা যায় তাঁদের উত্তরসুরী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সলিল চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, অনিল ভট্টাচার্য, কবি পেমেন্দ্র মিত্র, মোহিনী চৌধুরী, মিরাদেব বর্মণসহ অনেক খ্যাতনামা গীতিকারের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বাংলা গানের ভূবনে ব্যতিক্রমী ও সমৃদ্ধ কাব্যমূল্য সৃষ্টিতে এ দু'জন রচিত গান যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। এ পর্যায়ে আমরা সংগীতের এই মহান গীতবাণী স্রষ্টাদ্বয়ের জন্মপরিচয়, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষাজীবন, সাহিত্যচর্চা, সংগীতচর্চা ও সামাগ্রিক জীবন তথা মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ উম্মোচনের প্রয়াস পাবো:

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৪ তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত জীবনে আমাদের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী গান। সেই সব গানের জন্য আজও তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না। অথচ গৌরীপ্রসন্নর পিতা ভারত বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ভেবেছিলেন পুত্র গৌরীপ্রসন্ন বড়ো হয়ে পিতার মতোই বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু সুপণ্ডিত মানুষটির সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। কিন্তু কেন হয়নি সে কথা জানার জন্য আমাদের অতীতে পাড়ি দিতে হবে।

এই সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী মজুমদার পরিবারের আদিনিবাস ছিল পূর্ব বঙ্গের পাবনা জেলায়। কিন্তু গৌরীপ্রসন্নর জন্মের আগেই তাঁরা কলকাতায় বসাবাস শুরু করেন। ১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতাতেই গৌরীপ্রসন্নর জন্ম হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী মীরা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা এবং কলকাতা টেলিফোন বিভাগের কর্মকতা ছিলেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বয়স তখন চার কী পাঁচ। সেসময় তাঁর এক কাকা (আই.সি.এস. জে.এন. তালুকদার) বিলেত থেকে একটা গ্রামোফোন এনে গৌরীপ্রসন্নর মাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই গান শুনে শুনে গৌরীপ্রসন্নর মনে সংগীতানুরাগের জন্ম হয়। একটু বড়ো হওয়ার পরে সংগীতানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে সাহিত্যপ্রীতিও জেগেছিল। এ ছাড়া তাঁর মনে কবিতা লেখার বাসনাও অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১১/১২ বছর বয়স থেকেই তিনি বাংলায় কবিতা লেখা শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর জ্যেঠতুতো দাদা প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক ভূমেন মজুমদার এবং পিতৃবন্ধু ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভূমেন মজুমদার নিজেও গল্প-কবিতা লিখতেন।অনুমান করা যায় মজুমদার পরিবার

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন। সেই আগ্রহ সঞ্চরিত হয়েছিল গৌরীপ্রসন্নর মনেও পরিবার সূত্রেই।

কিশোর গৌরীপ্রসন্ন তখন গভীর আগ্রহে বাংলা কবিতা লিখছেন। নিজের কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখতে কোন কবির না সাধ হয়! গৌরীপ্রসন্নরও হয়েছিল। সেই আশাতেই একটি পত্রিকাতে কবিতা পাঠান। কিন্তু সেই কবিতা ফেরত আসায় গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন জগবন্ধু স্কুলের মেধাবী ছাত্রটি। অভিমানে বাংলা কবিতা লেখা বন্ধ করে ইংরেজি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা ইংরেজি কবিতা পড়ে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন তাঁর ছোটো মেসোমশাই তারাদাস বাগচী। তিনি নিজেও ইংরেজি কবিতা লিখতেন। সেই কবিতা প্রকাশিত হতো বিদেশে পত্রিকায়। এই মেসোসমশাই-এর আগ্রহে ও তৎপরতায় গৌরীপ্রসন্নর লেখা ইংরেজি কবিতা বিলেত ও আমেরিকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের সংগীত সম্মিলনীতে কিছুদিন গান-বাজনা শেখেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সেসময় সংগীত সাধন গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে গান এবং মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের কাছে বেহালা শেখেন গৌরীপ্রসন্ন। গৌরীপ্রসন্নর পিতাই তাঁকে সংগীত সম্মিলনীতে ভর্তি করিছিলেন বন্ধু প্রিয়রঞ্জন সেনের পরামর্শে। অনুমান করা যায় মেধাবী কিশোর- ছেলেটির মধ্যে তাঁর পিতৃবন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনগণ নানাবিধ সম্ভাবনা দেখে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন নানা ভাবে। গান বাজনা ভালোবাসলেও কিন্তু বেশিদিন শিখতে পারেননি গৌরীপ্রসন্ন। মনে হয় লেখাপড়া ও কবিতা লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। পিতা গিরিজাপ্রসন্ন কিন্তু পুত্রের ইংরেজিতে কবিতা লেখা পছন্দ করেননি। তিনি পুত্রকে পুনরায় মাতৃভাষায় কবিতা লিখতে বলেন। পিতার আদেশ অমান্য করেননি গৌরীপ্রসন্ন। এবার কৃতকার্য হলেন তিনি। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বাংলা কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৫ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। পাশ করে ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন ১৬ বছর বয়স। সেসময় শান্তিনিকেতনের ছাত্র অরূপ মিত্র তাঁকে গান লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। সম্ভবত গৌরীপ্রসন্নর লেখা পড়ে অরূপ মিত্র বুঝেছিলেন যে সফল গীতিকবি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে গৌরীপ্রসন্নর। তিনি যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়েই গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয় সংগীতশিল্পী বিমল ভূষণের সঙ্গে। সংগীতানুরাগের সূত্রেই দু'জনের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। সেসময় 'জজ সাহেবের নাতনি' ছবিতে (১৯৪৩ মুক্তিপ্রাপ্ত) শচীন দেববমর্নের সুরে 'বড়ো নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদে রে' গানটি গেয়ে বিমলভূষণ বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। সম্ভবত সেই কারণেই কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি তাঁর কণ্ঠে গান রেকর্ড করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

গৌরীপ্রসন্নর লেখা দুটি গান-'আমি বুঝতে পারি না কি আছে তোমার মনে'। এবং শুধু পত্র ঝরায় অলস চৈত্রবেলা' নিজের সুরে নিজের কণ্ঠে বিমলভূষণ রেকর্ড (জি.ই.-২৯৪৬) করেন। গৌরীপ্রসন্ন এবং বিমলভূষণের সেই প্রথম রেকর্ড ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গান দুটি তেমন জনপ্রিয় না হলেও গৌরীপ্রসন্নর লেখা 'ভালোবাসা যদি অপরাদ হয় তবে অপরাধী আমি' গানটি জনপ্রিয় হতেই গীতিকার গৌরীপ্রসন্নও বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯৪৭ সালের পূজায় বিখ্যাতগায়ক ও সুরকার সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে এবং অপরেশন লাহিড়ীর কণ্ঠে মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ডে জে.এন.ডি. ৫৮৮৭) গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গৌরীপ্রসন্নর মজুমদারের লেখা আরও কয়েকটি গান প্রকাশিত হলেও, সেই গানগুলি তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না, সে জন্য তিনি প্রায় সব রেকর্ড কোম্পানির জন্য গান লিখতে পেরেছিলেন।

একজন নিকট আত্মীয়ের সূত্রে গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয়েছিল ভারতের প্রত ইম্প্রেসারিও বা প্রমাদ পরিবোশক হরেন ঘোষের সঙ্গে। ঘোষ মহাশয়ের মাধ্যমেই চিত্রপরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নর পরিচয় হয়েছিল। হরেন ঘোষের সুপারিশেই পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমে 'অরক্ষনীয়' এবং তারপর 'প্রিয়তমা' ছবিতে গান লেখার সুযোগ দেন গৌরীপ্রসন্নকে।

যদিও প্রথমে মুক্তি পেয়েছিল 'প্রিয়তমা' (১৯৪৮ সালের ২১ মে) ছবির সঙগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' এবং 'স্বামী' ছবির জন্য গান লেখার পর গৌরীপ্রসন্ন ১৯৫০ সালে যুক্ত হয়েছিলেন 'শ্রী তুলসীদাস' ছবির কিছু গান লেখার জন্য। এই ছবির সূত্রেই সংগীত পরিচালক অনুপম ঘটক গৌরীপ্রসন্নর প্রতভার সন্ধান পান।

এরপর গৌরীপ্রসন্ন সমর, জিঘাংসা, রাজমোহনের বৌ, প্রতিধ্বনি, নতুন পাঠমাল, শুভদা, মায়াকানন, সাত নম্বর কয়েদি, বৌদির বোন, হরিলক্ষ্মী, বনহংসী, এবং শুভযাত্রা ছবির জন্য গান লিখলেও ১৯৫৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত অগ্নিপরীক্ষা ছবির বিপুল সংগীতসাফল্যে সংগীত পরিচালক অনুপম ঘটক এবং গৌরীপ্রসন্ন স্মরণযোগ্য গানের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই ছবির ' কে তুমি আমাকে ডাকো', 'যদি ভুল করে ভুল মধুর হল', 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২২) 'ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্ন ভরা সম্ভাষণ'(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৪)- গানগুলি মানুষের বুকে ঝড় তুলেছিল সুরের জাদুতে, গানের বাণীর কাব্যময়তায় রোমান্টিকতায় এবং ছন্দের দোলায়।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই মনোমুগ্ধকর গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে আজও কালজয়ী হয়ে আছে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া-‘জীবন নদীর জোয়ার ভাটায় কত ঢেউ ওঠে পড়ে/ সে হিসাব কভূ রাখে কি কালের খেয়া (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২৫)।’ এই গানটি শুনলে অনুভব করা যায় গৌরীপ্রসন্ন একজন যথার্থ মরমি কবি ছিলেন। মানব জীবনের পরম সত্যকে তিনি শুধু অনভবই করেননি, ভাষায় রূপও দিয়েছিলেন যথার্থ স্রষ্টার মতো।

‘অগ্নি পরীক্ষা’র আকাশ ছোঁয়া সাফল্যের পর প্রায় সমস্ত সংগীত পরিচালক এবং সুরকারগণ বুঝেছিলেন গৌরীপ্রসন্নর গান লেখেন, ‘নিষিদ্ধ ফল’, ‘অনুপমা, দত্তক’, ‘সাজঘর’, ‘দেবত্র’ ‘ছোটবউ’, ‘পথের শেষে’, ‘ঝড়ের পরে’, ‘বিধিলিপি’, ‘জয় মা কালী বোর্ডিং’, ‘উপহার’, ‘গোধূলী’, ‘দেবী মালিনী’, ‘ভালোবাসা’, ‘রাতভোর’, ‘পরেশ’, ‘দুজনায়’, ‘সবার উপরে’ ‘কালিন্দী’, ‘অর্ধাঙ্গিনী’ ছবির জন্য। কয়েকটি ছবি ছাড়া প্রায় সব ছবির গান গৌরীপ্রসন্ন একাই লিখেছিলেন। এই ছবিগুলির অনেক গানই জনপ্রিয় হলেও কালজয়ী হয়ে আছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ভালবাসা ছবি তুমি যে আমার প্রথম রাতের পথ চেয়ে থাক দীপের ভাতি/তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের লজ্জা জড়ানো ছন্দ ওগো (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৬৬)। এবং সবার উপরে ছবির জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৬১) এবং ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৮)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সম্পর্কে শিল্প সমালোচক জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য:

> গীতিকার হিসেবে গৌরীপ্রসন্নর বিশেষ সাফল্যের কারণ তিনি ছায়াছবির কাহিনি এবং দৃশ্যের প্রয়োজনে এমন গান লিখতেন যে সেই গান হয়ে উঠত কাহিনি ও চরিত্রের না বলা কথার পরিপূরক। অথচ ছায়াছবি না দেখে শুধু গানগুলি শুনলেও গানের আবেদন একটুও কমে না। এখানেই গীতিকার, সুরকার এবং সংগীত-শিল্পীর যথার্থ সাফল্য। (এ শুধু গানের দিন, তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস কলকাতা, ২০০৯)

১৯৬৫ সালেও গৌরীপ্রসন্ন বারোটি ছবি জন্য গান লিখেছিলেন। ‘ছায়াসঙ্গিনী’ ছবিটির কাহিনি ও চিত্রনাট্য তিনিই লেখেন। ওই বছরে ‘সাগরিকা’, ‘অসমাপ্ত’, ‘সূর্যমুখী’ ও ‘নবজন্ম’ ছবির গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বিখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ‘সাগরিকা’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। উত্তম-সচিত্রা অভিনীত এই সুপারহিট ছায়াছবির গানগুলিও সুপারহিট হয়েছিল। রোমান্টিক ও হৃদয়স্পর্শী ছায়াছবির নায়ক-নায়িকা এবং গুরুত্বপূর্ণ সহনায়িকার হৃদয়ের কথা প্রকাশের জন্য গানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এসবই প্রয়োজন সার্থকভাবে পূর্ণ করেছেন কবি প্রণব রায় এবং গৌরীপ্রসন্ন।

মর্মস্পর্শী গানের বাণী সুযোগ্য সংগীত পরিচালকের সুরযোগজনায় প্রাণ পেয়ে সুরের আকাশে ডানা মেলেছিল কণ্ঠশিল্পীগণের প্রাণঢালা পরিবেশেনে। কালজয়ী গানগুলি আজও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করছে।

শ্যামল মিত্রর গাওয়া 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে/সাত সাগর আর তের নদীর পারে−/ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা দেখে এলাম তারে/ এ এক রূপকথারই দেশ-ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ/তারারই ফুল পাপড়ি ঝরায় যেথায় পথের ধারে' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৬)। উত্তমকুমারের লিপে এ গান শুনে উজ্জীবিত হয়েছেন সমস্যা-জর্জরিত সে সময়ের বাঙালি। বাস্তবের কঠিন মাটিতে অবস্থান কালে রূপকথার দেশের জন্য মনে মনে সকলেই তো ব্যাকুল হন! এ গানের সঙ্গে অনায়াসে শ্রোতার একাত্ম হয়েছেন।

সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেছিলেন- 'এই তো আমার প্রথম ফাগুনবেলা', 'পাখি জানে ফুল কেন ফোটে গো ফুল জানে পাখি কেন গান গায় (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৭)।' রোমান্টিক এই সহজ- সরল গান দু'টি অনায়াসে আমাদের মনের বীণায় ঝংকার তোলে। আমরা মন মনে দোসর হয়ে উঠতে চাই।

সংগীত প্রধান 'অসমাপ্ত' মুক্তি পেয়েছিল ওই বছরই। এই ছবিতে সুরকার ছিলেন পাঁচজন। গীতিকার ছিলেন ছয়জন। দশটি গানের মধ্যে চারটি লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। নচিকেতা ঘোষের সুরারোপিত 'কান্দো কেনে মনে রে,/আঁধার আলোর এই যে খেলা/ এই তো জীবন রে' (শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) এবং 'রিমিক ঝিমিক ছন্দে যমুনায় কে যায়' (শিল্পী লতা মঙ্গেশকর)− গান দু'টি বাণী ও সুরের জাদুতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় 'সূর্যমুখী'। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আকাশের অস্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে' এবং 'আমার সূর্যমুখী তোমার মুখের পানে শুধু ওগো চেয়ে থাকে'- গান দুটিতে ধরা দিয়েছে নায়িকার মনের না বলা কথা। হেমন্তের গাওয়া 'ও বাঁতি ডাকে সে' গানটিও শুনতে ভালো লাগে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাঙালি তখনও ভালোবসার ক্ষেত্রে লাজুক ছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে মন আশা-নিরাশায় আন্দোলিত হত। আর সেই উথালপাতাল-করা মনের খবর তো মুখে সোজাসুজি বলা সম্ভব ছিল না, তাই গানের আড়াল খোঁজা।

সংবেদনশীল, অন্তর্মুখী কবি গৌরীপ্রসন্নর অনুভবে অনায়াসে ধরা দিত মানুষের গহন মনের অনুভূতি। সেইসব অনুভূতি তিনি গীতিকবিতায় ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতেন। ওই বছরই (১৯৬৫) মুক্তিপ্রাপ্ত 'নজন্ম' ছবিতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া− ওরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে' গানটি কালজয়ী হয়ে

আছে। এই ছবিতেও সুরকার নচিকেতা ঘোষ ও গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। এরপর ১৯৫৭ সালে অনেক ছবির জন্য গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন । গৌরীপ্রসন্নর লেখা-‘কেউ নয় সাহেব বিবি– কেন) ওরা পাবে সেলাম শুধু/তুমি আমি দয়াই পাই,। (বল) বকশিস চাই না মালিক/হিসাবের পাওনা চাই’। শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই জনপ্রিয় দ্বৈতসংগীতটি শুনলে বোঝা যায়, একটিও শব্দ না লিখে গৌরীপ্রসন্ন কত সহজে কঠিন জীবনসত্যকে ধরতে জানতেন। জানতেন বঞ্চিত মুনুষের হয়ে প্রতিবাদ জানাতে।

সূচিত্রা উত্তম অভিনীত ‘হারানো সুর’ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গীতা দত্তর গাওয়া– ‘তুমি যে আমার’ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘আজ দু’জনার দুটি পথ ওগো/দুটি দিতে গেছে বেঁকে’– আজও কালজয়ী হয়ে আছে। প্রথম গানটিতে মূর্ত হয়েছে নায়িকার আত্নহারা ভালোবাসার কথা। দ্বিতীয় গানটিতে নিয়তির কঠিন পরিহাসে বিচ্ছিন্ন দম্পতির ট্রাজেডি মূর্ত হয়েছে। ‘চন্দ্রনাথ’ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই ছবির গান লেখার জন্য তাঁর প্রিয় গীতিকবি প্রণব রায়কে এবং গৌরীপ্রসন্নকে নির্বাচন করেছিলেন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা– ‘মো ভীরু সে কৃষ্ণকলি’ যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন শরৎকাহিনি ‘চন্দ্রনাথ’ এর ভীরু নায়িকার মনের গোপন কথা কি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে গীতিকবির কলমে। এই কাহিনির এক বিচ্ছেদলগ্নের করুণ মুহূর্তকে মূর্ত করেছিলেন ছবির অন্য গীতিকার প্রণব রায়। হেমন্তর গাওয়া সেই গানটি– ‘ঐ রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে/ সোনার প্রতিমা কে গো অকালে ভাসায় রে’ শুনলে বোঝা যায় অতীতে ছায়াছবির জন্য গান লেখার সময়েও গীতিকবিগণ তাঁদের কবিসত্তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন।

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে মুক্তি পায়- রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ‘পথে হ’ল দেরী’। বাংলার সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গেভাকালারে নির্মিত ছায়াছবির জন্য গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত জনপ্রিয় এই চলচ্চিত্রের সংগীতসাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জ্বেলে/ফাগুন বেলা/ রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলি’, তুমি না হয় রহিতে কাছে– কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে’, ‘এ শুধু গানের দিন– এ লগন গান শোনাবার’, ‘এই সাঁঝ ঝরা লগনে আজ’ এবং আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া– ‘কাকলি-কূজন আর ভ্রমরের মধু গুঞ্জন/একি সাড়া পাই গো, একি সাড়া পাই’– সবর্কটি গানই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৫৮ সাল। ছায়াছবির জগতে গৌরীপ্রসন্নর চাহিদা তখন তুঙ্গে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষের মতো অন্যান্য সফল সংগীত পরিচালকগণও তখন গৌরীপ্রসন্নকে দিয়ে গান লেখাতে আগ্রহী। গৌরীপ্রসন্নও কম আগ্রহী নন। ওই বছরও একটার পর একটা ছবির জন্য গান

লিখে চলেছেন তিনি, তবু সব ছবি তো সমান জনপ্রিয় হয় না নানা কারণে। আর ছবিকে দর্শক সে ভাবে গ্রহণ না করলে গানও অশ্রুত থেকে যায়। অথবা খুব কম লোকই শুনতে পায়।

এ ক্ষেত্রে ছায়াছবির সাফল্য সংগীতের সাফল্যের সহায়ক হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে গান ভালো লাগলে দর্শক একাধিকবার ছবিটি দেখার আগ্রহ বোধ করেন। এবং জনপ্রিয় গান দর্শকদের (যাঁরা দেখেননি) ছবি দেখার আগ্রহকেও উস্কে দেয়। বলা বাহুল্য, ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তার এ দেশের মানুষের গভীর সংগীতানুরাগ মূলে রয়েছে।

১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভানু পেল লটারি', 'লুকোচুরি' 'শিকার', 'ঈন্দ্রাণী', 'যৌতুক', 'সূর্যতোরণ' প্রভৃতি ছবির সংগীতানুরাগই এর মূলে রয়েছে।

'ভানু পেল লটারি' (সংগীত পরিচালনা–নচিকেতা ঘোষ) ছবির'পুতুল নেবে গো পুতুল', 'লুকোচুরি' (সংগীত পরিচালক– হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) ছবির 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায়, 'এক পলকের একটু দেখা', 'শুধু একটুখানি চাওয়া,' 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ', 'শিকার' (সংগীত পরিচালনা- হেমন্ত মুখেপাধ্যায়) ছবির 'না জানি কোন ছন্দে', শরমে জড়ানো আঁখি', 'ঈন্দ্রাণী', (সংগীত পরিচালন– নচিকেতা ঘোষ) ছবির 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই', সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো', দূরের তুমি আজ কাছের তুমি হলে', সুন্দর জানো নাকি তুমি কে আমি কার', ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে', 'সূর্যতোরণ (সংগীত পরিচালক– হেমন্ত মুখেপাধ্যায়) ছবির 'আমার জীবনে নেই আলো' প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় গানের মাধ্যমে গৌরীপ্রসন্ন বাংলা ছায়াছবির গানের জগতে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন।

১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বন্ধু' ছবির গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি নিয়ে নির্মিত 'বন্ধু' ছবির সংগীত পরিচালনা করেন স্মরণীয় হয়েছিলেন সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই ছবির 'মালতী ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি', মৌ বনে আজ মৌ জমেছে' গান দুটি শুনে মুগ্ধ হননি এমন বাঙালি নেই বললে চলে ।

১৯৫৯ সাল। 'জান্মান্তর', মরুতীর্থ হিংলাজ', 'নীল আকাশের নীচে', 'চাওয়া পাওয়া', 'দ্বীপ জ্বেলে যাই', 'গলি থেকে রাজপথ', খেলাঘার', সোনার হরিণ', 'অবাক পৃথিবী', 'পার্সোন্যাল এ্যাসিসটেন্ট' ছবির জন্য অসাধারণ সব গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

গীতা দত্তর গাওয়া ছায়াছবির কালজয়ী কয়েকটি গানের উল্লেখ করলেও, শিল্পীর নাম দেওয়া হয়নি। সোনার হরিণ' ছায়াছবির 'এই মায়াবী তিথি' এবং 'তোমার দুটি চোখে ঐ যে মিষ্টি হাসি। গানদুটি শুনলে গীতা দত্তর মধুর কণ্ঠের মদির আবেদনই শুধু আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে না, সেই সঙ্গে গীতিকার

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারও এবং এই ছায়াছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দায়বদ্ধতার প্রতিও আমাদের সচেতন করে। সেসময়ে ছায়াছবির গানের ক্ষেত্রে এভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হত দৃশ্যের প্রয়োজনকে।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই গাইলেন– তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ/একি অভিশাপ, নাই প্রতিকার/মিথ্যাই জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার.....' এই গান শুনলে আমাদের বুক ব্যথায় ভরে যায়। যেন অনিকেত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই অন্য গানটি লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন– 'পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব–/মাগো বল কবে শীতল হব।/কতদূর আর কত দূর বল মা?' দিশাহারা আমাদের মনও তখন জানতে চায় কতদূর আর কতদূর? আর তখনই শুনতে পাই– 'যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও–/জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও/মাগো তুমি ছাড়া এ আঁধারে গতি নাই/ তোমায় কেমনে ভুলে রব' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৭) কালজয়ী এই গান দুটি বাংলা গানের ভাণ্ডারে দুর অমূল্য রত্ন।

'নীল আকাশের নীচে'ও মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৯ সালেই। মৃণাল সেন পরিচালিত এই অসাধারণ ছায়াছবিতে দু'টি মাত্র গান দিয়েছিলেন সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেই দুটি গানই কালজয়ী হয়েছে। হেমন্তর গাওয়া গান দুটি– 'ও নদীরে/একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে/বল কোথায় তোমার দেশ/ তোমার নাই কি চলার শেষ?' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৯) অন্য গানটি 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী'। প্রথম গানটি শুধু ভালোই লাগে না, নদীর অনন্ত যাত্রার সঙ্গী হয়ে আমাদের মনও উধাও হতে চায়। দ্বিতীয় গানটি আমাদের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। আমরা অনুভব করি সংবেদনশীল কবি–গৌরীপ্রসন্ন শুধু রোম্যান্টিক পৃথিবীরই খবর রাখতেন না, তিনি আকাশে-বাতাসে মানুষের কান্নাও শুনতে পেতেন। শুধু শুনতেই পেতেন না, সেই বেদনার ইতিহাস তিনি ধরতে চেয়েছিলেন– 'নীল আকাশের মাঝে এবং কলম সংগ্রামে। তিনি মানুষের সমস্ত অনুভূতিকে গীতিকবিতায় রূপ দিতে জানতেন। জানতেন স্বপ্নসন্ধানী মানুষকে রোম্যান্টিক জগতের সন্ধান দিতে।

১৯৫৯ সালে 'চাওয়া পাওয়া'র পর দ্বীপ জ্বেলে যাই' ছায়াছবির জন্য বিপুল সাফল্য লাভ করেন হেমন্ত-গৌরীপ্রসন্ন জুটি। হেমন্তর কণ্ঠে– এই রাত তোমার আমার' এবং লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'আজ যেন নেই কোন ভাবনা' জনপ্রিয় হয়। এই ছবিতেই একজন মদ্যপ মানুষের কণ্ঠ ছিল– 'এমন বন্ধু আর কে আছে, দৃশ্যের প্রয়োজনে লেখা দারুণ গান। ওই বছরই 'সোনার হরিণ', 'অবাক পৃথিবী', এবং 'পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট' ছবির জন্য গান লেখার পর ১৯৬০ সালে গৌরীপ্রসন্ন গান লেখেন 'রাজাসাজা', কুহক,' উত্তরমেঘ', বাইশে শ্রাবণ', 'ক্ষুধা', 'ঈন্দ্রধনু', 'চুপি চুপি আসে', ' কোন একদিন', 'হসপিটাল', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'শহরের ইতিকথা', 'শেষ পর্যন্ত', 'বিয়ের খাতা', 'শুন বরনারী' এবং অপরাধ ছবির জন্য।

স্মৃতি থেকে অনেক গান মুছে গেলেও 'কুহক' ছবির- 'আরো কাছে এসো/যায় যে বয়ে রাত', নওল কিশোরী গো', পেয়েছি পরশমাণিক', সারাটি দিন ধরে', 'ইন্দ্রধনু' 'ছবির ' যদি কোন দিন ঝরা বকুলের গন্ধে', 'হসপিটাল' ছবির 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়- 'একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২০২) 'স্মৃতিটুকু থাক' ছবির 'কিছু খুশি কিছু নেশা ভরা এই', 'মনের মাধুরী শিশায়ে আমি তোমারে করেছি রচনা' প্রভৃতি গানের কথা ভুলা যায় না। জনপ্রিয় ছবিটির সংগীতসাফল্য আজও স্মরণীয় করে রেখেছে সংগীত পরিচারক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে। এই ছবির জনপ্রিয় গানগুলি আমাদের আজও মুগ্ধ করে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একক কণ্ঠে গাওয়া 'কেন দূরে থাক শুধু আড়াল রাখো', 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘওে'; 'এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু' এই তিনটি গান ছাড়া সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়া– 'আমরা বাঁধন ছেড়ার জয়গানে/নির্মম, নির্ভীক, উদ্দাম, উচ্ছল আমরা/নেইতো পিছিয়ে যাবার ভয় প্রাণে- গানটি আজও আমাদের উজ্জীবিত করে।

১৯৬১। ছায়াছবির জন্য অবিরাম লিখে চলেছেন গৌরীপ্রসন্ন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'সাথীহারা', মিস্টার এন্ড মিসেস চৌধুরী', 'অগ্নি সংস্কার', 'স্বরলিপি', মধ্যরাতের তারা', 'পঙ্কতিলক', কঠিন মায়া', 'আশায় বাঁধিনু ঘর', 'সপ্তপদী', 'দুইভাই' ছবির গানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' ছবির 'ভরা গাঙ্গে ভয় করিনে, ভয় করি ওই বানের জল', 'অগ্নিসংস্কার' ছবির 'একটি সুখের নীড়', 'আমার দুয়ারখানি বাতাস এসে', 'কে ডাকে আমায়', 'মধ্যরাতের তারা' ছবির- 'তোমার এত ভালোবাসা কোথায় আমি রাখবো বল না?' 'সপ্তপদী' ছবির 'এই পথ যদি না শেষ হয়', 'দুইভাই' ছবির 'ওগো যা পেয়েছি', 'তারে বলে দিও', আমার জীবনে এত খুশি' প্রভৃতি সফল গানের মাধ্যমে গৌরীপ্রসন্নর জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। বলাবাহুল্য সংগীত পরিচালক এবং শিল্পীগণও এই জয়যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন।

১৯৬২ সালে গৌরীপ্রসন্ন গান লেখেন 'স্যরি ম্যাডাম,' 'বিপাশা', 'আগুন', 'বন্ধন', 'কাজল', 'দাদাঠাকুর', 'নবদিগন্ত', ও 'ধূপছায়া' ছবির জন্য। 'স্যরি ম্যাডার' ছরিব 'রাধা চলেছে মুখটি ঘুরায়ে', 'বিপাশা' ছবির আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি, 'ক্লান্তির পথ বুঝিবা ফুরলো' জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অতল জলের আহ্বান' ছবিতে সুজাতা চক্রবর্তী 'ভুল সবই ভুল'– এ একটি মাত্র গান গেয়েই স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে গেয়েছিলেন 'এ কী চঞ্চলতা জাগে'। 'দাদা ঠাকুর' ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর) এবং গৌরীপ্রসন্নর লেখা গান ব্যবহার করেন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা- 'কণ্ঠে আমার কাঁটার মালা' (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং 'ও শোন রে আমার মনমাঝি' (হেমন্ত) গান দু'টি হয়েছিল।

অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, কালীপদ সেন, রাজেন সরকার প্রমুখ সফল সংগীত পরিচালকগণ ছায়াছবির গানের জন্য বারবার গৌরীপ্রসন্নর লেখা গীতিকবিতায় সুর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

১৯৬৩ সাল। গৌরীপ্রসন্ন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মেলবন্ধনে মুক্তি পেয়েছে 'এক চুকরো আগুন', 'বর্ণচোরা', হাইহিল', 'পলাতক', 'ত্রিধারা', 'বাদশা'। 'ত্রিধারা ছবির গান তেমন জনপ্রিয় না হলেও অন্য ছায়াছবিগুলির গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

'এক টুকরো আগুন' ছবিতে উৎপলা সেন গাওয়া– 'ও বিরহী সরে থেকো না' গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'বর্ণচোরা' ছবিতে হেমন্তের গাওয়াথ 'আর কত নেভা দীপ জ্বালি', হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে-'ওরে বাতাস ফুলশাখাতে' এবং হেমন্ত ও অন্যান্য শিল্পীদের গাওয়া– 'এখানে সবই ভালো' শ্রোতাদের আজও ভালো লাগে। 'হাইহিল' ছবির হেমন্তের গাওয়া 'মল্লিকা ও মল্লিকা' সন্ধ্যায় গাওয়া 'মধুচন্দ্রের চন্দর মাখা' এবং হেমন্ত-সন্ধ্যার দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া 'এই ছন্দে ছন্দে ভরা' গানগুলি নিশ্চয় ভুলে যাননি?

'বাদশা' ছবির গানগুলি তো আজও সকলের মনে আছে। রাণু মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া-' শোন্ শোন্ শোন্ মজার কথা ভাই', 'লালঝুটি কাকাতুয়া', হেমন্ত ও রাণুর গাওয়া- 'এই মজার মজার ভেল্কি দেখো' গানগুলি যেমন 'বাদশা'র কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছিল, তেমনই দনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া 'ও তুই ঘুমের ঘোরে থাকবি কত আর' গানটি 'বাদশা' ছবির অর্ন্তনিহিত গূঢ় সত্যকে প্রকাশ করেছিল। ১৯৬৩ সালে সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রের জন্য গৌরীপ্রসন্ন গান লেখেন 'ভ্রান্তবিলাস' (এই ছবির অন্য দুই গীতিকার ছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'হাসি শুধু হাসি নয়' এবং 'দেয়ানেয়া' ছবির জন্য একই গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন। 'দেয়ানেয়া'র গান কালজয়ী হয়েছে। শ্যামল মিত্রের গাওয়া-'জীবন খাতার প্রত পাতায়', আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন', 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি', শ্যামল ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা' এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মাধবী মধুপে হল মিতালী' প্রভৃতি ছবিটির বাণিজ্যিক সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের শিল্প প্রতিভা সম্পর্কে বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যাক:

> বাঙালির সংগীত ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় যে বাঙালি জীবনে সংগীতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সুখে, দুঃখে আনন্দে, ভক্তি ও প্রেম নিবেদনে, দেশপ্রেম প্রকাশে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে এবং বিনোদনে

> আমরা সঙ্গীতের সাহায্য নিয়েছি চিরদিন। বিনোদন মাধ্যমগুলিও সেজন্য সবসময় সংগীতের সাহায্য নিয়েছে। ছায়াছবি একটি শিল্প মাধ্যম হলেও অবশ্যই বিনোদন মাধ্যমও বটে। সে জন্য বাণিজ্যিক সাফল্য অপরিহার্য বলে এই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁদের দায়বদ্ধতা কম নয়। গৌরীপ্রসন্ন সেই দায়বদ্ধতা পালন তো করেছেনই, সেই সঙ্গে আপন কবিতসত্তার প্রতিও দায়বদ্ধ থেকেছেন সমস্ত জীবন। কখনো-কখনো দৃশ্যের প্রয়োজনে হালকা রসের গান লিখলেও তাঁর লেখা বেশির ভাগ গানে ধরা দিয়েছে কাব্যসুষমা, রোম্যান্টিক ভাবনা, ছন্দের কুশলাত এবং মানবমনের চিরন্তন নান অনুভূতির কথা। (এ শুধু গানের দিন', তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস কলকাতা ২০০৯)

সাহিত্যের ছাত্র গৌরীপ্রসন্ন (ইংরেজিতে এবং বাংলায় এম.এ) জানতেন গীতিকবি ধর্মর। মরমিয়া গীতিকবি গৌরীপ্রসন্ন গান লিখেছেন মধুর ও সহজ কথায়। সেইসব গান সহজেই ছুঁয়েছে মানুষের মন। বলাবাহুল্য গৌরীপ্রসন্নর লেখা গীতিকবিতার গীতিময় আবেদন অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগীত পরিচালকগণকে।

১৯৫১ সালে মীরা দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। নিঃসন্তান গৌরীপ্রসন্নর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যাই হোক, গানে-গানে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো নিবিড়। সেই আন্তরিক সম্পর্কের সূত্রে আমরা ফিরে যাব। ১৯৬৪ সালে গান লিখলেন 'সপ্তর্ষি', 'বিভাগ', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'প্রভাতের রঙ', 'কাঁটাতার', 'নতুন তীর্থ', 'মহাতীর্থ কালীঘাট', ছবির জন্য। 'বিভাস' ও 'নতুন তীর্থ' ছবির গান ভালো হলেও, সুপারহিট না হওয়ায় কালজয়ী হয়নি। হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ স্মরণে রেখেছেন।

১৯৬৫ সাল। কলম থামানোর উপায় নেই গৌরীপ্রসন্নর। 'তৃষ্ণা', 'আলোর পিপাসা', 'মহালগ্ন', 'অন্তরাল', 'রাজকন্যা', 'ভারতের সাধক', 'সূর্যতপা', 'তাপসী', ছবির জন্য গান লেখেন তিনি। সুধীন দাশগুপ্তের সংগতি পরিচালিত 'অন্তরাল ছবির গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শ্যামল ত্রির গাওয়া 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা', 'তুমি কি এমনি করেই', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া- 'ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ কাঁকনে কি সুর' এবং সন্ধ্যা-শ্যামলের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া– 'সারাদিন তোমার কথাই মনে পড়ে' আজও শুনতে ভালো লাগে।

শ্যামল মিত্রর পরিচালনায় 'রাজকন্যা' ছবির গানও জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'এ যেন অজানা এক পথ'- উত্তমকুমারের লিপে অপূর্ব লেগেছিল। বিখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলের গাওয়া- 'নেই সেই পূর্ণিমা রাত' শুধু শ্রোতাদেরই ভালো লাগেনি, এই গানটি আশা ভোঁসলেরও প্রিয় গান।

১৯৬৬ সালে গৌরীপ্রসন্ন গান লেখেন- 'সুশান্ত শা', রাজদ্রোহী', 'শুধু একটি বছর', 'হারানো প্রেম' এবং 'লবকুশ' ছবির জন্য। রাজদ্রোহী, ছবির সংগীত পরিচালনা করেন ওস্তাদ আলি আকবর খান। এই ছবির সব গান মনে না– পড়লেও মনে আছে শ্যামল মিত্রর গাওয়া– 'কোথাও আমার নেই সময় থামার'। 'শুধু একটি বছর' ছবির কাহিনিও গৌরীপ্রসন্নর লেখা। রবীন চট্টোপাধ্যায় এই ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। হেমন্তের গাওয়া 'স্বপ্ন জাগানো রাত', 'যে আমার মন নিয়েছে' আজও শুনতে ভালো লাগে।

১৯৬৭ সাল। উত্তম-অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনীত সফল ছায়াছবি 'নায়িকা সংবাদ' এর গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য গান লেখেন মোহিনী চৌধুরী (পৃথিবী আমারে চায়' খ্যাত) এবং গৌরীপ্রসন্ন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'এই পূর্ণিমা রাত' হেমন্তর স্বর্ণকণ্ঠে এবং 'আজ চঞ্চল মন যদি'– সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠে অতি শ্রবণ সুখকর হয়েছিল।

'বালিকা বধূ' ও সংগীত সাফল্য অর্জন করেছিল। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের গানের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নর লেখা গানও ব্যবহার করেন। এই ছবির বিখ্যাত হোলির গান 'লাগ লাগ রঙ্গের ভেল্কি লাগ পরাণে লেগেছে ফাগুয়া' আমাদের মনেও রং লাগিয়ে দেয়।

'খেয়া' ছবির সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র নিজেই গেয়েছিলেন– 'আমার মন এখানে রাখাল রাজা'। এই ছবিতে হেমন্ত গেয়েছিলেন, 'বিধিরে, এই খেয়া বাইব কত আর'।

'দুষ্টু প্রজাপতি'র সংগীতসফল 'এন্টনি ফিরিঙ্গী'র জন্য গান লেখেন প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন। অনিল বাগচী এই ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়ারী ঝাড়' গানটি মান্না দে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দু'জনেই আলাদা করে গেয়েছিলেন।

গৌরীপ্রসন্নর লেখা– 'আমি যামিনী তুমি শশী হে' গানটি করেন মান্না দে। 'আমি যে জলসাঘরে' এবং 'আমি যামিনী' শুধু জনপ্রিয় হয়নি, কালজয়ীও হয়েছে।

১৯৬৮ সাল। 'পথে হল দেখা'র পর 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির কাহিনি ও গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন। এরপর 'পরিশোধ' ও 'রক্তলেখা' ছবির জন্য গান লেখেন তিনি। দুঃখের বিষয় কালের গতিতে গানগুলি আজ স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

১৯৬৯ সাল 'চিরদিনের', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'দুরন্ত চড়াই', শেষ থেকে শুরু', 'চেনা অচেনা', ছবির গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন। 'চিরদিনের ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। মান্না দে'র গাওয়া- 'লাল নীল সবুজেরি মেলা বসেছে', 'মানুষ খুন হ'লে পরে', 'ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল'। গানগুলি

কালজয়ী হয়েছে। মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া– 'তুমি আমার চিরদিনের' আজও শুনতে ভালো লাগে। এই সংগীত সাফল্যের কিছুটা কৃতিত্বের দাবিদার আমাদের প্রিয় নায়ক উত্তমকুমার। তাঁর লিপে গান যেন অন্য মাত্র পায়।

১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নিশিপদ্ম' ছবিটি সংগীতসফল হয়েছিল। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন, চণ্ডীদাস বসু, এবং ছবির পরিচালক অরবিন্দু মুখার্জী স্বয়ং। মান্না দে'র গাওয়া– 'না না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না' এবং ' যা খুশি ওরা বলে বলুক' গান দু'টি লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন।

এরপরেও অসংখ্য ছায়াছবির গান লিখলেও ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কুহেলী' ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'স্ত্রী' ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বনপলাশীর পদাবলী', ১৯৭৪ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত 'অমানুষ', ১৯৭৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মৌচাক', 'সন্ন্যাসী রাজা', ১৯৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অজস্র ধন্যবাদ', 'বাবা তারকানাথ', আনন্দ আশ্রম', ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধনরাজ তামাং' এবং ১৯৮১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অনুসন্ধান' এর গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মৃত্যুর পরও সংগীত পরিচালকগণ তাঁর লেখা গীতিকবিতায় সুর দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরও সতেরোটি ছায়াছবিতে তাঁর লেখা গান ব্যবহৃত হয়েছিল। এই তালিকার শেষ ছবি 'জঙ্গল পাহাড়ী' মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৯১ সালে। 'বাবা তারকানাথ' খ্যাত সংগীত পরিচালক নীতা সেন (সদ্য প্রয়াত) ভোলেননি গৌরীপ্রসন্নকে। তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভের বিষয়ে গৌরীপ্রসন্নর অবদান তো কম ছিল না।

'অনুসন্ধান' ছবি পর অনেক ছবি মুক্তি পেলেও, গৌরবের ভাগীদার হতে পারছিলেন না গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কয়েক বছর যাবৎ। এর জন্য হয়তো তাঁর লেখার দোষ ছিল না। অন্য অনেক কারণ দর্শকের মন জয় করতে না পারায় গানও হারিয়ে গেছে।

মৃত্যুর আগে অবশ্য তিনি গৌরবের ভাগীদার হতে পেরেছিলেন 'অনুরাগের ছোঁয়া' (২৪/১/৮৬ তারিখে ছবিটি মুক্তিপ্রাপ্ত) ছবিটির সর্বাঙ্গীন সাফল্যে। বিশেষ করে ছবির গান মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন অজয় দাস। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া-'আমি যে কে তোমার', আশা ভোঁসলের গাওয়া– 'এ মন আমার হারিয়ে যায় কোন্ খানে', অমিত কুমারের গাওয়া– 'যা পেয়েছি আমি তা চাইনি' এবং কিশোরকুমারের গাওয়া 'আমি যে কে তোমার'– গানগুলি 'অনুরাগের ছোঁয়া ছবিটিকে সংগীতসাফল্য এনে দিয়েছিল। ছবিটি সাধারণ দর্শক গ্রহণ করেছিল।

এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে সাধারণ দর্শকের খুশি হয়ে গ্রহণ করার মতো বাংলা ছবির সংখ্যা কমে গেল কেন? অথচ এই গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকই কিন্তু বাংলা আধুনিক এবং ছায়াছবির গানের প্রকৃত অনুরাগী শ্রোতা।

পরিসরের কথা ভেবে কারণগুলি বিশ্লেষণ না করে, শুধু এক কথা বলা যা বাংলা ছায়াছাবির ব্যর্থতার ভাগীদার হিসেবে গৌরীপ্রসন্নও কষ্ট পেয়েছেন অনেক। আবেগপ্রবণ মানুষটি হয়তো মুখ ফুটে সে কষ্টের কথা বলতে পারেননি, কিন্তু জীবনসায়াহ্নে যখন-তখন তাঁর চোখে জল দেখা দিত। ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী মানুষটি ইংরেজি কবি শেলির 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts'- এই বিখ্যাত বাক্যটির মধ্যেই জীবনের পরম সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আর গানই ছিল তাঁর কাছে জীবনের অন্য নাম।

রোমান্টিক কবি গৌরীপ্রসন্ন গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখার চেষ্টা করেছিলেন বলেই হয়তো বাস্তবের অনেক আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। সে সত্য লুকোতে পারেননি– 'অনেক কাঁটার পথ পার হয়ে এসেছি তোমার দ্বারে বন্ধু'– গানটি তিনি লিখেছিলেন নীতা সেনের জন্য।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– 'কেউ কেউ বলেন, পারিবারিক জীবনে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নাকি মোটেই সুখী ছিলেন না।' নিঃসন্তান ছিলেন বলেই কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ঠিকমতো জোড়া লাগেনি? নাকি অনেক দম্পতির মতোই এক ছাদের নীচে থেকেও তাঁদের পারস্পারিক অবস্থান ছিল দুই ভিন্ন মেরুতে? কারণ যাই হোক না কেন, সে সব কথা অকথিতই থেকে যাক। আর সেসব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। আমাদের সঙ্গে তো তাঁর গানের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অটুট সেই সম্পর্ক। পবিত্র এই বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'তবু মনে রেখো'। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন– রেখো মা দাসেরে মনে। স্রষ্টার মনের চিরন্তন বাসনা গৌরীপ্রসন্নকেও আবেগতাড়িত করেছিল। তিনি লিখেছিলেন– 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।'

গৌরীপ্রসন্নর লেখা অসংখ্য আধুনিক গান শুধু জনপ্রিয়ই হয়নি, কালজয়ী হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। স্বল্প পরিসরে সব গানের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবু কালজয়ী কিছু গানের কথা উল্লেখ করতেই হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া- 'আকাশ মাটি ঐ ঘুমালো', 'তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই', 'আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে', মেঘ কালো আঁধার কালো', 'অলির কথা শুনে বকুল হাসে', 'মাগো ভাবনা কেন/আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে'। জনপ্রিয় শিল্পী তালাত মামুদ গেয়েছিলেন– 'আলোতে ছাঁয়াতে দিনগুলি ভ'রে রয়।'

শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ডের গানও লেখেন গৌরীপ্রসন্ন। 'স্বাতী তারা ডুবে গেল' এবং 'স্বপ্ন আমার ওগো' গেয়েই শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের শিল্পী জীবনের উত্তরণ। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও রেকর্ড করেন গৌরীপ্রসন্নর কথায়। 'দোলে শাল পিয়ালের বন', বাসরের দীপ আর/আকাশের তারাগুলি' আজও শুনে মুগ্ধ হ'তে হয়। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্নের কথায়- 'বালুকাবেলায় কুড়াই ঝিনুক', 'বিদায় নিও না হয়', 'জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে', 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো', 'এখানো আকাশে ঐ জেগে আছে' প্রভৃতি গান। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া- 'যেথা আছে ওগো/শুধু নীরবতা', শিয়রের দীপ যদি ওগো', 'আকাশ আর এই মাটি' মনে পড়িয়ে দেয় গৌরীপ্রসন্নকে।

বিখ্যাত গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছায়াছবিতে সব থেকে বেশি গান গেয়েছেন গৌরীপ্রসন্নর কথায়। অনেক বেসিক ডিস্কও তিনি করেছিলেন তাঁর প্রিয় গৌরীদার কথায়। ও ঝরাপাতা এখনি তুমি, হয়তো কিছুই নাহি পাবো, গানে তোমার আজ ভোলাব, 'অনেক দূরের ঐ যে আকাশ', 'প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রং ঝরায়', 'পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম' প্রভৃতি অংখ্য জনপ্রিয় গান শুনলে বোঝা যায় বিভিন্ন সুরকারগণ এবং শিল্পীগণ কেন বার বার গৌরীপ্রসন্নর গীতিকবিতা নির্বাচন করেছেন।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায়' গানটি নিশ্চয় মনে আছে? এ গানও গৌরীপ্রসন্নর লেখা। সুবীর সেনের গাওয়া -'রাত হলো নিঃঝুম/ফুলের দু'চোখে ঘুম', 'তোমরা গান শুনে আজ দিচ্ছ মালা,' 'নয় থাকলে আরো কিছুক্ষণ' প্রভৃতি গান শুনতে আজও ভালো লাগে। সেকালের জনপ্রিয় শিল্পী- অকাল প্রয়াত শচীন গুপ্তও গৌরীপ্রসন্নর লেখা অনেক গান গেয়েছিলেন। সেইসব গান হয়তো তেমন শোনা যায় না, কিন্তু 'সারারাত জ্বলে সন্ধ্যা প্রদীপ/ছায়া পড়ে আছে পায়' এখনও এফ.এম. চ্যানেলে প্রায়ই শোনা যায়। মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী গায়ত্রী বসুকে নিশ্চয় ভুলে যাননি? গৌরীপ্রসন্নর লেখা তাঁর গাওয়া-'ওই বাজে রিনিঝিনি', 'এই ফাগুন হোক অবসান', গান দুটি মনে রাখার মতো। গায়িকা উৎপলা সেনের গাওয়া-'ময়ুরপঙ্খী ভেসে যায়,' 'পাখি আজ কোন সুরে গায়'- শ্রবণসুখকর এই গানদুটিও গৌরীপ্রসন্নর লেখা।

অতীতের বিখ্যাত শিল্পী সত্য চৌধুরীও গৌরীপ্রসন্নর লেখা দু'টি অসাধারণ কাব্যসংগীত পরিবেশন করেছিলেন। সত্য চৌধুরীর গাওয়া- 'পথে পথে ওই বকুল পড়িছে ঝরিয়া' এবং 'শয়ন শিয়রে ভীরু দীপ জেগে রয়' শুনলে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে হারানো অতীতকে।

স্মরণীয় কণ্ঠশিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষও গান রেকর্ড করেছিলেন গৌরীপ্রসন্নর কথায়। সেই গানগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল– 'চৈতি গোধূলী যায় বৃথা', 'কেন প্রহার না যেতে', 'মায়ামৃগ সম', 'পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে' প্রভৃতি।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া– ‘একটি দুটি তারা করে উঠি উঠি’, ‘ওগো সুন্দরী আজ অপরূপ সাজে সাজো’, ‘তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া– ‘মোর সপ্তসুরের সপ্তডিঙ্গা’, ‘বেশ তো না হয়’, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া-‘ মোর বকুল ফুল কই’ শুনতে শুনতে গৌরীপ্রসন্নর কথা মনে পড়ে। সর্বভারতীয় জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দেও গৌরীপ্রসন্নর লেখা অনেক গান গেয়েছেন। ১৯৫৩ সালে মান্না দে ’র করা প্রথম রেকর্ডের দুটি গান‘– কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল’ এবং ‘হায় হায় গো রাত যা গো’, ছাড়াও ‘তীরভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাড়া ঝড়’, ‘তুমি আর ডেকো না, পিছু ডেকো না’, ‘ওগো বরষা তুমি ঝোরে না গো’, প্রভৃতি গান শুনে আমরা আমাদের পরিচিত গীতিকবি গৌরীপ্রসন্নকে নির্ভুলভাবে চিনতে পারলেও, কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই/আজ আর নেই’ শুনলে আমরা বিস্মিত হই। সম্পূর্ণ গানিট শুনলে (অথবা পড়লেও) আমরা বুঝতে পারি গৌরীপ্রসন্ন গীতিকবি হয়েছিলেন গানকে ভালোবেসে। গীতিকবিতা না লিখে আধুনিক কবিতা লিখলেও তিনি মর্যাদার আসন পেতে পারতেন। ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটা’য় সুর দিয়ে সুপর্ণকান্তি ঘোষ (নচিকেতা ঘোষের পুত্র) রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এই গানটির ক্ষেত্রে সুরকার এবং শিল্পীর কৃতিত্ব কম নয়, কিন্তু এই দু’জনকেই অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে গানের বাণী। এ গান শুনতে শুনতে সমস্ত বাঙালি স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

আমাদের প্রিয় শিল্পী ও সুরকার শ্যামল মিত্র অনেক গান গেয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্নর কথায় ‘মহুল ফুলে জমেছে মৌ’, ‘সাবেলা আজ কে ডাকে’, ‘একটি কথাই লিখে যাবে শুধু’, ‘ধর, কোনে এক শ্বেতপাথরের প্রাসাদে’, ‘তোমার ঐ ধূপছায়া রঙ শাড়ির পাড়ে,’ ‘এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে/মন যেতে নাহি চায়’ প্রভৃতি অনেক গান গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র।

> গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সাথে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্নাদে’র ছিল দারুণ একটি সখ্যতা। শিল্পী মান্নাদে তাঁর প্রথম আধুনিক গান এবং প্রথম বাংলা ছবির গান দুটি-ই করেছিলেন গৌরীপ্রসন্নের গীতবাণীতে। গান লেখার ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা হলো তাঁর সহজ, সরল ও সাবলীন প্রকাশ ভঙ্গি। মান্না দে’র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা তাঁর প্রমাণ পাই: আসলে প্রথম থেকে আমি গৌরীবাবুর, মানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানই গাইতাম। আমার প্রথম আধুনিক গান- ‘কতদুরে আর নিয়ে যাবে বলো’ এবং ‘হায় হায় গো, রাত যায় গো’ ওঁর লেখা। একইভাবে প্রথম বাংলা ছবি ‘অমর ভূপালী’-তেও গৌরীবাবুর লেখা গানই আমি গিয়েছিলাম। গৌরীবাবুর সঙ্গে সে-সময় একটা সুন্দর বোঝাপড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার। গৌরীবাবুর সিনেমার পরিবেশ, পরিস্থিত এবং কে গাইছেন, কে লিপ দিচ্ছেন এ-সব বুঝে নিয়ে এত সুন্দর গান লিখে ফেলতেন যে ভাবা যায় না। এই একইভাবে বাংলা আধুনিক গানও তিনি এত ভাল লিখতে পারতেন, যে সত্যি বিস্ময়কর। (মান্না দে ২০০৫: ১৯২)

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক কবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের ক্যানসার হয়েছিল তা জানা না গেলেও, সেই কঠিন রোগের কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট পরাজিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন-' গৌরীদা ক্যানসারে মারা যান। তাঁর মতো এত বড়ো একজন গীতিকার বম্বের অতিসাধারণ এক হাসপাতালে প্রায় মাটিতে শুয়েই শেষের দিনগুলো এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটান। এ কথা ভাবতে পারা যায়? তাঁর তো রাজার মতো চলে যাওয়ার কথা, একটা ভিখিরির মতো তাঁর মৃত্যু কেন হবে?

হয়! সব সময় কি হিসেব মেলে? 'দেয়ানেয়া' ছবির জন্য গৌরীপ্রসন্নর লেখা গানটা মনে পড়ে যায়- 'জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখ হিসাব নিকাশ/কিছুই রবে না।' কিছুই থাকে না? তাকে স্মৃতি। থাকে কালজয়ী সৃষ্টি। আর সেই সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাও। যতদিন বাংলা আধুনিক এবং ছায়াছবির গান থাকবে, ততদিন গৌরীপ্রসন্নও থাকবেন তাঁর লেখা অসাধারণ অসংখ্য গানের মাধ্যমে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা যার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় রচিত হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে বেদনার এক অব্যক্ত সুর। বেদনার মধ্যেই মহাকাব্যের সৃষ্টি, এটা একটা চিরন্তন প্রবাদ। মহাকাব্যও রচিত হয়েছিল আত্মার কান্না থেকেই। তাঁর রচনার এই অশ্রুত কান্না উৎকর্ষতা এনছে। গৌরীপ্রসন্ন রচনার অভিব্যক্তি একে বারেই অভিনব। শব্দচয়ন, ছন্দ, কাব্য, রস সবকিছুতে এসেছে চূড়ান্ত আধুনিকতা। গৌরীপ্রসন্নর রচনায় আছে এমন এক বৈশিষ্ট্য যা সব কিছু কেই ছাঁপিয়ে গেছে। তাই একটা কালে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আবদ্ধ নন, তিনি চিরকালীন এক মহান শিল্পস্রষ্টা হিসাবে আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

সংগীত শিল্পী ও সুরস্রষ্টা নীতা সেন যিনি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অনেক গীতবাণীকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন এবং পাশাপাশি সুরারোপও করেছেন; কবি সম্পর্কে তাঁর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলোঃ

> স্রষ্টার ভাব প্রকাশ করবার যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে সবই তিনি প্রকাশ করতে পারবেন তা প্রেমেরই হোক, দেশ বন্দনার হোক আর মাটির কথাই হেকা। গৌরীপ্রসন্ন এই অনায়াস প্রকাশ ভঙ্গিমাই তাঁর গানকে করে তুলেছে কালজয়ী। চিত্রনাট্য চাহিদার যে গান তিনি লিখেছেন তাঁর মধ্যেও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ভাবনার ব্যাকুলতা থেকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে দেশের প্রতি ভালবাসার এক রোমান্টিক আবেদন। নানান সমস্যা উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। মানুষের কথা, যন্ত্রনার কথা, এখানেই তাঁর মানবিকতা। আবার সেখানে তাঁর ঈশ্বরীয় অনুভূতির এক পবিত্র স্বত্ত্বা খুঁজে পাওয়া গেছে সেখানে গৌরীপ্রসন্ন দার্শনিক, আত্মার সঙ্গে আত্মার অভিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পরিস্ফুট। গৌরীপ্রসন্নকে খুঁজে পাওয়া যায় এক মহান বিরাট ব্যক্তিত্বে। শুধু স্রষ্টা নন, মানুষ গৌরীপ্রসন্ন এবং তার কাব্যিক সত্ত্বা মিলেমিশে একাকার, সেখানে কোন তঞ্চকতা নেই, সবই খোলামেলা। তাই তাঁর মহান সৃষ্টির মাঝে খুঁজে পাই এক খাঁটি নির্ভেজাল দরদী মানুষকে। গৌরীপ্রসন্ন তাই চিরকালের, চিরদিনের। তিনি চলে

গেছেন। দিয়েছেন অনেক, পেয়েছেন সামান্য। কতটুকু মূল্য দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি চাননি কিছুই কিন্তু আমাদের কি করার সময় শেষ হয়েছে! (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : মুখবন্ধ)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে আমরা গীতবাণীর স্রষ্টা হিসাবে পেলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন নানামুখি শিল্প প্রতিভার এক সমন্বিত প্রকাশ। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন যে একাধারে সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, কবি, দার্শনিক, তাঁর কত টুকুই বা আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে? অথচ সেই কৈশর বয়সেই তাঁর লেখা কবিতা ইউরোপ, আমিরিকার পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। যখন ভাবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অনেক পরিশ্রমের সৃষ্টি উপন্যাসের পাণ্ডলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে আছে, পড়ে আছে অনেক কাব্য এবং গীতি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ, তখন সে দায়বদ্ধতা থেকে সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে আমরাও কি মুক্ত হতে পারি? এ সব তিনি নিজের অন্তরঙ্গ প্রেরণায় সৃষ্টি করেছেন, আর নিজের কাছে আপন করে রেখেছেন। প্রকাশে বিমুখ ছিলেন তিনি। কিন্তু কেন? এই 'কেন'র উত্তর নেই। প্রচারবিমুখ প্রকাশ বিমুখ গৌরীপ্রসন্ন এমনি এক সত্তা। এত বড় জ্ঞানী মানুষটার নাম Intellectual গোষ্ঠিতে খোদিত হয় নি তেমন করে। মানুষের অজস্র শ্রদ্ধা ভালবাসা পেলেও তাঁকে ভূষিত করা হয়নি তেমন কোন বিশেষ খেতাবে। অথচ যে পুরস্কার তাঁর একান্তভাবে পাপ্য তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। অহংকারের অলংকারে ভূষিত হতে চাননি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তিনি মানুষের ভালোবাসা চেয়েছিলেন। সেই ভালোবাসাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেতাব, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/আমি তোমাদেরই লোক।' বাংলা গানের ইতিহাসে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার 'আমাদের লোক' হিসেবেই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

cjK e‡›`¨vcva¨vq

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩১-১৯৯৯) মানে গান, কবিতা, কথাসাহিত্য, চিত্রকলা তথা বহুমুখী শিল্পপ্রতিভার এক অনন্য সমন্বয় । শিল্পী মাত্রই কল্পনা প্রমুখ। আকাশ, বাতাস, নদী, মাটি এই বিশ্বচরাচর ছায়া ফেলে তাঁর মনে। এই অনুভূতি চির শ্বাশ্বত। এই রূপরসবোধ পুলকের কলমে ছন্দে হয়েছে কবিতা; আর সুরে হয়েছে গান।

তাঁর গানের বিষয়বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে প্রেম, পূজা, প্রকৃতি ও স্বদেশের গানে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ ও আবেগ অনুভূতির নানা বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর মন চিরন্তণ সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করে থাকে। শিল্পের সাধনা বার বার নব নব চেতনা পাওয়া। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক বন্ধন জীবনের ছন্দ রূপ। এই মহত্তম অনুভূতির মধ্যে কবি, গীতিকার ও সাহিত্যিকগণ সেদিন আর এদিনের মিল-বন্ধন খুঁজে ফেরে। আর এদিনই নিয়ে যাবে আগামী দিনে। সেখানেই সৃষ্টির গৌরব এবং স্থিতি ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত গীতিকার ও শিল্পস্রষ্টা। তিনি ২ মে ১৯৩১ সালে কলকাতার হাওড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা বেলমতি দেবী। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরদাদা জমিদার শিব গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ও শিল্পানুরাগী। তাঁর স্ত্রীর নাম কেকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই সন্তান, পুত্র পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মিঠু ও কন্যা বাসন্তিকা মুখোপাধ্যায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের পৈত্রিক নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। তাঁর পিতা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধায় শৈশব থেকেই ছবি আঁকতেন। তিনি সব রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দক্ষ ছিলেন। গান গাইতেন, পত্র পত্রিকায় কবিতাও লিখতেন। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। জমিদার পবিরাবের এই সুদর্শন, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সন্তান বাংলা ছায়াছবির নির্বাক যুগের নায়ক ছিলেন। তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীকান্ত ছায়াছবিতে। এছাড়া তিনি ‘মহানিশা’ সহ বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করে ছিলেন। এমন সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে বড় হয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন বিশিষ্ট কবি বা গীতবাণী স্রষ্টা হবেন তাতে আশ্চার্যের কি আছে ! পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনামূলক গ্রন্থে তারই একটি উদ্ধৃতিতে এই সত্যের প্রতিভাস লক্ষ করা যায় :

> আমার পিতৃদেব কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নির্বাক যুগের চিত্রনায়ক। তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের এই শ্রীকান্ত দিয়েই চিত্রা সিনেমার দ্বারোদঘাটন হয়। বাবা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। তারই সূত্রে অনেক শিল্পী, অনেক জ্ঞানী ও গুনীজন আমাদের বাড়ি ‘সালকিয়া হাউসে’ আসতেন। বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার, সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ এবং গীতিকার ও সুরকার হীরেন বসু। ওঁরা যখন আসতেন তখন গান, বাজনা সিনেমা নিয়ে অনেকরকম আলোচনা হত। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৮)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অত্যন্ত মননশীল এবং সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত চর্চার বিষয় ছিল ঐতিহ্যগত এবং পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। সেজন্য অতি অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে অসামান্য শিল্পপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এবং তারই ফলে গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে বাংলা গানের ভূবনে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অবিসংবাদিত নাম। গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি খুব অল্প কম বয়সেই গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন; যা তার আত্ম জীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা পাই;

> বাবার কাছ থেকে দিদি গানটা তুলছেন। আমি পায়ে পায়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেখানে। গান তো আমরা খুবই শুনতাম। কিন্তু এ গানের যেন একটা কোথায় বিশেষত্ব ছিল। গান শেষ হতেই বাবা বললেন, এটা কার সুর কার লেখা জানো? দিদি উত্তর দিল, জানি। হীরেনবাবুর। আর গেয়েছেন মিস লাইট। এর রেকর্ড আমি শুনেছি।

আমার কানে তখন কিন্তু বাজছিল একটাই কথা, তা হল, হীরেনবাবুর লেখা। তা হলে গানও লেখা যায়! বোধ হয় তখনই নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলাম। তাই তো, মাসে মাসে এত যে নতুন গান বের হচ্ছে সেগুলি কেউ না কেউ নিশ্চয়ই লিখছে। গানও লেখা যায়, গানও মানুষ লেখে। সম্ভবত ক্লাস নাইন থেকেই আমার গান লেখা শুরু হলো। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৮)

শিল্পী, কবি মাত্রই আবেগপ্রবণ। নব নব সৃষ্টির নেশায় নিমগ্ন থাকেন তাঁরা। গীতবাণীস্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। জীবনে প্রথম চলচ্চিত্রের গান লেখার আনন্দ প্রকাশ করেন এভাবে:

কাফি, বেহাগ, ইমন, জয়জয়ন্তী, মল্লার, বাহার, সব যেন একসঙ্গে বেজে উঠতে লাগল আমার বুকের মধ্যে। পরে একদিন সরোজদার কাছ থেকে 'অভিমান' ছবির গানের সিচুয়েশনগুলি নিয়ে এলাম। রাত জেগে জেগে লিখে ফেললাম গান। ওঁদের ভাল লাগল। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ৯)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বয়সে গীতবাণীর স্রষ্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য। তাই কখনো কখনো বিষয়টি সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

এইচ-এম.ভি-র তদানিন্তন অধিকর্তাও এই অল্পবয়সী গীতিকারকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন গান আপনার লেখা তো? গানের কথা কিন্তু কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় পড়ে। মামলা হলে মুশকিলে পড়ে যাবেন। আমি বলেছিলাম, রামবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। রামবাবুর সুরের ওপর লিখেছি। এই রামচন্দ্র পাল সম্ভবত প্রথম বাঙালি সুরকার যিনি স্যুট-টাই পরে কলকাতায় বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ১০)

গান রচনার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বহু জ্ঞানীগুনী ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে অচিরেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটেছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। তাঁরই বাণীতে আশা ভোঁসলে গেয়েছিলেন বাংলার প্রথম গানটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় প্রখ্যাত কথাসাহিতিক তারাশঙ্করের 'না' চলচিত্রের গানের বাণী রচনা করেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসংগে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হল:

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই সময়েই মুক্তিলাভ করে আমার গানলেখা ছবি তারাশঙ্করের 'না'। এই 'না' ছবিতে প্রথম সুর করেন তখনকার বিখ্যাত গায়ক শচীন গুপ্ত। 'না'র গান খুবই হিট করেছিল। এখনও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির 'তারার চোখে তন্দ্রা এলো চাঁদ ঘুমালো ওই' গেয়ে শোনায় বিভিন্ন স্থানে। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ১০)

অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, মোহিনী মৌধুরী, সুবোধ পুরকাস্থ, শৈলেন রায় প্রমুখের উত্তরসূরী কবি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল জীবন কাটে হাওড়াতেই। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মতোই তাঁর গানের সংখ্যা

বিপুল। কলেজ জীবনে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অধ্যাপনা ও আইন ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে ছিলেন। কবিতা লেখা শুরু করেন স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই। ক্লাস ফাইভ কি সিক্স এ পড়ার সময় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার গ্রন্থ ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকায়, কলেজ জীবনের শুরুতেই তাঁর লেখা গল্প প্রকাশিত হয় ‘ভারত বর্ষ’ মাসিক পত্রিকায়। স্কটিশ কলেজে প্রথম বর্ষে পড়তে পড়তে তাঁর নাম আকাশবাণী কলকাতায় গীতিকারদের তালিকায় উঠেগিয়েছিল। কলেজ জীবনে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে।

প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছিল আত্মার সম্পর্ক। তাঁর অসংখ্য গান তিনি কণ্ঠে ধারণের পাশাপাশি সুরারোপও করেন। কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারেঃ ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুয়োনা (সুরঃ হেমন্ত ও শিল্পী হিমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ১৪০৯ঃ ১২৬)/ কাটেনা সম য় যখন আর কিছু তে , বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না (সুর ও শিল্পী হেমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ১৪০৯ঃ ১৪২) / সুপর্ণ খার নাক কাটা যায় উই কাটে বই চমৎকার (শিল্পী হেমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ১৪০৯ঃ ৯৯) / বড়ো সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি (শিল্পীঃ প্রতিমা, সুরঃ হেমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ১৪০৯ঃ ১২৬) / ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলনা ও বাতাস (সুর ও শিল্পী, হেমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ১৪০৯ঃ ৭৫) / ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে (সুর ও শিল্পী : হেমন্ত, পুলক বন্দোপাধ্যায় ২০০৩ : ১০৩) / শিল্পী হেমন্ত সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন– হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে একটা কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন, কথাটা হল, এই লাইনে থাকতে গেলে দুটি জিনিসের খুব দরকার। তা হল, যোগ্যতা আর যোগাযোগ। তাঁর এই উক্তিটির কথা আমি এখনও উপলব্ধি করি। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭ : ১১)

কিংবদন্তী শিল্পী মান্নাদে এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল এক নিবিড় বন্ধন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ কাব্যমূল্য সমৃদ্ধ গীতবাণী মান্নাদের দরদী কণ্ঠের সুরেলা জাদুর স্পর্শে এক মোহনীয় মাধুর্যময় আবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কথা ও সুরের এমন অপূর্ব সম্মিলন বাংলা গানের ভুবনে বিরল। মান্নাদে পুলকের গান কণ্ঠে ধারণ করেছেন এক অবর্ণনীয় মুগ্ধতা নিয়ে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমার প্রিয় গান’ গীতি সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় মান্নাদে লিখেছেনঃ

> আমি গান গাই। কিন্তু গানেরকথা ভালো না হলে আমার তা মোটেই গাইতে ভালো লাগেনা। সকলেই জানেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান আমার কতো প্রিয়। তাঁর প্রিয় গানের (সীমিত সংখ্যক হলেও) এমন একটা সংকলন বের হচ্ছে এটা খুবই সুখের খবর। গান যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের তো আনন্দের সীমা থাকবে না। সত্যি একটা ভালো কাজ হচ্ছে। ‘পাবলিশার'কে আমার কংগ্রাচুলেশন জানালাম।

> পুলকবাবুর লেখা গানতো সকলেরই প্রিয়। তাঁদের প্রিয় গানগুলো বই-এর পাতায় ধরা পড়ে চিরদিন তাঁদের চোখের সামনে থাকবে। আর আমরা যারা সে সব গান গেয়েছি, সুর করেছি তারাও চিরকাল ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা থাকবো এর চেয়ে বেশী আনন্দ আর কী সে?
>
> মান্নাদে 'আনন্দন' ২৬ প্রেসিডেন্সি সোসাইটি, নর্থ সাউথ রোড- ৭ জুহু, বোম্বাই- ৪০০০৪৯। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ভূমিকা)

মান্নাদে'র বিশাল সংগীত ভান্ডারের বিরাট একটি অংশ জুড়ে রয়েছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান যেগুলি জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে যেমন শীর্ষে তেমনি কাব্যমূল্য বিচারেও অসাধারণ। এসব গানের মধ্যে কয়েকটি

উল্লেখ করা যাক: জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই, পাছে ভালোবেসে ফেলো, তাই দূরে দূরে রই (সুরঃ ও শিল্পীঃ মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৭৯) / আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো (সুরঃ রতু, শিল্পীঃ মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১০৪) / সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করোনা (সুরঃ ও শিল্পীঃ মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১০৫) / তুমি অনেক যত্ন করে, আমায় দু:খ দিতে চেয়েছ দিতে পারনি (সুর ও শিল্পী : মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১০৪) / পৌষের কাছাকাছি রোদ মাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনো। (সুর ও শিল্পীঃ মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১১৩) / ও কেন এত সুন্দরী হলো, ওমনি করে ফিরে তাকালো দেখে তো আমি মুগ্ধ হবোই, আমি তো মানুষ! (সুরঃ শিল্পীঃ মান্নাদে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১৩৩) ।

আসলে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য শিল্প প্রতিভার অধিকারী। তার মত ভার্সেটাইল গীতিকার সত্যিই বিরল। বাংলা সংগীতের কিংবদন্তী মান্না দে তাঁর আত্নজীবনী মুলক গ্রন্থ 'জীবনে জলসা ঘরে' উল্লেখ করেন- পুলকবাবুর লেখায় প্রথম গেয়েছিলাম সেই ১৯৬০ সালে। গান দুটি ছিল-'আমার না যদি থাকে সুর' এবং' জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই' (মান্না দে ২০০৫:১৯২)। যে কোন ঘটনা যা পরিস্থিতি উপর পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গান লিখে দিতে পারতেন। এ প্রসংগে মান্না দে'র একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলোঃ

> লেখার ব্যাপারে পুলকবাবুর প্রতিভার কোনও সীমা ছিল না। যে- কোনও অবস্থার মধ্যে, যে-কোনও পরিস্থিতি বা সেন্টিমেন্টের গান পুলকবাবুকে একটু ধরিয়ে দিলেই, উনি তার থেকে লিখে দিতে পারতেন অপূর্ব সব গান। ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথা থেকেই উনি অসাধারণ সব গান লিখে ফেলতে পারতেন। (মান্না দে ২০০৫:১৯২)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় গান রচনার পেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে কবি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে তারই

শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গীতবাণীতে। বিচিত্র বিষয় এবং অপূর্ব কথামালায় শব্দবন্দি করেছেন তিনি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আবেগ অনুভুতির নানা প্রান্ত। সংগীতাকাশের ধ্রুবতারা মান্না দের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে পুলক বদ্যোপাধায়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

অনেক দিন আগের কথা। তখন পুলকবাবুর বাবা বেঁচে। তিনি খুব যত্ন করে একট সুন্দর বাগান করেছিলেন বাড়িতে। সে-বাগানে খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকত। তিনি নিজেই সেইসব ফুলগাছের পরিচর্যা করতেন। একদিন সেই বাগানে পুলকবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় সেখানে একটি ছোট মেয়ে, সম্পর্কে পুলকবাবুর নাতনি, বাগানে এসে ফুল তুলছিল। একটা গোলাপ গাছ থেকে যখন সে একটা আধফোটা গোলাপ তুলছিল, তার মেহেন্দি লাগানো হাতে কাচের চুড়ির টুংটাং শব্দের সঙ্গে সেই গোলাপ ফুল তোলার দৃশ্য দেখে তিনি তখনই লিখে ফেলেছিলেন– 'লাল মেহেন্দির নকশা হাতে, তুললে যখন গোলাপ কুঁড়ি, কি মিষ্টি একটা আওয়াজ হল/বাজল ক'টা কাঁচের চুড়ি/ বল না, তোমার নামটা কিগো'?

'বেশ তো, তাই হোক' গানটি লিখেছিলেন পুলকবাবু অন্য একটি হিন্দি গানের অনুপ্রেরণায়। শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখার্জির একটি ছবিতে আমি ছিলাম সংগীত পরিচালক। সেই ছায়াছবিতে আমি লতাকে দিয়ে গাইয়েছিলাম একটি গান। সেই গানটি শুনে অনুপ্রাণিত হয়েই পুলকবাবু 'বাবু বেশ তো, তাই হোক' গানটি লেখেন।

পুলকবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলবেন, আচ্ছা মান্নাদা, বহুদিন একসঙ্গে থাকার পর যখন কোনও স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে যায় বা বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং তারপর কোনও দিন যদি আবার তাদের হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়, তখন তারা কী করবে? কী কথা বলবে? প্রশ্ন করে আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই উত্তর দিলেন। বলবেন, 'আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল/ কত সুর কত গান মনে পড়ে গেল/ বলো, ভাল আছ তো? যেই মাত্র ভাবা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলা এবং তারপরেই আমার সুর হয়ে গেল নতুন জন্ম নেওয়া সেই গানের!

পুলকবাবু মাঝে মাঝেই কল্পনা করতেন নানা রকম ঘটনা, আর তার ওপর লিখে ফেলতেন সুন্দর সুন্দর গান। এ-রকমভাবে ওঁর কল্পনার ফসল ছিল– 'সে আমার ছোট বোন,' 'দশ বছরের বংশী'. 'একদিন গাড়ি চালাতে চালাতে' এইরকম আরও অনেক গান। তবে যা বললাম, ওঁর সব গানই কিন্তু কল্পনাপ্রসূত নয়। সে-সব গানের পেছনে অনেক সত্য ঘটনাও থাকত।

পুলকবাবু এক বার তাঁর স্ত্রীকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য লিখেছিলেন একটি গান– 'এ নদী এমন নদী, জল চাই একটু যদি / দু হাত ভরে উষ্ণ বালুই দেয় আমাকে"। (মান্না দে ২০০৫:২০০-২০১)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা যেমন তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিস্মিত হই, তেমনি তাঁর প্রকরণপরিচর্যার শৈল্পিক মাধুর্য ও আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তিনি পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, ও স্বদেশ প্রেমের আশ্রয়ে একদিকে যেমন তাঁর গানকে বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি প্রকরণ পরিচর্যায়ও রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গানে অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, প্রতীক ইত্যাদির অলঙ্কারের শিল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে গীতবাণীকে করেছেন কাব্যময় যা শিল্প বিচারের মাপকাঠিতে হয়ে উঠেছে যুগোত্তীর্ণ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এক মহান শিল্পী, বাংলা আধুনিক গানের অন্যতম যুগস্রষ্টা। চলনে, বলনে, পোশাকে আশাকে গুরু গম্ভীর, ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া থাকলে ভিতরে ভিতরে বড্ড হাশি খুশি, প্রাণ খোলা শিশুর সরলতায় সমুজ্জ্বল এক মহান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বড় অভিমানী। প্রকৃত শিল্পীরা হয়তো এমনি হন। গীতবাণী স্রষ্টা হিসেবে বাংলা গানে তাঁর অবস্থান অনস্বীকার্য। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নানা জটিলতা ও অসংগতির সাথে মিলাতে না পেরে মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। সমাজ ও সংসারের প্রতি প্রচণ্ড অভিমান ও ঘৃণা থেকে মনে মনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ গঙ্গায় ঝাপ দেন তিনি। এর ঠিক দুদিন পর অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ আড়িটলা লঞ্চ ঘাট থেকে তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। সুতরাং ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু দিবস ধার্য করা হয়। গীতবাণী স্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে কবি, আবৃত্তিকার, চিত্রকার ও কথাসাহিত্যিক। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানও গাইতে পারতেন তিনি। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের একটি গানে তিনি লিখেছেন:

যখন এমন হয়

জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা

ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই

রেলের লাইনে মাথা রাখি

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টাকি

মাগো সে কি তুমি ।।

লাঞ্জনা শুধু লাঞ্জনা

স্বজনের কটু গঞ্জনা

দিন রাত শুনে নে যখন

সারাটি গায়ে আগুন লাগে

যখন ভালোবাসা

বহু পথ ধুয়ে

চলে যায় দূর থেকে দূরে

বন্ধুর দরজায় যত কিছু করাঘাত

যায় বিকলে।

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টাকি

মাগো সে কি তুমি।।

সে কি তুমি মা।।

(সুর ও শিল্পী: মান্না দে)

প্রতিটি মানুষের শেষ এবং চিরন্তন পরিণতি তাঁর মৃত্যু। এটি জীবন মাত্রেরই এক অলজ্ঘনীয় পরিণাম এবং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত। তারপরও মৃত্যু আমাদের কাছে সব সময়ই বেদনার ও হিম-শীতল অনুভূতিময়। আর তা যদি হয় অস্বাভাবিক মৃত্যু তাহলে সেই বেদনার রঙ হয়ে ওঠে আরও নীল এবং গভীর থেকে গভীরতর। শিল্পস্রষ্টা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এভাবে চলে যাওয়া আমাদের হৃদয়ে তেমনি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। আসলে মহামানব বা মহান স্রষ্টারা হয়তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে থাকেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্ভবত তাঁর শেষ পরিণাম আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে এমন হৃদয়স্পর্শী গীতবাণী তাঁর বীণায় পূর্বেই ঝংকৃত হবে কেন?

Z_¨wb‡'k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ১৯৯২।

২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন গীতি সমগ্র প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ২০০৩।

৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯।

৪. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়,কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, আন্দন পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০৭।

৫. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, পঞ্চগীতি কবির গান, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০০।

৬. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, হারানো দিনের গান, অনুপম প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৭।

৭. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, 'এ শুধু গানের দিন', তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস কলকাতা, ২০০৯।

৮. মান্না দে, জীবনের জলসা ঘরে, আন্দন পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg'vi Ges cjK e‡›'¨vcva¨v‡qi Mv‡bi welq‰ewPÎ¨

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

†MŠixcmb gRg'vi Ges cjK e‡›'¨vcva¨v‡qi Mv‡bi welq‰ewPÎ¨

গানের ভেতর দিয়ে এই বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডকে দেখার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর ও বাণীর আশ্রয়ে জগতের সৌন্দর্য ও আনন্দকে নিজের করে নিয়েছেন তিনি, বলেছেন : 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি'। বিশ্বকবির এই অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে যে-কোন গীতবাণীস্রষ্টার মনের কথাটিই বোধকরি মুদ্রিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহস করে যে কথাটি উচ্চারণ করেছেন, অন্য গীতিকাররা হয়তো সেই সত্যটিকেই নানা অবয়বে ধারণ করার প্রয়াস পান। জীবনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে পাঠ করার প্রত্যয় না থাকলে একজন গীতস্রষ্টা তাঁর পাঠক বা শ্রোতার জীবনকে স্পর্শ করার অধিকার লাভ করেন না।

কবিতা ও সঙ্গীতের পার্থক্য সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, এই দু'য়ের মধ্যে গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সম্পর্কে সংগীত গ্রন্থের 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়– সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।' (২০০৬ : ১৭/৩১৬)। যদিও এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন, গানের কবিতা অর্থাৎ গীত-বাণী ও সাধারণ কবিতা বিচার করার তুলাদণ্ডটি ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবু গানের কবিতা বলার মধ্যেই কবিতা হিসেবে গানের বাণীর সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে গানের কবিতা বা সঙ্গীতকে কবিতা পাঠের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলতে বোধকরি গানের সুর-তাল-লয়ের আনুগত্য বুঝিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীকে সঙ্গীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি দিলেও উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবেই তা পাঠককে পরিতৃপ্ত করে। পাঠকের অতৃপ্তিকেও উস্কে দেয় তাঁর গীত-বাণী। এই অতৃপ্তি অনুসন্ধিৎসারই অন্য নাম। 'গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত'– রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন, যাঁর কণ্ঠ নেই, কিংবা যাঁর কানও যথেষ্ট সতর্ক নয়, কেবল পাঠের ভেতর দিয়ে রবিরশ্মির উষ্ণতায় পল্লবিত হতে চান যিনি, তাঁর কাছেও রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয় এবং তাঁর প্রাণে তা অনাস্বাদিত প্রণোদনা সৃষ্টি করে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর পাঠক হিসেবেও আমরা গানের ঝর্নাধারায় স্নান করার আগেই কবিতার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতে পারি।

একজন গীতিকারের বাণীর বিষয়-বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয়। কারণ মানুষের চিন্তা ও কল্পনা কতো বিচিত্র পথে যে পরিভ্রমণ করে তার হিসেব নেয়া এক অর্থে অসম্ভবই বটে। তবু মানুষ অসম্ভবের পাথার পেরুনোর চেষ্টা করে। এই চেষ্টার শেষটা তৃপ্তিদায়ক না হলেও ক্ষতি নেই, অতৃপ্তির মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে, একজন শিল্পস্রষ্টা তো সেই আনন্দের দিকেই আমাদের পথনির্দেশ করেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি এই বিস্ময়বোধকে শব্দবন্দি করে জীবন ও জগতের আনন্দযজ্ঞে অংশগ্রহণের শক্তি সঞ্চয় করি।

সঙ্গীত কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে বা মরমে প্রবেশ করে। সঙ্গীতের বাণী পাঠে একরকম আনন্দ বা আস্বাদন লাভ করা নিশ্চয়ই সম্ভব, তবে সঙ্গীতের সমগ্রতা মূলত সুর ও বাণীর যুগল যাত্রায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। গানে বাণী ও সুরের সংমিশ্রণে যে যা সৃষ্টি হয় তাতে বাণী ও সুর কেউ কারো ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে না। সঙ্গীত যৌথ বা সমন্বিত শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। গীতিকার ও সুরকারের বোঝাপড়া যথার্থ বলেই একটি সার্থক সঙ্গীতের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকে। নিজেকে ব্যক্ত করার প্রয়োজনে সঙ্গীতের শরণ নিলেও শুধু বলার কথাটিই যদি মুখ্য হয়ে ওঠে, তাহলে শ্রোতার অন্তরে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের শরণ নেয়া যেতে পারে :

> সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্যমাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুলপরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট– কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক– সেই-সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই-সমস্ত আবেগ-উদ্‌বেগগুলি সংগীতেই বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্ত হইতে পারে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৫/৬২৭-৬২৮)

রবীন্দ্রনাথের মতে, কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। তিনি মনে করেন, কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এখানেই গানের নান্দনিকা নিহিত। গান আনন্দ দেয়, গান আপ্লুত করে। গানের সুরে মানুষ সাংসারিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়। এই মুক্তির মন্ত্রই সুর ও বাণীর সুদৃঢ় বন্ধনে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়।

লোকপ্রবাদে বারো রকমের মানুষের কথা বলা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি, মানুষের শ্রেণিকরণের কাজটি এতো সহজে সম্পন্ন হবার নয়। মানুষের অবয়বে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকলেও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সত্তা প্রকৃতি ও পরিবেশ সাপেক্ষে কিছুটা বদলে গেলেও একজন মানুষ ঠিক অন্য একজন মানুষের মতো হয়ে ওঠে না, হতে পারে না। একই বিষয় বা ঘটনা দুইজন মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে অবধারিতভাবেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সৃজনশীল মানুষের মধ্যে এই পার্থক্যের পরিমাণ সঙ্গত কারণেই অধিক। তীব্রতর সংবেদনশীলতার কারণেই একজন শিল্পস্রষ্টা পরিবেশ-প্রতিবেশের নানা আলোড়ন-বিলোড়নে বিহক্ষল বা বিচলিত হন এবং সেই বিহক্ষলতা বা বিচলিত চিত্তকেই তাঁর শিল্পের মধ্যে ধারণ করার প্রয়াস পান। একজন শিল্পস্রষ্টার কাছে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তুচ্ছ নয়, অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। জীবনের ঘাটে ঘাটে নোঙর করে ভুবনের নানা সওদায় তিনি তাঁর জীবনতরী পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। সেই তরী যে জলকে আন্দোলিত করে, তার ঢেউ আমাদের ঘাটে এসেও লাগে। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত আস্বাদনের মাধ্যমে আমরা বোধকরি এই ঢেউয়ের তালে ভেসে যাওয়ার আনন্দই উপভোগ করে থাকি।

আধুনিক পৃথিবীর অন্তহীন দায়িত্বের চাপ এবং ব্যস্ততায় আকীর্ণ জীবনের প্রতি ক্ষমাহীন দৃষ্টি প্রসারিত করে যারা মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে চান, সঙ্গীত তাদের দিকেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> আধুনিক জীবনের অতি-দ্রুত গতি, বিহক্ষল প্রকৃতি, রুদ্ধশ্বাস লয়-তাল, ভোগাসক্ত মানুষের ভোগজনিত ক্লান্তি, সর্বাত্মক প্রতিযোগিতার লাগাতার চাপ ইত্যাদির ক্রমপুঞ্জিত টেনশন ঈষৎ ভুলিয়ে রাখতে চারুশিল্পগুলির মধ্যে একমাত্র সঙ্গীতই সক্ষম। পরিশ্রান্ত মনে সহজতর সাহিত্যের চেয়েও দুরূহতর সংগীতেরই উপভোগ সম্ভব হয়। কারণ, একমাত্র এই চারুশিল্পটিই পারে মগজকে না-খাটিয়েও হৃদয়কে মাতিয়ে তুলতে। কেবল সঙ্গীতই পারে তার স্বয়ংক্রিয় চালিকাশক্তি দিয়ে ক্লিষ্ট চিত্তটিকে মুহূর্তে উদ্দীপ্ত করে দিতে। (আবদুশ শাকুর ২০০৯ : ৪৭)

আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বজটিল জীবনকে যে সঙ্গীত স্বস্তিদায়ক অবসর এনে দেয়, সেই সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ গীতিকার-সুরকার-শিল্পীও একই সময়-সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বেড়ে ওঠেন কিংবা গড়ে ওঠেন। তবু একজন জীবননিষ্ঠ শিল্পী প্রদীপের মতো নিজে অন্ধকারে থেকে অন্যকে আলোকিত-আলোড়িত করার কাজটি সম্পন্ন করেন।

গানের ভেতর দিয়ে আমরা যে আনন্দ উপভোগ করি তা জীবনের সকল অভিজ্ঞতাকেই সুন্দর করে উপস্থাপন করে। সুন্দরের সান্নিধ্যে আমাদের অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলো মুক্তির স্বাদ পায় বলেই আমরা আনন্দে গান গেয়ে উঠি, আবার দুঃখের দিনেও গানের কাছেই ফিরে যেতে চাই। শিল্পসমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় গানের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবনের প্রয়োজনে বিদগ্ধজনের নানা মন্তব্যের আলোকে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমরা নিচের উদ্ধৃতি থেকে সঙ্গীতের শক্তির মৌল কারণ চিহ্নিত করার সূত্র পেতে পারি :

> গান তখনই সুন্দরের বার্তাবহ হয়ে ওঠে যখন সে দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটায়। সুন্দর কি? অবনীন্দ্রনাথ সাত রকম সুন্দরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে (১) সুখদ বলেই সুন্দর (২) অপরিমিত বলেই সুন্দর (৩) সুশৃঙ্খল বলে-ই সুন্দর (৪) সুসংহত বলেই সুন্দর- এই চতুরঙ্গ সুন্দর-ভাবনাকে গানের প্রসঙ্গে ভাবা যায়। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন, 'যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেইজন্যই অতি সুন্দর'। শিল্প প্রসঙ্গে উক্ত হলেও, গান প্রসঙ্গে এই মন্তব্য মেনে নিতে আপত্তির কিছু নেই। গান তো অকারণ অবারণ চলার, ভাবার নিঃস্বার্থ, আনন্দময় এবং রসময়। এই গান প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ার চমৎকার বলেছেন, 'সংগীত গণিত নয়, পরাদর্শন'। কথা তো অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধার। সুরই সেখানে সপ্তপক্ষ মেলে ভাবের বন্ধন ছেড়ে দূরে উড়ে যায়। 'মিউজিক বিগিন্স হোয়ার স্পিচ এন্ডস'- এই জনশ্রুতি অসত্য নয়। সুসান কে, ল্যাঙ্গার যথার্থ বলেছেন, 'Music is a tonal analogue of emotive life.' (তরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০৬ : ৮৭)

আমরা লক্ষ করছি, সঙ্গীতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই সঙ্গীতকে জীবনের অন্যতর পাঠ হিসেবেই চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কথা, সংলাপ বা বক্তব্যের যেখানে সমাপ্তি ঘটে, সঙ্গীত সেখান থেকেই তার যাত্রা শুরু করে– একথা স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি কথা বা বাণী অবলম্বন করেই সঙ্গীতের

প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ। এই বাণী কোন না কোন বিষয়কে নির্দেশ করার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

গান শুনলে মানুষের মনে কেন অনির্বচনীয় ভাব জাগ্রত হয় তা স্পষ্ট করে বলা খুব কঠিন। একজন শিল্পস্রষ্টা গানের ভেতর দিয়ে আপনার মনের ভাবকেই নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। গানের সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের জন্মমৃত্যুর ভাবনা থেকে

মন অনেক দূরে সরে যায়। তখন আমাদের আনাগোনা ভিন্ন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়।এই পৃথিবীর কাজকর্মের কথা আমরা বিস্মৃত হই এবং আলো-অন্ধকারের পৃথিবী থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই। প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করা যাক:

> আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে উঠবা মাত্রই এই আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সমঞ্জস্যময় নয়–তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে–কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে কী এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্স্পেকটিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না–একটা সমগ্র, একটা বৃহৎ, একটা নিত্য-সামঞ্জস্য দারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আছে, এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূতভবিষ্যৎ, বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে-সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী অথচ সংগীত এবং উচ্চাঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়–সেইজন্যে আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে– সেইজন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচঞ্চলক্ষ্য জন্মে-সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিস্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে–সৌন্দর্য মাত্রেরই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৬/৬৭৫)

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে গানের শক্তির জায়গাটি সনাক্ত করার প্রয়াস রয়েছে। বিশ্বকবির এই বাণীতে সমাজ-সংসারের বিবিধ জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে গানের স্রোতে ভেসে বেড়ানোর ইঙ্গিত থাকলেও সমাজ-সংসারের অভিজ্ঞতাই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বেও প্রাণের স্পর্শে গান হয়ে ওঠে। কথার সঙ্গে সুরের বন্ধন গভীরতর হলেই সঙ্গীত জীবনের স্থবিরতা থেকে মুক্তির আহক্ষান রচনা করে।

জীবনের সত্যের সঙ্গে শিল্প বা সঙ্গীতের সত্য হুবহু মেলানোর যে-কোন প্রয়াসই বোধকরি ব্যর্থ হবে। কিন্তু জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কাব্য বা সঙ্গীতই পাঠক-শ্রোতার

সমাদর লাভ করতে পারে না। গান তো এক অর্থে কথা ও সুরের বিবাহ-ই। বাণী ও সুরের মধুর দাম্পত্যেই সঙ্গীতের জন্ম হয় বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। আকার ও গতি মিলে গান রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব আনে। তখনই তা' হয়ে ওঠে 'অধরা মাধুরী'–যা পেয়েও না পাওয়ার দুঃখমাধুর্য সৃষ্টি করে। 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনে' এক অর্থে যথাযথ গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, তার গভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই। তাই সঙ্গীত দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে মনকে বৃহত্তর পরিসরে পৌছে দেয়। মানুষের চিন্তা ও রূচির পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধরন বদলে গেলেও গান শেষ পর্যন্ত মানুষের মনে মুক্তির আনন্দই ছড়িয়ে দেয়। মানুষের মন যখন 'বন্ধনহীন নিত্যস্বাধীন চিত্তমুক্ত শতদল' হিসেবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় নিমগ্ন হয়, তখন সে গানের ঝর্নাতলায় এসে দাঁড়ায়। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> কেন আমরা গান গাইব? শুনব? গান কি? এমন প্রশ্নাবলীর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা একটাই উত্তর খুঁজে পাই, যে গান আমাদের ভালো লাগে। যে গানের সুরে আমার চিত্ত রঞ্জিত হয় এবং যা আমাদের মনোহর করে সেই গানই শোনার যোগ্য, গাইবার যোগ্য। রুচিভেদে নিশ্চয় গানের তারতম্য আছে। উৎকট আওয়াজ, জগঝম্প বাজনা, মুখ ও শব্দের বিকৃতি কারো কারো সমাদর পেতেই পারে। সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। যে গান আমাকে জাগায় না, ভাবায় না, ভাসায় না, কল্পনার আকাশে ওড়ায় না এবং সকলের সঙ্গে যে গানের ভাব-ভাষা-সুর সানন্দে ভাগ করে নিতে পারি না, সে গান ব্যর্থ, নিষ্ফল। (তরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০৬ : ৮৭)

যে কথা অন্য মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না, কবি গীত-বাণীর আশ্রয়ে সেই অব্যক্তকে বাণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, যা বাণীর সীমানা অতিক্রম করে অনির্বচনীয় অভিব্যক্তির বাহক হয়ে উঠেছে। এমন কী কথা আছে যা কেবল বাক্যের দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব?– এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই সঙ্গীতের অন্তর্গত ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠি। কথায় কথায় হয়তো রাত্রি গভীর হতে পারে, কিন্তু সেই কথাকে শব্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে অবাধ-অপ্রতিরোধ্য করে তোলার জন্যই কথার সঙ্গে সুর জুড়ে দেয়া হয়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

> গীতিকলার নিজেরই একটা বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে

> গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো– বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৯/৫২৫)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত-বাণীর পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। জীবনানন্দ দাশ যেমন কবিতা এবং জীবনকে একই সমতলে দাঁড় করিয়েছেন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জীবনকে গানের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতচৈতন্যের একটি দিক তাঁদের সঙ্গীতভাবনায় বিম্বিত হয়েছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্রষ্ট্রার কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন মরণ হতে তিনি গানের সুরে জেগে উঠতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MxZwj গ্রন্থে একটি গানে বলেছেনঃ

তোমার কাছে এ বর মাগি,
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৬/২০৮)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঙ্গীতের দর্পণে জীবনের আনন্দ-বেদনাকে অবলোকন করেছেন। কবিতার সঙ্গে গানের বাণীর মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানকে শিল্পসংহতি দিয়েছেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বাংলা দেশের গানের প্রধান প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত অর্থে, সুর ও বাণীর যুগল আবেদনেই বাংলা গান শ্রোতার চৈতন্যে মুক্তির আনন্দ এনে দেয়। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে

> প্রকৃতিভেদ আছে, সে ভেদ অনুসারে সংগীতের দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়।... বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না– এইজন্যে বাংলা দেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১৬/৫৩৭)

গানের বাণীকে কাব্যের দূরসঞ্চারি রসসম্পদে ঋদ্ধ করে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গানকে শ্রোতার অন্তরের ঐশ্বর্য উপলব্ধির অনুঘটকরূপে চিত্রিত করেছেন। তাই তাঁদের গীত-বাণীর আবেদন কেবল শ্রোতার অন্দরমহলেই নয়, পাঠকের অন্তর-আঙিনায়ও অবলীলায় আনাগোনার অধিকার রাখে। বিশুদ্ধ কবিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলেই বাংলা গান তার ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এই পতনের হাত থেকে বাংলা গানকে উদ্ধারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ-প্রসঙ্গে একজন গীতিকারের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা কবিতাকে নয়– বাংলা গানকেও নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করলেন। আজীবন ঐতিহ্যসচেতন রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বিহারীলালের কাছে তাঁর কাব্যপ্রেরণার ঋণ স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ বিহারীলাল বাংলা কবিতার যে সম্ভাবনার সূচনা করেছিলেন– তিনি তাকেই সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করেছেন– এই ছিলো তাঁর বিনীত দাবী। আমরা অবশ্য জানি– রবীন্দ্রনাথের বিপুল কৃতিত্বের তুলনা তিনি শুধু নিজেই। এবং এই কথা আরো বেশি প্রযোজ্য গীতিকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি। নিধুবাবুর টপ্পার অনিয়মিত বাণীবিন্যাসকে তিনি ধ্রুপদ গানের আঙ্গিকে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছেন। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি বটে– কিন্তু বাংলা গানে এখনো রবীন্দ্ররীতিই আমাদের অবলম্বন।' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৯১ : ২২৯-২৩০)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যসচেতনতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে গীতসুধায় সিক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে তাঁদের জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পচৈতন্যের স্মারক হিসেবেই তাঁদের গীত-বাণী পাঠ করা যায়। জীবনানন্দ দাশ কবিতার আলোচনায় জীবন ও কবিতার গভীরতর সম্বন্ধ স্বীকার করে বলেছেন, 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ'(২০০২ : ১৭)। জীবনানন্দ দাশের ভাষা ধার করে আমরাও বলতে পারি, গীতবাণী এবং জীবন একই অনুভব ও উপলব্ধির ভিন্নতর প্রকাশমাত্র। তাই সার্থক গীতবাণীর সান্নিধ্যে আমরা জীবনেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এ-পর্যায়ে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক

Dhaka University Institutional Repository

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর নানা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক জীবনচেতনার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়াস পাবো।

†MŠixcmb gRg‘vi

জীবনকে অপরিসীম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ করার অসামান্য কারিগর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬)। গীতবাণীতে মানুষের জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। মানুষের আনন্দ-বেদনাকে শিল্পের মহিমা দিয়েছেন তিনি। তাঁর গানের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের নানা দিকে আলোক প্রক্ষেপের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। গৌরীপ্রসন্নর গানের বিষয়ানুগ শ্রেণিকরণে আমরা তাঁর গীতবাণীকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করতে চাই। যেমন - পূজা বিষয়ক গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেম বিষয়ক গান, প্রকৃতি বিষয়ক গান । এছাড়া বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক গান ও ছড়া গান নামে আরো দুটি বিভাগ করা যেতে পারে। এ-পর্যায়ে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর আলোকে এই শ্রেণিকরণের সার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের প্রয়াস পাবো।

cRv welqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ পূজা। এ পর্বে নিজেকে নিবেদনের এক শিল্পঋদ্ধ নজির স্থাপন করেছেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন, সমর্পণের মধ্যে ফাঁকি থাকলে প্রার্থিত গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। তিনি সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন করেই তাঁর পূজা-পর্বের গীতবাণীতে পূর্ণ করে তোলেন নি, স্রষ্টার সত্যকে শিল্পে রূপ দেয়ার গৌরবদৃপ্ত কাজটিও সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। পূজা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের শরণ নেয়া যেতে পারে :

> যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে "আমি কী– আমার চরম মূল্য কোথায়।" বলা বাহুলক্ষ্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকলরকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১০/৬৬৫)

রবীন্দ্রনাথের এই বিবেচনা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পূজা-পর্যায়ের গানের মর্মবাণী উদ্ধারে সহায়ক হতে পারে বলে আমরা মনে করি। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে যা অসমর্থিত বলে প্রতীয়মান হয়, সমর্পণের ভাষায় তা-ই অপরিসীম তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিবেচনা মাথায় রেখে পরম স্রষ্টাকে লাভ করা যায় না। এখানে কেবলই দেবার মানসিকতা নিয়ে মাথা নতকরে দাঁড়াতে হয়। তাহলে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর শক্তি লাভ করা যায়। প্রসঙ্গত আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি মন্তব্য শরণ নিতে চাই :

> ‘ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। প্রেমময় ভগবান খোঁজেন তাঁর মনের মতো ভক্তকে; পিপাসিত ভক্তি খোঁজে তার মনের মতো পাত্রকে। খোঁজার শেষ নেই, তবে পথে চলতে চলতে কিছু তো পায় পান্থজনেরা, নইলে অন্ধকার রাত্রিতে উপলবন্ধুর কন্টক-সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে।’ (Ave mqx‘ AvBqe 1980 : 21)

গৌরীপ্রসন্ন সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে মেলে দেয়ার মাধ্যমে নিজেকেই যেন নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস পেয়েছেন। ভগবানের কাছে তিনি অক্ষমের মতো দাঁড়াতে পছন্দ করেন না। নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকে গৌরবান্বিত করার প্রয়াসই তাঁর গীতবাণীতে প্রধানরূপে প্রতীয়মান।

সৃষ্টিকর্তার কাছে গানের দীক্ষা নিয়ে নিজের সৃজনপ্রতিভাকে সপ্রতিভ করার প্রার্থনাও গৌরীপ্রসন্নর গীত-বাণীর বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছের অনুকূলে নিজেকে নির্মাণ করার এই ব্যাকুলতায় গৌরীর সঙ্গীতসাধনায়ও নতুন মাত্রা লাভ করেছে। গুরুর প্রতি শিষ্যের যে আনুগত্য, আমরা তারই বর্ণীল প্রকাশ লক্ষ করি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কোন কোন গীতবাণীতে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

> ক. হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে / বিবস রাধার তনু তোমারই বিরহ ভারে ॥ অধরে তোমার প্রভু আজ কেন বাঁশী নাই / রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই / শ্যাম সোহাগিনী চির অনুরাগিনী / ভাসে রাধা আঁখি ধারে॥ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৩৭)। উল্লেখিত গানে রাধা-কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলতঃ স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগকে শিল্পিত করা হয়েছে। এটি কবির এক অনবদ্য সৃষ্টি ।
>
> খ.তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ / একি অভিশাপ, নাই প্রতিকার, / মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই আজ অধিকার। কোথায় অযোধ্যা কোথা সেই রাম– / কোথায় হারাল

গুণধাম।একি হল, পশু আজ মানুষেরই নাম। সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে শেষ করে দাও এই অনাচার। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২:৮৬) রাম ও সীতা দুটি পৌরাণিক চরিত্রের আশ্রয়ে গৌরীপ্রসন্ন উপরিউক্ত গানে সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও বাস্তবতার নানাবিধ অসংগতি, পাপাচার, ও অনিয়মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ নির্মাণ করেন। অযোধ্যার অধিপতি রামচন্দ্র ছিলেন ন্যায়-নীতিবান ও প্রজারঞ্জক রাজা আর সীতা ছিলেন সতী সাবিত্রী নারী , যিনি সকল লাঞ্চনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে যান একান্তই বাঙালি বধুটির মতো। আলোচ্য গীতবাণীতে সমাজের সকল অনাচারের বিরুদ্ধে কবি দেবী মাতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, পথের সন্ধান চেয়েছেন।

গ. পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলো তব / মাগো বল কবে শীতল হব। কতদূর আর কতদূর বল মা? / আঁধারের ভ্রুকুটিতে ভয় নাই / মাগো তোমার চরণে জানি পাব ঠাঁই, / যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায় / হাসিমুখে সে বেদনা সব। চিরদিনই মাগো তব করুণায় / ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়, / ঐ আকাশে যদি মা কভু ওঠে ঝড় / সে আঘাত বুক পেতে লব। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৮৭) উপরিউক্ত গানটি শাক্ত সংগীত। এ গানের মূল সুর শক্তির উপসনা। মাতৃশক্তির আঁধার মূলত শ্যামা ও উমা। বাংলা গানে উনিশ শতক মাতৃশক্তির উপর প্রবাহিত হয়েছে এবং এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে । আলোচ্য গানে আমরা দেবী মায়ের প্রতি যে আকুতি লক্ষ করি তা মূলত শক্তির পূজার-ই নামান্তর।

উদ্ধৃতি আরো দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু এ-থেকেই আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পূজার প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারি। তিনি কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনাই জানান নি, মানবসমাজ ও সভ্যতার নানা অনিয়ম ও অনাচার দেখে তিনি সৃষ্টিকর্তার দরবারে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। সেই অর্থে গৌরীপ্রসন্নর পূজার মধ্যে ভগবান-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রেমের গভীরতর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভগবানের আনুকূল্য পেতে হলে মানুষের কাছেই মানুষকে ফিরতে হবে– এই উপলব্ধি গৌরীর পূজার গানকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। সমর্পণের মাধ্যমে অন্তর্যামীর অন্তরঙ্গতা লাভ করায় এ প্রয়াস প্রাণবন্ত এবং শিল্পঋদ্ধ। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য :

‘এ-যুগের মানুষের অশান্ত বিভ্রান্ত চিত্ত যদি কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক নিরীক্ষার মধ্যে শান্তি লাভ করেও তবে তার জন্য সততার প্রয়োজন; আস্থা যদি খুব দৃঢ় না-ও হয় তবু মনো-প্রতিন্যাসটি সিরিয়াস হওয়া দরকার।’ (আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৮০: ১৫৩)।

গৌরীর পূজা-পর্যায়ের গীতবাণীতে আমরা লক্ষ করছি, তাঁর সততা যেমন পরীক্ষিত, তেমনি তাঁর মানসগঠনটিও শতভাগ নিষ্ঠায় সমর্পিত। তাই তাঁর পূজার গানে ভগবানে ভক্তি ও আত্মশক্তিতে আস্থার বিন্দুটি স্বাস্থ্যকর শিল্পসংহতি লাভ করেছে।

†‘kvZ¥‡evaK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে স্বদেশের মুখ নানা রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের প্রতিটি ধুলিকণার দিকে গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়েছেন তিনি। দেশকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে একজন মানুষের মানসগঠন ও মূল্যবোধের স্বরূপ সনাক্ত করা যেতে পারে। মুখে নানা কথা বলা হলেও সাধারণ অর্থে দেশ বলতে ভদ্রলোকের দেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারনত আমরা জনসাধারণকে তুচ্ছ ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করে থাকি। আমাদের মজ্জাগত এই অসুস্থতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন গৌরীপ্রসন্ন। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বিভেদ সৃষ্টির কাজটি সহজ হলেও গৌরীর দেশাত্মবোধক গানের মর্মবাণী মিলনের মন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের বিচ্ছিন্নতার কারণেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না। তাঁর মতে, বহুকে এক করে তোলার মধ্যেই দেশহিতের সাধনা যথার্থতা লাভ করে। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

> স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত– স্বায়ত্বশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ব।...নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্বঅধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিলেক্ষ্যর জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহার নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন। (iex›‘bv_ VvKi 2006 : 5/758)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের দেশাত্মবোধক গীতবাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে মনোনিবেশ করলে আমরা লক্ষ করবো, তিনি স্বদেশের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মানুষের শুভবোধকে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন। দেশ বলতে তিনি কেবল ভূমি ও প্রকৃতিকেই বোঝান নি, দেশের মানুষের কথাই বলেছেন এবং সেই মানুষের স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতায় তিনি আহত হয়েছেন। তাই তাঁর দেশাত্মবোধক গানে কেবল দেশমাতৃকার গৌরবগাঁথাই

উচ্চারিত হয় নি, মানুষের মুক্তির জন্য মানুষকে দেশগঠনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহক্ষান জানিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

ক. মাগো ভাবনা কেন? / আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে / তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/ তোমার ভয় নেই 'মা' / আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।। আমরা হারবো না হারবো না / তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বোনা / আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি। (সুর ও শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) এই গানটি মূলতঃ ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গানের আবেগ এবং সুতীব্র ভাষার প্রয়োগ শৈলী সমগ্র ভারতবাসীকে নাড়া দিয়েছিল। দেশপ্রেম ও গনচেতনামূলক এমন সংগীতের সুতীব্র বাণী কেবল গৌরীপ্রসন্নের মত শক্তিমান গীতিকারের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

খ. শোনো, একটি মুজিবরের থেকে / লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি / আকাশে বাতাসে উঠে রণি। বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ ॥ সেই সবুজের বুকচেরা মেঠো পথে / আবার এসে ফিরে যাবে / আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো। শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে/ হায়রে এমন সোনার খনি ॥ (মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী / ভাষা ও দেশের গান ২০০৫:৮৭) এই গানটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গান সমগ্র মুক্তিযোদ্ধা তথা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের প্রাণে অফুরন্ত শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিল।

গ. আমার এই জন্মভূমির মতন বল / কে আছে আর। / মাটি মা যে সবার আপন / নেই তুলনা তার। হাসবো মায়ের সকল সুখে / তার দুঃখ যত নেবো বুকে / ভয় পাবো না জীবন দিতে / আসুক অন্ধকার।

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১৫) এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দেশাত্মবোধক গান । এখানে দেশকে মায়ের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। মায়ের মুখের হাসি যেমন সন্তানের একান্ত কাম্য; তেমনি সন্তানের মঙ্গল কামনায় মাও সর্বদা নিবেদিত থাকেন। মায়ের বুক সন্তানের কাছে স্বর্গের চেয়েও উৎকৃষ্ট ও প্রশান্তিময়।

ঘ. এ দেশের একটি গানও কবিতা / এ মাটির একটি ধানও কবিতা / আকাশে তুলির টানও কবিতা। এ মাটির সবুজ হাসিও ছবি / রাখালের মেঠো বাঁশীও ছবি / এ দেশের একটি প্রাণও কবিতা / এ মাটির রূপের দানও কবিতা / এ মাটির সোনালী মাঠও স্বপ্ন / এ দেশের খেয়ার ঘাটও স্বপ্ন / এদেশের গঞ্জ হাটও স্বপ্ন / এ দেশের নদীর কুলও ছবি / এ মাটির একটি ফুলও ছবি / আর তার মধুর প্রাণও কবিতা। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : ১১৬) এটি একটি অনবদ্য দেশ প্রেমের গান , যাকে কবিতাও বলা যায়। এখানে ভাষা ও প্রকাশের অভিনবত্বে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

ঙ. আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে / সাত সাগর আর তের নদীর পারে, / ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা / দেখে এলাম তারে। সে এক রূপকথারই দেশ– / ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ, তারারই ফুল পাপড়ি ঝরায় / যেথায় পথের ধারে।

(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২:৫৬) এটি একটি অনবদ্য ছন্দময় দেশ প্রেমের গান, যে গান মহানায়ক উত্তম কুমারের লিপে এক অসাধারণ অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল যা হতাশা নিমজ্জিত জাতিকে নব প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিল।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত থেকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের স্বদেশ ভাবনার গতি- প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এই গীতিকারের চিত্ররূপময় ভাষায় কবির জন্মভূমি এক স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কবি তাঁর স্বদেশকে কখনো মায়ের মূর্তিতে, আবার কখনো-বা প্রেয়সীর রূপকল্পে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

†cg welqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের প্রেম বিষয়ক গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। পূজা-পর্যায় এবং দেশাত্মবোধক গানের মতোই তিনি প্রেমকে বিচিত্র অবয়বে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির গানে যখনই ফাগুন ও ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই রঙিন স্বপ্নের বার্তা নিয়ে তাঁর হৃদয়-কাননে এসে উপস্থিত হয়েছে অভিনব এক ঝাঁক প্রজাপতি। অবশ্য ভ্রমরকেও আমন্ত্রণ জানাতে ভুল করেন নি কবি। প্রজাপতির রঙের বাহার আর ভ্রমরের গুঞ্জরণে যে প্রাণবন্ত প্রতিবেশ রচিত হয়েছে, সেখানেই কবির গানের পাখিরা প্রাণের বীণায় আনন্দের ঝংকার তুলেছে। কবির প্রেমের গানে প্রকৃতিকে দর্শক বা শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি, নিসর্গের গানে সেই প্রকৃতিই শিল্পী বা অভিনেতা হিসেবে আমাদের চৈতন্যের মঞ্চ অধিকার করে রাখে। আর আড়ালে দাঁড়িয়ে কবি সেই আনন্দ-আয়োজন উপভোগ করে আমোদিত হন, কখনো-বা কষ্টের কাঁটা তার ডিঙিয়ে নিসর্গের মধ্যে নিজের নির্ভরতা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করেন। তাই বৃষ্টিস্নাত দিনে কবির বীণা মেঘমল্লার রাগে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে। প্রজাপতির দূর বনান্তে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যে হারানোর দিনের গান মনে পড়ে যায় কবির। তিনি পাখির চোখ কিংবা আম্রপাতায় নতুন দিনের স্বরলিপি পাঠ করেন, আর প্রকৃতির নব-আনন্দে জেগে ওঠার মধ্যে আবিষ্কার করেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবির প্রেমের কবিতা। কবি যে প্রকৃতি-কন্যার প্রেমে গান গেয়ে ওঠেন, সেই কন্যার অধরে ফাগুনের আগুন দেখে পুলকিত হন তিনি, আর সেই অধর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা গানের মালা হয়ে কবির কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। গৌরীর গীতবাণীকে আমরা নানা শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হলেও লক্ষ করবো, তাঁর একই গীতবাণীতে নানা বিষয়ের সার্থ সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে প্রেমের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি বারবার প্রকৃতির দ্বারে হাত পেতেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

ক. কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে / আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে / এই মধুক্ষণ মধুমাস হয়ে / না হয় উঠিত ভ' রে। সুরে সুরভিতে না হয় ভরিত বেলা / মোর এলোচুল লয়ে বাতাস করিত খেলা / ব্যাকুল কত না বকুলের রাশি / র'য়ে র'য়ে যেত ঝ' রে। (‡MŠixcmb 1992 :53)

খ. এ শুধু গানের দিন / এ লগন গান শোনাবার / এ তিথি শুধু গো যেন দক্ষিণ হাওয়ার॥ এ লগনে দুটি পাখী মুখোমুখী / নীড়ে জেগে রয়,/ কানে কানে রূপকথা কয়। এ তিথি শুধু গো যেন হৃদয় চাওয়ার। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৫৩)

গ.এক পলকে একটু দেখা / আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কি?/ যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে / মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি? / মিষ্টি হাসি দুষ্টুমিতে / ভালই লাগে সাড়া দিতে, স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে দিয়ে / দিনগুলি যাক না চলে ক্ষতি কি? / (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :৮৮)

ঘ. প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে / আমারই এ দুয়ার প্রান্তে / সে তো হায় মৃদু পায়/ এসেছিল পারিনি তো জানতে। সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি / হায়, সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি / তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি / আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে। জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৭৬)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে ঘুরেফিরে গানের প্রসঙ্গ এসেছে। সুন্দরকে তিনি আবাহন করেছেন গানের ভাষায়। কেবল সুন্দরই নয়, যখন অসুন্দরের আঘাতে কবি আহত হয়েছেন তখনও গান গেয়ে উঠেছেন। গানের জন্য জীবন বাজি রাখা এই গানের পাখি গীত-বাণীতেই গানের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যের নানা প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি গানের মতো করে নিজেকে মেলে ধরার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কখনো ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো প্রিয় মানুষকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন তিনি, কখনো-বা বাকস্বাধীনতার অভাবকে সঙ্গীতহীনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর, তাই-ই কবির চোখে সঙ্গীতের মতো মনোহর মনে হয়েছে। তিনি তাঁর অনুভূতির জগৎকেই সঙ্গীতের মধ্যে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

মানুষের অনুভূতির জগৎই যে সংগীতের বিষয়বস্তু, একথা প্রায় অবিসংবাদিতভাবেই ঘোষিত হয়েছে; কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণার যে ধরনের নির্দিষ্টতা আছে, আবেগের তা নেই। এই বৈশিষ্ট্যেরই জন্য সংগীতের উদ্দেশ্যকে অন্যান্য চারুকলার এবং কাব্যের উদ্দেশ্য থেকে পৃথক

বলে মনে হয়েছে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে, ধ্বনি এবং তার কৌশলপূর্ণ সংযোগ, প্রকাশের মাধ্যম এবং উপাদান, এবং তার সাহায্যেই সুরকার প্রেম, সাহস, শোক এবং আনন্দকে উপস্থাপিত করে থাকেন। আবেগেরই অসংখ্য বৈচিত্র্য হচ্ছে বিষয়বস্তু, যা ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে সংগীতের রূপ পরিগ্রহ করে। সুন্দর সুর এবং নৈপুণ্যপূর্ণ সঙ্গীত স্বগুণে আমাদের মুগ্ধ করে না, মুগ্ধ করে তারা যাকে ব্যক্ত করে সেই বিষয়– প্রেমের ফিস্‌ফিসানি অথবা ঐকান্তিক যোদ্ধার তর্জন-গর্জন। (mvabKgvi fÆvPvh 2002 : 37)

গৌরীর গানে অনুভবেব অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সঙ্গীতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত। তাই গানের আড়ালে প্রাণের কথাগুলোই প্রিয়জনকে ঘিরে জলের মতো আবর্তিত হয়। গানে নিবেদিত কোন মেয়ের জন্য বুকের ভেতর যে ভাঙ্‌চুর টের পেয়েছেন, তাও গানের রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন তিনি। বুকের গভীরতলে যে বাসা বেঁধে থাকে, সে যখন একান্তে আপন মনে কথা বলে ওঠে, তাও গানের মতোই মধুর বলে মনে হয় তাঁর। আর ভালোবাসাকে জয় করার জন্য প্রত্যয়ী কবি জ্বলেও উঠতে চান গানের মতো করে। কবির প্রেম-আশ্রয়ী গীতবাণী থেকে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

ক. আমি দূর হ' হে তোমাকেই দেখেছি / আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি। বাজে কিংকিনি রিনিঝিনি/ তোমারে যে চিনি চিনি / মনে মনে কত ছবি এঁকেছি। ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল/ তুমি বাতাসে ওড়ালে ভীরু অঞ্চল / ঐ রূপের মাধুরী মোর সঞ্চয়ে রেখেছি। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৭৮)

খ. অলির কথা শুনে বকুল হাসে / কই তাহার মত / তুমি আমার কথা শুনে হাসনা তো। ধরার ধূলিতে যে ফাগুন আসে / কই তাহার মত / তুমি আমার পাশে কভু আসনা তো। আকাশ পারে ঐ অনেক দূরে / যেমন করে মেঘ যায় গো উড়ে / যেমন করে সে হাওয়ায় ভাসে / কই তাহার মত তুমি আমার স্বপ্নে কভু ভাসনা তো। (‡MŠixcmb 1992 :79)

গ. তুমি যে আমার / (ওগো) তুমি যে আমার। কানে কানে শুধু একবার বল / ''তুমি যে আমার''। আমার পরাণে আসি /তুমি যে বাজাবে বাঁশী,/ সেই তো আমার জীবনে/ তোমারই অভিসার। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৮২) সিনেমার গানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অতি সরল কথা হলেও অভিজত ও লোক জীবনকে স্পর্শ করেছে।

cKwZ welqK Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিসর্গের নানা আয়োজনে তাঁর গীত-বাণীর আনন্দ-উদ্‌যাপনকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করেছেন। প্রকৃত অর্থে কবির অন্তরের অপ্রকাশিত অভিব্যক্তিই তাঁর চারপাশের পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। শিল্পসাহিত্যে মানবমনের প্রতিকৃতি অঙ্কনে নিসর্গের ব্যবহার প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> প্রকৃতিকে কাব্যে সাহিত্যে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্যকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি– ক) বৈচিত্র্য সৃষ্টি, খ) প্রেক্ষিতরূপে প্রকৃতির ব্যবহার, গ) মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গ। আধুনিক দৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রকৃতি চিত্রণের গুরুত্বই সর্বাধিক। (eiæYKgvi PµeZx 2003 : 104)

গৌরীপ্রসন্নের গানের বাণীতে প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও কবিমানসের প্রবণতা প্রকাশের অনকূল আবহ রচনায় তা সর্বাধিক শিল্পসংহত। কবির চেতনার রঙে পরিচিত পরিমণ্ডলের বস্তুসমূহ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠায় তাঁর গানের বাণীতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন অর্থবহ ব্যঞ্জনা ও অভিনব মাত্রা লাভ করেছে। তাই তাঁর গীত-বাণীর আকাশ যেন কবির মুক্তির আনন্দেরই প্রাণবন্ত প্রতিনিধি হিসেবে গান গেয়ে ওঠে, আর বাতাস হয়ে ওঠে তাঁর অস্তিত্বের শিল্পিত স্মারক। বাতাসের স্পর্শের লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ফুলের ক্ষণস্থায়ী জীবন যেন কবির জীবনার্থেরই প্রতীক। গৌরীর নিসর্গের গানে ফুল নিজের জীবনের অপ্রাপ্তি এবং অতৃপ্তির জন্য আক্ষেপও করে কখনো কখনো। কবির নিজস্ব ভঙ্গি প্রকাশিত এই নিঃসঙ্গতায় আমরাও ব্যথিত এবং বিদীর্ণ বোধ করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

ক. বনে নয় আজ মনে হয় / যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে / আমি তাই গেয়ে যাই / এ কোন খুশি প্রাণে জেগেছে / প্রাণে প্রাণে গানে গানে / ফাগুনে আগুন বুঝি লেগেছে। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৫০)

খ. পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো / ফুল জানে পাখী কেন গান গায়, / রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো / চাঁদ জানে রাত কার পানে চায়। / সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে/ মন চায় সেই সুরে হাসিতে, / নদী চায় সাগরে যে মিশিতে / সাগর নদীরে তাই কাছে পায়। (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৫৭)

গ. ও পলাশ ও শিমুল / কেন এ মন মোর রাঙালে / জানিনা জানিনা আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে ॥ যার পথ চেয়ে দিন গুনেছি / আজ তার পদধ্বনি শুনেছি / ও বাতাস কেন

আজ বাঁশী তব বাজালে। যায় বেলা যাক না আঁখি দুটি থাক না / সুন্দর স্বপ্নে মগ্ন। যেন এল আজ এই শুভলগ্ন ॥ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৭৭)

ঘ. এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে / এসো না গল্প করি, / দেখো এই ঝিকিমিকি চাঁদ সারা রাত / আকাশে সালমা জরি। জাফরানী ওই আলতা ঠোঁটে / মিষ্টি হাসির গোলাপ ফোটে / মনে হয় বাতাসের দিলরুবাতে / সুর মিলিয়ে আলাপ ধরি। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :৮০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিসর্গের নানা আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন এবং গীত-বাণীর আশ্রয়ে তিনি প্রকৃতিকে অন্তরে ধারণ করেছেন। কবির রোমান্টিক চেতনায় প্রকৃতির পরিবর্তন ধরা পড়েছে। কোন কোন গীতবাণীতে প্রিয় মানুষের আগমনে রোদ্দুর ময়ূরের রূপকল্পে উদ্ভাসিত এবং বৃষ্টি অভিনব হয়ে উঠেছে ফুলের উপমায়। তাই মেঘমল্লারে কবির হাতের বীণা পাঠক-শ্রোতার অন্তরে থরোথরো সুখের অলজ্জ অভিব্যক্তি রচনা করে। সন্ধ্যার ভীরু ছায়ায় সবুজ মাঠের অতল চোখে সুকোমল আলোর হাসি ধরা পড়েছে। কবি সন্ধ্যার সৌন্দর্যকে লাজুক কিশোরীর উপমায় মুদ্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যার খোঁপায় ফুলের গন্ধ আর দেহ পরীর পোশাকে আবৃত। এই সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত প্রজাপতি তাই বনান্তে ফিরে যায় এবং রাতের সীমান্তে জেগে ওঠে হারানো দিনের গান। কবির সঙ্গীতপিপাসু মন গানের পাখির উপমায় মুদ্রিত হয়েছে কোন কোন গীতবাণীতে। আগুন-রাঙা ফাগুনে ভ্রমরের গুঞ্জরণে ধরা পড়েছে গৌরীর প্রকৃতি-চেতনা। গীত-বাণীতে কবি ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনিকে সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছেন। এই সুরের সম্মোহন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের শূন্যতায় সোনা ছড়িয়ে রিক্ত দিনের অব্যক্ত বাণীকে পল্লবিত করেছে।

wewPÎ welqKwfwËK Mvb

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার পূজা, প্রেম, স্বদেশ বন্দনা ও প্রকৃতি আশ্রয়ী গানের পাশাপাশি আরও বহুবিচিত্র অঙ্গের বাণীবিন্যাসে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সংগীত ভান্ডারকে। এ পর্যায়ে তার-ই আরও কয়েকটি গানের পঙক্তি উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো:

ক. আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে / পান্থ পাখীর কূজন কাকলী ঘিরে।/ আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো/ আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে।/ অশথের ছায়ে মাঠে প্রান্তে দূরে / রাখালী বাঁশী বেজে বেজে ওঠা সুরে / আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই নীড়ে। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ :৮৭) এই গানটি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গান বলে একাধিকবার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য গীতবাণীতে কবির আত্ম-অনুভব বিকশিত হয়েছে।

খ. ও মালিক সারাজীবন কাঁদালে যখন / আমায় মেঘ করে দাও। তবু কাঁদতে পারবো পরের সুখে অনেক ভাল তাও মানুষ যেন কোর না আমায় মেঘ করে দাও। ফসল হারা শুকনো মাটির / বৈশাখেতে তৃষ্ণা পেলে / সাগর থেকে জল এনে যে / বৃষ্টি ধারায় দেব ঢেলে / আর রামধনুকে বলবো আমায় / রাঙিয়ে দিয়ে যাও। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১০৭) এটি গৌরীপ্রসন্নের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ গান।

গ. কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই / কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই / আজ আর নেই । নিখিলেশ প্যারিসে মইদুল ঢাকাতে / নেই তারা আজ কোন খবরে / গ্র্যাণ্ডের গীটারিষ্ট গোয়ানীজ ডি' সুজা / ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবওে/ কাকে যেন ভালবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে / পাগলা গারদে আছে রমা রায় / অমলটা ধুঁকছে দুরন্ত ক্যানসারে / জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায় । সুজাতাই আজ শুধু সবচেয়ে সুখে আছে / শুনেছি তো লাখপতি স্বামী তার / হীরে আর জহরতে আগাগোড়া মোড়া সে / গাড়ি বাড়ি সব কিছু দামী তার । (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : ২৬৯) এটা গৌরীপ্রসন্নের নস্টালজিক চেতনাসমৃদ্ধ গান। এই গানের আবেগময় ও জীবনমুখী বাণীবিন্যাস প্রতিটি বাঙালিকে স্মৃতির ইন্দ্রজালে বাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের ফেলে আসা ক্যাম্পাসে, বন্ধুদের আড্ডায় , জীবন সংগ্রামের নানা বাঁকে বাঁকে।

ঘ. ও নদীরে / একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। বল কোথায় তোমার দেশ / তোমার নেই কি চলার শেষ। তোমার কোন বাঁধন নাই– / তুমি ঘরছাড়া কি তাই– / এই আছ ভাঁটায় আবার / এই তো দেখি জোয়ারে। এ কূল ভেঙে ও কূল তুমি গড়,/ যার এ কূল ও কূল দু কূল গেল / তার লাগি কি কর? / আমায় ভাবছ মিছেই / পর–/ তোমার নেই কি অবসর, / সুখ দুঃখের কথা কিছু– / কইলে না হয় আমারে। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১০৩) " নীল আকাশের নীচে পৃথিবী " চলত্রিের এই গানটি শুধু ভালোই লাগে না, নদীর অনন্ত যাত্রার সঙ্গী হিসেবে আমাদের মনও ছুটে যেতে চায় দিগন্তের দূর অজানায় । 'নদী' নিয়ে এরূপ ব্যতিক্রমধর্মী , প্রতীকী ও নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গান গীতস্রষ্টার এক অনবদ্য সংযোজ।

ঙ. বাঁশি শুনে আর কাজ নাই / সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি ॥ সে যে দিনদুপুরে চুরি কওে / রাত্তিরে তো কথা নাই ॥ ॥ ও শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু / বাঁশি পোড়ায় প্রাণ গরলে / ঘুচাব তার নষ্টামী আজ / আমি সপিব তারে অনলে । (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৬) এই গানটিতে গৌরীপ্রসন্ন 'বাঁশি' শব্দটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং একি সাথে পৌরাণিক

প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কারণ ‘ডাকাতিয়া- বাঁশি’ রূপকটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূলতঃ কৃষ্ণের বাঁশি হিসেবে শ্রীমতি রাধাকে অভিসারে আমন্ত্রণের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

চ. এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে / মন যেতে নাহি চায় / তবুও মরণ কেন এখান থেকে / ডেকে নিয়ে যায়/ কে জানে কোথায় / না না না না যাব না। মনে হয়, মানুষেরই সুখে দুখে মিশে থাকি/ তাদের কাছে ডাকি, / কণ্ঠ জড়ায়ে ধরে বলি যেতে দিও না আমায় / না না না না যাব না। (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : ৮৪) এটি গৌরীপ্রসন্নের একটি চিরন্তন আবেদনসমৃদ্ধ গান।

Qov Mvb

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কয়েকটি ছড়া গান উপস্থাপন করা হলো:

ক. বড় বৌ কুট্‌নো কোটে / মেজো কাটে মাছ / সেজোর মুখে খৈ ফোটে / চুলোতে দেয় আঁচ। রাঙা বৌ বাটনা বাটে / ছোট বৌ গড়ায় খাটে / দেমাকে তার ঝিলিক্ মাওে / নাকছাবির ঐ কাঁচ ॥ (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১১)

খ. সবাই করে দুর দুর, বুক করে দুর্‌দুর / গন্ধ যে ভুর ভুর, পেট করে গুড়মূড় / নেশাতে চুরচুর, দাঁত করে সুরসুর / পথটা যে ঘুরঘুর, গাছ পড়ে হুড়মুড় / পাতা ঝরে ঝুর ঝুর, খোকা করে ঘুরঘুর / হাওয়া বয় ফুরফুর ॥ (গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১১)

গ. মিষ্টি কথা, মুখ নষ্ট / ধান নষ্ট পোকাতে / হায়রে কপাল দেশটা হল / নষ্ট বুড়ো খোকাতে / অভাবে যে স্বভাব নষ্ট / ব্যবসা নষ্ট বোকাতে / কথার দোষে কাজ নষ্ট / ভিক্ষায় নষ্ট মান / স্ত্রীর দোষে ঘর নষ্ট / চুনে নষ্ট পান। মেঘের দোষে চাঁদ নষ্ট / ঝড়ে নষ্ট ফুল / নদী যে তার বন্যা দিয়ে / নষ্ট করে কুল। বেসুরো ঐ গলার দোষে / নষ্ট যে হল গান। পাখীর দোষে ফল নষ্ট / অভাবে নষ্ট মুখ। (‡MŠixcmb 2003 : 112)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

কর্ম ও সৃজনের যুগলস্রোতে স্নাত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯)। গীতস্রষ্টা হিসেবে বিচিত্র বিষয়কে শব্দবন্দি করেছেন তিনি। গীতবাণীর সান্নিধ্যেই তিনি সবচেয়ে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। জীবনকে নিবিড়ভাবে পাঠ করার যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন, তা-ই তাঁর সৃষ্টিকর্মে যুক্ত করেছে এক বিচিত্র ব্যঞ্জনা ও অভিনব শিল্পঋদ্ধি। বাংলা গানের দীর্ঘ পথযাত্রার বাঁকবদলের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক অভিনিবেশও লক্ষ করার মতো। তাঁর গীতবাণীর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা পাঠকের চৈতন্যে আলোড়ন তোলে। গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি ধ্বনিমাধুর্যের

মোহনরূপে মুগ্ধ হয়েছেন। এই মুগ্ধতার পথ ধরেই তিনি গীত-বাণীর ঝর্নাতলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আধুনিক বাংলা গানকে কবিতার ঐশ্বর্য উপহার দিয়েছেন তিনি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয়ানুগ শ্রেণিকরণে আমরা তাঁর গীতবাণীকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করতে চাই। যেমন- পূজা বিষয়ক গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেম বিষয়ক গান ও প্রকৃতি বিষয়ক গান। বর্তমান আলোচনায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর আলোকে তাঁর গানের বিষয়বৈচিত্র্য, স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করার প্রয়াস পাবো।

cRv welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজা-বিষয়ক গীত-বাণীতে পূজার অর্ঘ্য হিসেবে নিজেকে নিবেদনের গতিবিধি ও গভীরতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর নিবেদন ও নির্মাণের নিজস্বতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব এবং সঙ্গত কারণেই এই পর্যবেক্ষণে আমরা তাঁর গীতবাণীতে বিম্বিত পূজা বা সমর্পণের আশ্রয় নেব।

পুলকের সমগ্র নিবেদনের মধ্যেই দেবতা ও প্রিয় পরস্পরের হাত ধরে পথ চলেছে, এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বৈপরীত্য বা ভেদরেখা স্বীকার করেননি তিনি। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের †mvbvi Zix কাব্যের 'বৈষ্ণবকবিতা'র কথা স্মরণ করা যায় :

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে– প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ২/৪২)

পূর্ণাঙ্গ সমর্পণের মাধ্যমেই প্রেম সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে এবং তা সার্থকতার সারস্বত অভিব্যক্তি লাভ করে প্রেমিককে সৃষ্টিশীল করে তোলে। এই সৃষ্টির আনন্দ যেমন উগভোগ্য হয়ে ওঠে, তেমনি এর বেদনাও বৈনাশিক নয়, সৃজনশীল অর্থাৎ তা তৃপ্তিদায়ক। পুলকের পূজা-পর্যায়ের কয়েকটি গান লক্ষ করা যাক :

ক. আমারও তো গান ছিল সাধ ছিল মনে/ সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে!/জানি না কী অপরাধে শোনাতে সে-গান/ বাঁধা বীণা ছিঁড়ে গেলো ভেঙে গেলো প্রাণ/ কত সুখ পেলো বিধি / তার এ-লিখনে?(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:২২৫)। উপরিউক্ত গানে শিল্প বা সংগীতই প্রধান উপজীব্য এবং সেই বিষয় থেকে কবি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে দেবী সরস্বতীকে দেখেছেন, এটি বাংলা গানের বাঁকবদলের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ও অভিনব সংযোজন।

খ. পূজার থালায় ভরা ছিল অঞ্জলি কণ্ঠেতে ছিল যে মণিহার/ আমার সহসা তাকিয়ে দেখিহয়ে গেলো আজ একী মালাটি গলায় দোলে তোমার! আমি প্রাণের প্রণামে তোমার চরণ ধরি / সরায়োনা তুমি যেন তারে/ তুমি এলে আঁধারে প্রথম সূর্য হয়ে / সোনা রঙ আলোরই বাহারে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:২০৬) এই গানের মধ্যে ভাষার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রথাগত ধর্ম পালন না করা একজন ব্যক্তি যে দেবীর প্রতি অনুরক্ত হতে পারে- গীতবাণীতে তার প্রকাশ ঘটেছে। ধর্মেরে আনুষ্ঠানিকতাকে উপেক্ষো করে অন্তগর্ত প্রেম ও শ্রদ্ধা দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি।

গ. আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি / আমি অনাহূত একজন অনেক দোষেতে দোষী। আমি সবার পিছনে থাকবো / শুধু মনে মনে মাকে ডাকবো / কারো কাজে বাধা হলে / সাজা দিও যতো খুশি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯) উপরিউক্ত গানে উপসনাকারী হিসেবে নিজে দেবীর সামনে না গিয়ে দূর থেকে প্রণাম করা - এই বিষয়টির মধ্যে তৎকালীন হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতা তথা বর্ণ বৈষম্যের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। মানুষ হিসেবে সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার কথা বলেছেন তিনি। মায়ের কাছে সব সন্তানই যেমন পরম স্নেহের ও আদরের, তেমনি স্রষ্টার কাছেও সবাই সমান। সমাজ-সংসারের বিবিধ বিভাজন কীভাবে মানুষকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করতে শেখায়, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কবি।

পুলকের পূজা পর্যায়ের গানে আমরা লক্ষ করি, ঝড়ের ঝাপটা উপেক্ষা করে কবির মুক্তি-প্রত্যাশী প্রাণ গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। এই মুক্তি কবির বিচিত্র ভাব ও চৈতন্যের দ্যোতক এবং তা বিশেষ গন্তব্যের দিকেই পথনির্দেশ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অর্জনের জন্য যে আপসহীন মানসিক শক্তি আবশ্যক, কবি সেই দিকেই নিজের মনকে চালিত করতে চাইছেন। কবির গানে বারবার এপার-ওপারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। আসা-যাওয়ার পথের ধারে বসে কবি মানবজীবনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এই পর্যবেক্ষণ-প্রসূত অভিজ্ঞতাই তাঁর নানা গীতবাণীতে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পিত হয়েছে। পরপারের ডাক একদিন আসবেই এবং এই ডাকে সবাইকেই একদিন সাড়া দিতে হবে। তাই তাড়া করে পারের পাথেয় সংগ্রহের কথা স্মরণ করছেন তিনি। নিজের উদ্দেশে কবির এই সতর্কবাণী বা নির্দেশনায় যে সার্বজনীন সত্যের প্রকাশ ঘটেছে, সেই সত্যই তাঁর গানকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে– এমনটি ভাবলে কবির শক্তির প্রতি অমর্যাদা করা হয়। আনন্দের সঙ্গে আঘাত সহ্য করে দারুণ দুঃসময়েও কণ্ঠে গানকে ধারণ করার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন কবি, সেখানেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা।

†‘ kvZ¦‡evaK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ-প্রেমের গানে জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ব ও দায়িত্ববোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন, জন্মভূমি জন্মসূত্রে পাওয়ার ব্যাপার নয়, কাজের মাধ্যমে স্বদেশকে নিজের করে নিতে হয়। তাঁর গীতবাণীতে তাই আমরা লক্ষ করি দেশের মানুষের জন্য নিজেকে নিবেদনের প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা বিষয়ক একটি মন্তব্য স্মরণ যোগ্য:

> সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানা স্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে– ‘কী করিব, কেমন করিয়া করিব।’ আজ আমরা কর্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি– এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, সেই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে।...আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্‌বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ৫/৭৫৬-৫৭)

পুলকের দেশাত্মবোধক গানে আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শুধু কথার দ্বারা দেশোদ্ধারের চেষ্টাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। দেশ ও মানুষের সেবায় একনিষ্ঠ কর্মীরই শুধু প্রকৃত স্বদেশ থাকে– পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক গীতবাণীতে এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে বেদনার কথা থাকলেও তা কেবল ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তির আর্তিতে পরিকীর্ণ নয়। অস্থির ও অসুস্থ সময়ের বিপন্ন মানুষের প্রতিনিধি

হিসেবেই তিনি দৈনন্দিন জীবনের নানা অসঙ্গতিতে ব্যথিত হন। তাঁর ভোগের বৃত্তান্তেও বিচূর্ণ মানুষের ব্যর্থতার ছবি ফুটে ওঠে। 'সৌর-পৃথিবী'র শেষাংশে কবি যখন আশায় বুক বেঁধে আলোকিত দিনের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন তাঁর চারপাশে তাঁরই মতো অগণিত ভাগ্য বিড়ম্বিত অথচ আশাবাদী মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায়। পুলক তাঁর গীতবাণীতে জীবনের প্রতি মমত্বের নানা নিদর্শন হাজির করেছেন। পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের বিচিত্র অনুষঙ্গে তাঁর বেঁচে থাকার আনন্দ অন্বেষণ করেছেন তিনি। অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন জীবনের নানা বঞ্চনা ও অতৃপ্তিকে, সেই সঙ্গে প্রাপ্তির হিসেব মেলাতে গিয়ে মৃত্তিকার ধূলিকণাকেও পরম প্রিয় মনে হয়েছে তাঁর। আকাশে বাতাসে নিজের অন্তর্গত সুরটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর গীতবাণীতে মনের গহনে লুকিয়ে থাকা অন্য এক মনের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়েছেন তিনি। তিনি অনুভব করেছেন, অন্তরের সকল পিপাসার পরিতৃপ্তি অসম্ভব হলেও জীবনের অমলিন আশাও অর্থহীন নয়, বিচিত্র বঞ্চনার চিহ্ন বুকে ধারণ করেও অসম্ভব আশাবাদী এই কবি। গীতবাণীতে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নানামাত্রিক পরিচয় বাণীবদ্ধ হয়েছে। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কবি তাঁর ব্যক্তিগত আকাশের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, সেই মাটির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। এভাবেই কবির অন্তর্গত সত্তার শেকড় স্বদেশের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়, রচিত পঙ্ক্তির শব্দাবলি তাঁর ইচ্ছের অনুকূল আবহে আত্মখচিত অভিব্যক্তির ধারক হয়ে ওঠে। এই সত্যতার স্বরূপ অন্বেষণে তাঁর গীতবাণীর উজ্জ্বল কিছু পঙ্ক্তি উচ্চারণে প্রয়াস পাবো :

ক. কতো যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি কতো পথ হলাম যে পার / তোমার মতন এ্যাতো অপরূপ সুন্দর কাউকে তো দেখিনি গো আর / প্রিয়তমা মনে রেখো অনুপমা মনে রেখো / হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে ওই কাশফুল / উড়ে যায় আঁচল যে ওড়ে এলো চুল /আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়ায় / পথ চলো প্রিয়া যে আমার / অনেক দেখেছি তবু / তোমার ও মুখখানি / সাধ হয় দেখি গো আবার! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:২৯৪)।দেশকে প্রেয়সী হিসেবে গীতবাণীর আশ্রয়ে নির্মাণ করা; এটি ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি ব্যতিক্রমী এবং সাহসী শিল্পিত প্রয়াস। কারণ সাধারণত আমরা দেশকে মায়ের মূর্তিতে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে পুলক অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এটি তাঁর এক অভিনব শিল্পদৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

খ. বাঙালি কাঙালি নয় জিয়ন রসের কারবারী / নিজের মুখের ব্যঞ্জনে সে সাজায় পরের তরকারী / বাঙালি যতো না খায় তারো যে বেশি খাওয়ায় / আয় আয় আয়

খাবি আয় দ্বার খুলেছে ভাণ্ডারী! বাঙালির পিছে পায়েস খেয়ে যা করে আয়েস / গা-গতোর শক্ত হবে নিমেষে কমবে বয়েস / বাঙালির মুড়ির মোয়া গুড়পাটালির স্বাদ ভারী! বাঙালির ভাপা ইলিশ আহারে আস্তে গিলিস / কচু শাক মাছের মাথার ঘন্টোতে ঢেঁকুর তুলিস / সে মরুক লাল দই যে খায় নি কোথাও এক হাঁড়ি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৩০১)।গীতবাণীর আশ্রয়ে কবি দেশাত্মবোধক গানে শ্লেষ, রম্য উপস্থাপন, লোকাচার ও লোকায়ত জীবনের নানা অনুসঙ্গ হাজির করেছেন। মুড়ি, দই, পাবদা, সন্দেশ, রসোগোল্লা, পানের খিলি ইত্যাদি উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিকে স্পর্শ করেছেন।

গ. শুধু একটা শহীদ ক্ষুদিরাম / লক্ষ বছর ধরে একটা জাতিকে দেয় / শ্রেষ্ঠ জাতির শিরোনাম! ও বাঙালি ক্ষুদিরাম ক্ষুদিরাম / প্রণাম তোমায় প্রণাম! স্বাধীনতার ওই সূর্য তোরণে / তোমার প্রাণের আলো / ধুয়ে দিয়ে গেছে রক্ত শিখায় / অনেক আঁধার কালো অন্ধ যারা দ্যাখো না তাকে / ইতিহাস শুধু নীরবে লেখে / সূর্যের অক্ষরে তোমার-ই নাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৩০১) ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ পুণজাগরনের অন্যতম নায়ক ছিলেন ক্ষুদিরাম। তিনি ভারতীয়দের প্রেরণার অন্তহীন উৎস। আলোচ্য গানে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের ঋণ স্বীকার করা হয়েছে।

ঘ. বাঙালির গড়া এই বাংলা / শস্য সবুজ এই শ্যামলা / আজ কেন হয়ে গেল ক্যাংলা / যদি প্রশ্ন করে বীর নেতাজী / কি তার জবাব দেব আমরা? আমাদের বিণয় বাদল / দীনেশ বাঘা যতীন/ রক্তে রাঙা এই ঝাণ্ডা / মহীয়ান হোক চিরদিন / স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির রক্ত ইতিহাসে হোক আরো অমলিন! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৩০২) কবি উপরিউক্ত গানে দেশের সাময়িক দুর্দিনে ফেলে আসা গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোটা জাতির চেতনার দ্বারে নাড়া দিতে চাইছেন।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত থেকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ ভাবনার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। পুলকের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প আশ্রিত ভাষায় কবির জন্মভূমি চিত্রিত হয়েছে এক স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর স্বদেশের মুখে কখনো তিনি লক্ষ করেছেন মার্তৃমূর্তি, আবার কখনো-বা প্রেয়সীর ছবি ভেসে উঠেছে তাঁর গীতবাণীর উচ্ছ্বল-উজ্জ্বল বাণীবিন্যাসে।

†cg welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গানেরই প্রধান উপজীব্য প্রেম। প্রেম-বিষয়ক গীত-বাণীর মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণের আয়োজনকে শব্দবন্দি করেছেন তিনি। পুলকের সুরবাণীর পথে প্রেমের দর্পণে নিজেকে দেখার নানা আয়োজন লক্ষণীয়। যার চকিত চাহনী কবির সৃজনভাবনাকে সচল-সবল-সাবলীল করে তোলে, কবি তাকেই উপহার দেন গীত-সুধার গর্বিত শব্দমালা। ব্যক্তিগত বিবর থেকে বাইরে এসে আলোর ঝর্নাধারায় জলের গুঞ্জরণে অন্তরের অতল থেকে অভিনব অভিব্যক্তির ঐশ্বর্যে গানকে সিক্ত করেন কবি। এ-যেন শূন্যতার আড়াল ভেঙে পূর্ণতার দিকে হাত বাড়ানোর প্রলোভন। ধূপের সুগন্ধ যেমন তার শর্তহীন আত্মত্যাগের অর্থবহ পরিণাম, তেমনি তাঁর গানের বাণী জীবনকে অকাতরে প্রেমের সৌন্দর্য ও দীপ্তির হাতে সমর্পণের সার্থক ও শিল্পসম্মত রূপায়ণ। আর এ-জাতীয় গান অন্তরে যে প্রাণের সাড়া এনে দেয়, নাড়া দেয় শিল্পীর স্বরতন্ত্রীতে, তাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক বাংলা গানে প্রেমকে খুব সহজ-সরল ও সস্তা বিষয়ে পরিণত করার নজির কম নেই। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা প্রেমের গানকে এই দুর্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বাংলা গানের বিষয়-আশয় সম্পর্কে একজন সঙ্গীত-সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে :

> পরিহাস ক'রে বলেন কেউ কেউ বলেন, বাংলা গানের সবচেয়ে অবসেসন হল ফুল আর মালা। আর কেউ কেউ বলেন, চাঁদ সমাধি বালুচর বাসর আর প্রিয়া। তবু এরই মধ্যে হয়তো শোনা গেল কোনো গানে : 'রাতের ময়ূরী ছড়ালো যে পাখা আকাশের নীল গায়'। কিংবা 'পাষাণ-ফুলের গন্ধ উতলা' প্রসঙ্গ বাচনের অভিনবত্বে ঝলসে উঠল। আরেকজন গানে নিয়ে এলেন 'কানে-কানে-ডাকা নামের মনে-মনে রাখার মায়া'র বিহ্বলতা। একজন পুষ্পবিভোর গীতকার ফুলের সুরভি ফুরানোর সঙ্গে প্রেমের ফুলডোর ঝ'রে পড়াকে মিলিয়ে দেখেন। কারো গানের বাণীতে ফুল-ঝ'রে-যাওয়া কাঁটার মতো প্রণয়স্মৃতি জেগে থাকে। হয়তো এরই মধ্যে ব্যতিক্রমী উচ্চারণ আনেনে আরেকজন এই আক্ষেপে যে মনের গহনে সুন্দরের মূর্তিখানি ভেঙে মুছে যায় বারেবারে। (সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৪ : ২৮)

সমালোচকের এই মন্তব্য মাথায় রেখে আমরা যদি পুলকের প্রেমাশ্রিত গীতবাণীর পাঠ নেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করবো, তিনি সার্থকতার সঙ্গে প্রেমের একঘেয়েমী উচ্চারণ থেকে গানকে মুক্তি দিয়েছেন। কয়েকটি গীতবাণী পাঠ করা যাক :

ক. আবার নতুন করে / ভুলে যাওয়া নাম ধরে ডেকোনা / হারানো স্বপন চোখে এঁকোনা! ঝরা মালা বুকে তুলে নিয়ে / স্মৃতির সুরভি ঢেলে দিয়ে / ফাগুনের গান মনে রেখোনা! আবার মাধবীলতা / বাতাসে চেয়োনা তুমি দোলাতে / যে-ব্যথা নিয়েছি মেনে / অকারণে এসোনা তা' ভোলাতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৬) । ফিল্মি গানের দুনিয়ায় বাংলা গানের তরলতা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর চিত্রময়তা গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রেম কিংবা বিরহ মার্গীয় শিল্প ভাবনা থেকে সরে এসে মধ্যবিত্ত কলকাতার বাঙালিদের মননে গড়া গান এক অভিনব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

খ. এমন অনেক কথাই বলো তুমি / মন থেকে যা বলো না / আবার অনেক তোমার সত্যি কথা / আমি ভাবি ছলনা! / রেশমি চুড়ির আওয়াজ দিয়ে / কত কথা যাও যে বলে / কত কথা বলে ওঠো / কালো চোখের ওই কাজলে / আবার কত কথা বলি বলি/ করেও কিছু বলো না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৫০)। গানের সুর, কম্পোজিশন, শব্দ ধারণ চমৎকার। গানের বাণী নায়ক ও নায়িকার চরিত্রকে এবং ছিচুয়েশন কে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। গানে কাব্য গীতির প্রভাব প্রকাশিত।

গ. এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না / যাতে মুক্তো আছে / এমন কোনো মানুষ খুঁজে পেলাম না / যার মন আছে! / শুনে গেলাম অনেক কথা / অনেক গল্প অনেক গাথা / এমন একটি কথা খুঁজে পেলাম না / যাতে সত্যি আছে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৫৪) প্রেমের বিরহ, নিসঙ্গতা, একাকীত্ব ও গভীর বেদনা এই গানের মূল উপজীব্য। এমন দৃষ্টান্ত বাংলা গানে বিরল।

ঘ. তুমি অনেক যত্ন কওে / আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো / দিতো পারোনি! / কী তার জবাব দেবে / যদি বলি আমিই কি হেরেছি / তুমিও কি একটুও হারোনি? / সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলেছো/ ফুলেতে আগুন তুমি জ্বেলেছো / ফাগুনের সব কেড়ে নিয়েছো / স্মৃতিটুকু তার কেন কাড়োনি? / (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১০৪)। উপরিউক্ত গীতবাণীর আশ্রয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমের এক প্রবল বিরহের ছবি চিত্রায়িত করেছেন এবং তা থেকে উত্তীর্ণের এক শিল্পিত উচ্চারণও লক্ষ করা যায়।

ঙ. ও কেন এতো সুন্দরী হলো / ওমনি করে ফিরে তাকালো / দেখে তো আমি মুগ্ধ হবোই

আমি তো মানুষ!/ সবে যখন আকাশ জুড়ে / মেঘ জমেছে / ঝড় ওঠেনি বাতাসটাতে/ ঘোর লেগেছে / ও কেন তখন / উড়িয়ে আঁচল / খোলা চুলে বাইরে এলো? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪০৯:১৩৩)। এটি প্রেমের সূচনা পর্বের গান। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের দূনির্বার আকর্ষণ, এটি জন্মগত। এই গানে সৌন্দর্য অবলোকনের অধিকার বিবৃত হয়েছে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম বিষয়ক গানের আরো কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

১. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব / আমি হারিয়ে যাব তোমার সাথে সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে / কিছু সময় রেখ তোমার হাতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১)।
২. ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি ভালবাসবে? / পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে কী করে এখানে তুমি আসবে? / (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৪১)।
৩. গানে গানে কতবার এই কথা কয়েছি / আমরা দুজনে শুধু দুজনার এই গান শুনে ওরা দিয়ে গেছে অপবাদ / হাশি মুখে তাই সয়েছি! / (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৪৮)।
৪. কতদিন পরে এলে একটু বোসো / তোমায় অনেক কথা বলার ছিল যদি শোনো! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১০৪)।
৫. তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা / তাই এতো গান গাওয়া এতো কাছে থাকা/ নীরব মনের নিভৃত দেখেছি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৭৭)।
৬. জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই / পাছে ভালোবেসে ফেলো তাই দূরে দূরে রই। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৭৯)।
৭. সুন্দরী গো দোহাই মান কোরোনা! / আজ নিশীথে কাছে থাকো 'না' বোলোনা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১০৫)।
৮. তুমি নয়-ই কাছে আসলে নাইবা আমায় ভালোবাসলে / তাই বলে আমি কেন ভালোবাসবোনা / আমি কেন কাছে আসবোনা । (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১১২)।
৯. অমন ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে / কালো ওই চোখটা থেকেও কাজল কালো কি? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১৩৩)।
১০. আমার বলার কিছু ছিল না / চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে / সব কিছু নিয়ে গেলে যা দিয়েছিলে / আনন্দ হাসিগান সব কেড়ে নিলে। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১৭১)।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম-আশ্রয়ী গীতবাণী পাঠে আমরা লক্ষ করি, তাঁর গানে বার বার অবুঝ, অভিমানী ও অহঙ্কারী নায়িকা এসে উপস্থিত হয়। ছোট্ট শিশুর অভিমান কিংবা আবদার পূরণের জন্য বড়োদের চেষ্টার যেমন অন্ত নেই, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও

তেমনি তাঁর নায়িকাদের মান ভাঙানোর অভিপ্রায়ে বারবার সুর-বাণীর আশ্রয় নিয়েছেন। কবি সুন্দরকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সংহতি দিয়েছেন, রাত্রির সৌন্দর্যে প্রিয়তমার কালো চুলের অবস্থিতি অবলোকন করেছেন। অভিমানের আড়াল ভেঙে নারীর হৃদয় জয় করার চেষ্টায় তিনি যেমন ক্লান্তিহীন, তেমনি সুন্দরের অবহেলায় আহত কবির অভিমানও কখনো কখনো কবিতায়-গানে নারীসুলভ কোমলতা নিয়ে এসেছে। কবির অনেক গীতবাণীর রমণীয় উচ্চারণে তাঁর অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের নিরাভরণ প্রকাশই প্রধান হয়ে ওঠে। ভালোবাসার জন্য শতভাগ সমপর্ণের উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁর গীত-বাণী। নারী ও নারীপ্রেম পুলকের গীতবাণীতে জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়। তাঁর কবিকল্পনার দিগন্তাভিসারী বিকাশ এই চিরায়ত মানবিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। নারী-হৃদয়কে নিবিড়ভাবে পাঠের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর প্রেম-বিষয়ক গীত-বাণী।

cKwZ welqK Mvb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতির গান আধুনিক বাংলা গীতবাণীর এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রকৃতি-আশ্রয়ী গানকে ঋতুসঙ্গীতও বলা যেতে পারে। ষড়ঋতুতে বাংলার প্রকৃতির যে লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা পুলকের গানে চমৎকার শিল্পসংহতি নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। পুলক অনুধাবন করেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দেশ করে বস্তুকে বিচার করা খুবই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং তাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে প্রকৃতি ও সঙ্গীতের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সঙ্গীত শিল্পতত্ত্বের একটি অতিগভীর সত্যকে প্রকাশ করছে এবং এই সম্বন্ধের যথার্থ উপলব্ধির উপরেই এর সবচেয়ে কঠিন কঠিন সমস্যা মীমাংসা এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের সমাধান নির্ভর করছে। সঙ্গীত ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ সনাক্ত করতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কোন্ অর্থে প্রকৃতি সংগীতকে উপাদান যোগায় তা পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাই যে, যে যে উপাদান থেকে মানুষ সুর বা ধ্বনি বের করার চেষ্টা করে সেই স্থূল উপাদান ছাড়া প্রকৃতি আর কিছুই দেয় না। পাহাড়ের নিঃশব্দ ধাতুমিশ্র পদার্থ, বনের কাঠ, প্রাণীর চামড়া ও নাড়ীভুড়ি প্রভৃতি হচ্ছে সেই সব কাঁচা মাল যা দিয়ে সুরেলা ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অতএব প্রথমেই, আমরা পাচ্ছি সেই উপাদানকে যা থেকে মূল উপাদান অর্থাৎ উঁচু বা নীচু পর্দার ধ্বনি, এক কথায় পরিমেয় স্বর তৈরি করা যায়। এই শেষোক্তটি সব সংগীতেরই পক্ষে প্রাথমিক এবং অপরিহার্য। কারণ সংগীতের কাজই হচ্ছে এই সব স্বরকে এমনভাবে মেশানো যাতে রাগ ও সুরসংহতি– সংগীতের

দুটি প্রধান অঙ্গ– তৈরি হয়ে ওঠে। এই দুটির কোনোটিই প্রকৃতির দান হিসেবে আমরা পাই না, দুটোই মানুষের মনের সৃষ্টি। (সাধনকুমার ভট্টাচার্য ২০০২ : ৯৩-৯৪)

পুলকের প্রকৃতি-আশ্রয়ী গীতবাণীতে প্রকৃতি কবির অন্তরের স্পর্শে নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রকৃতিকে উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করলেও তাঁর লক্ষ মূলত মানবসম্পর্কের গতিবিধি অনুধাবনের চেষ্টা। তিনি উপনিষদের আনন্দ-আশ্রয়ী বিভিন্ন শ্লোকের আলোকে তাঁর আত্মখচিত আনন্দের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন গীতবাণীতে। কবির গানের কথায় বিম্বিত আনন্দের প্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়োজনে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না– তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পারিবে না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬: ৭/৫৪২৪৩)

এই উদ্ধৃতিতে আমরা আনন্দের যে প্রকৃতি ও প্রভাব লক্ষ করি, তা তাঁর গীত-বাণীর আনন্দেরই অনুরূপ। প্রকৃতিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারলে সামান্য বস্তুও অসামান্য ব্যঞ্জনাসঞ্চারী হয়ে ওঠে। তখনই প্রাণ খুলে প্রকৃতির আনন্দরসে অবগাহন করা যায়। যে জ্যোতির্ময়ী পৃথিবীর সকল অগতির গতি, তারই স্পর্শে অতি ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে অসম্ভব সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার। তখন মনের মধ্যে যে বোধ জাগ্রত হয়, পুলকের গীতবাণীতে তার সন্ধান করা যেতে পারে :

ক. ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না / ও বাতাস আঁখি মেলো না / আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে। আহা কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে! / তার সময় হলো আমায় মালা দেবার সেযে প্রাণের সুরে গান শোনাবে এবার / সেই সুরেতে ঝর্ণা তুমি চরণ ফেলোনা। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৭৫)। সাধারণত গানে প্রকৃতিকে উপমা করে প্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এই গানে প্রকৃতিকে গুরুত্বহীন করে প্রিয়াকে অতুলনীয় করা হয়েছে। এখানে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক নতুন এবং ব্যতিক্রমী শিল্প বোধের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

খ. মনে করো আমি নেই / বসন্ত এসে গেছে / কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় / চৈতালী ভেসে গেছে! / শুক্লাতিথির ওই ছায়াপথে / চলছে নতুন রাত মায়া-রথে / তুমি অবাক চোখে চেয়ে/ অপলকে ভাবছো ভালো কে বেসে গেছে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:৭) কবির সমগ্র অস্তিত্ব প্রকৃতির মাঝে লীন হয়ে গেছে। প্রকৃতির মাঝে নিমগ্ন থেকে কবি এখানে এক চির প্রশান্তির ভুবন নির্মাণ করছেন। ভাষার সরলতা দিয়ে নিসর্গ ও প্রকৃতির এমন চিত্রময় প্রকাশ খুব কম গীতিকবির পক্ষেই সম্ভব।

গ. নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা / বুঝিবা পথ ভুলে যায় / কুলায় যেতে যেতে কী যেন কাকলী আমারে দিয়ে যেতে চায়! / দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে / ওই গোধূলির রঙিন সোহাগ মেশে / বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি / কী বাঁশী ফেলে রাখে হায়! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৯১)। তৎকালীন কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানীর ডিমান্ডের কারণে মেল-ফিমেল মিউজিক এর বিশেষ ধারণা গড়ে ওঠে। যাকে ফরমায়েশি গান বলা হতো। এ গানটি সে শ্রেণিভুক্ত।

ঘ. পৌষের কাছাকাছি রোদমাখা সেই দিন / ফিরে আর আসবে কি কখনো / খুশী আর লজ্জার মাঝামাঝি সেই হাসি / তুমি আর হাসবে কি কখনো? / অনুরাগ করা নাম না-জেনে অধরেতে কোনো সাড়া না-এনে / দেখা আর না-দেখার / কাছাকাছি কোনো রঙ / চোখে আর ভাসবে কি কখনো? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯:১১৩) শহরে মধ্যবিত্তের রোমান্টিকতা, আবেগ, ফেলে আসা গ্রামীণ জীবনের আর্ত নাত, অতীতের ছোট ছোট সুখ-দু:খের গল্প এ গানের প্রধান উপজীব্য।

পুলকের প্রকৃতি-আশ্রয়ী গীতবাণী পাঠ করে আমরা উপলব্ধি করি, প্রকৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত রূপটি সহজেই উন্মোচন করা সম্ভব। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে খুব সহজেই একটি দিক মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হলো : মানুষের আবেগ যখন সৃজনশীল প্রণোদনায় উদ্দীপিত হয়, তখন প্রকৃতি আপনা থেকেই তার হাতে এসে ধরা দেয়। এই ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে মুক্তির আনন্দও লাভ করি।

জীবনের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ই সঙ্গীতের দর্পণে বিম্বিত হয়। সজীব প্রাণের সারস্বত প্রকাশ হিসেবে সঙ্গীত কবির নির্বাচিত শব্দাবলিকে স্বীকৃত অর্থের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাতে যুক্ত করে নৈঃশব্দ্যের দ্যোতনা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীত-বাণীতে সঙ্গীতভাবনার সমান্তরালে তাঁদের জীবনবীক্ষার গতিপ্রকৃতিই সংহত হয়েছে। বাংলা গানের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই

তাঁদের গীত-বাণী আড়ালকে আনন্দময় এবং দূরবর্তীকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে। যাকে আমরা আধুনিক গান বলি, এসব গান যে তার ঐতিহ্য-সংলগ্ন, সেকথা অনস্বীকার্য। সুপরিচিত কাব্যপ্রয়োগ এতে অলক্ষ নয়, কিন্তু এর ভাষা ও ছন্দে, অলংকার ও বিন্যাসে যে-পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচয় পাই, তা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব বলে অতি সহজেই চিহ্নিত হতে পারে। যে জীবনাকাঙ্ক্ষা এই দুই গীতবাণীস্রষ্টাকে মানবচৈতন্যের অতলে ডুব দিয়ে এই অমূল্য রতন সংগ্রহের প্রণোদনা যুগিয়েছে, সেই অরূপ রতনের সংস্পর্শে গীত-বাণীর পাঠক-শ্রোতার অস্তিত্বের উদ্‌যাপনও হয়ে ওঠে অর্থবহ এবং গভীরতর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী।

বাংলা গানের ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও পরম্পরা সম্পর্কে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত-বাণী পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য তাঁদের সঙ্গীতবিষয়ক গীত-রচনায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তারই শিল্পিত প্রকাশ তাঁদের গানের বাণী। জীবনের যাবতীয় অনুভূতি ও উপলব্ধিকে তাঁরা গান-অনুষঙ্গে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের গীতবাণী-পাঠের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না । গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণে যা আছে, তার সবই যেন তাদেঁর গানে বাণীবদ্ধ হয়েছে। গানের বাণী যখন কানে ও প্রাণে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখন অনাস্বাদিত অভিব্যক্তির দ্যোতনায় শ্রোতার চৈতন্যও হয় সজাগ-সচকিত-সৃজনশীল।

Z_¨wb‡'k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরী প্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ১৯৯২।
২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন গীতি সমগ্র প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরী প্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ২০০৩।
৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯।
৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০
৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা ২০০৩,
৬. সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অনূদিত), সঙ্গীতে সুন্দর (মূল : এডুয়ার্ড হ্যান্‌স্‌লিক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০২
৭. অনুপ ঘোষাল (১৪০৮)। গানের ভুবনে। প্রকাশক- শ্রী দেবব্রত কর, কলকাতা।

৮. আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৯১)। এই কথাটি মনে রেখ। আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৯. করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১০.জয়ন্তী ভট্টাচার্য (১৩৯২)। রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

১১.জীবনানন্দ দাশ (২০০২)। কবিতার কথা। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

১২.নীলা গোস্বামী (২০০৫)। নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকার। প্রকাশক- শ্রীমতি গৌরী চক্রবর্ত্তী, কলকাতা।

১৩. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৬১)। কাব্যরচনা। রবীন্দ্র-স্মৃতি [সম্পা. বিশ্বনাথ দে], ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা।

১৪.শঙ্খ ঘোষ (২০০৮)। এ আমির আবরণ। প্যাপিরাস, কলকাতা।

১৫.শান্তিদেব ঘোষ (১৪১৫)। রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

১৬.শামসুর রাহমান (১৯৯০)। রবীন্দ্রনাথের গান, আমার অনুভূতি। নানা রবীন্দ্রনাথের মালা [সম্পা. আবুল হাসনাত], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৭.সুধীর চক্রবর্তী (১৩৯৭)। বাংলা গানের সন্ধানে। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

১৮.সুধীর চক্রবর্তী (২০০৮)। গান হতে গানে। পত্রলেখা, কলকাতা।

১৯.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। রবীন্দ্র-রচনাবলী। প্রথম খণ্ড–অষ্টাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা।

২০.রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৬৮)। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা। রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড [সম্পা. পুলিনবিহারী সেন], বাক্-সাহিত্য, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi Ges cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi Mv‡bi wkí-cKiY

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

Aj¼Vi

চতুর্থ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

Aj¼i

সুন্দরের সংস্পর্শে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা সৃজনশীল হয়ে ওঠে। বাইরের সৌন্দর্যের সঙ্গে স্রষ্টার অন্তর্গত সৌন্দর্যের মেলবন্ধনেই সৃষ্টি হয় মহৎ ও মানবিক সব শিল্পকর্ম। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ তা সহজাত। পমানুষ স্বভাবতই নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়। নিজের কাজ, চিন্তা ও কল্পনার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে সে অন্যের মনোযোগ দাবি করে, অন্যের চেয়ে আলাদা হয়ে উঠতে চায়। মানব-সভ্যতার ইতিহাস কেবল টিকে থাকার ইতিহাস নয়, ক্রমাগত নিজের অন্তর্গত অভিপ্রায়কে সুন্দরভাবে প্রকাশের মাধ্যমে নানাবিধ ক্ষতির হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে জীবনে গতি-সঞ্চারেরও ইতিহাস। কবিতা কিংবা গীতবাণী যেহেতু জীবনাভিজ্ঞতারই বিশিষ্ট প্রকাশ, যা অন্যের জীবনভাবনাকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে রচিত, তাই এই শিল্পকর্মকেও অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হয়। অলঙ্কার মূলত মানুষের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসারই শিল্পিত প্রয়াস। এই শিল্পপ্রয়াসের ভিন্নতা থেকে একজন শিল্পীর প্রতিভা ও বিশেষ ব্যক্তিত্বখচিত প্রবণতাটিও চিহ্নিত হয়ে যায়।

কবিতা কিংবা গীতবাণীর ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর বা সংবাদ প্রকাশের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে গিয়ে কিছু কৌশল অবলম্বন করে বলেই তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে কবিতা ও গীতবাণী পাঠক-চিত্তে রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। মানুষের হৃদয়ের রসানুভূতিগুলো 'সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যশীল এবং হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা চিৎস্পন্দন। এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা – এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎস্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৬৩ : ৬)।

কবিতার ও গানের বাণীর ভাষা এই অসাধারণত্ব লাভ করার জন্য অনেকাংশে অলঙ্কারের কাছে ঋণী। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, অলঙ্কার সব সময় কবিতার কিংবা গীতবাণীর সজ্জায় তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত থাকে না। কবিতা পাঠ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করি, কবিতার ভাষা কখনো কখনো এমন অবয়ব নির্মাণ করে নেয় যে, অলঙ্কার তার ভাষার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়। অলঙ্কার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা' (১৯৯৮ : ২০১)। সমালোচকের এই উক্তি শিল্পসফল গীতবাণীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে বলে আমরা মনে করি। কবিতায় বা গীতবাণীতে অলঙ্কার প্রয়োগ পাঠক-শ্রোতার রসানুভূতি জাগানোর যান্ত্রিক কৌশল মাত্র

নয়, কবির আত্মিক অনুরণন অনুভূত হলেই অলঙ্কার সার্থক হয়ে ওঠে। সেই অর্থে, কবিতায় বা গীতবাণীতে ব্যবহৃত অলঙ্কার কবির অন্তর্গত সৌন্দর্যানুভূতিরই শিল্পিত প্রকাশ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজন কবি যতো বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকার সঙ্গত কারণেই ততো স্বাধীন নন। কারণ গীতিকার তাঁর সৃষ্টিকর্মকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনে সুরকার এবং শিল্পীর অভিপ্রায়কেও মূল্য দেন। একজন গীতিকার তাঁর নিজস্ব ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবনে ব্যর্থ হলে তাঁর গীতবাণী শিল্পের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক ভাষারই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সেই ভাষার রূপকলা, নান্দনিক স্বাতন্ত্র্য, কাব্যরীতি ও শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশিত হয় (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩১৭)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে আয়ত্ত করেই তাঁদের গীতবাণীর প্রকরণ-প্রকৌশলে অভিনবত্ব আনার প্রয়াস পেয়েছেন। আবহমান বাংলা গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব নির্মাণকলা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর প্রকরণ আলোচনায় অলঙ্কার অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা লক্ষ করব, অলঙ্কারবাহুল্যে তাঁদের গীতবাণী কখনোই শ্লথগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে নি, আমাদের গৃহকর্মনিপুণা বধূটির মতোই প্রাঞ্জল-চঞ্চল-হাস্যময় তাঁদের শিল্পকর্মের ভাষা, যা আপন প্রাণের উচ্ছলতায় অন্যজনের হৃদয়কে কেবল স্পর্শই করে না, একটু নাড়াও দিয়ে যায়। তাই অনায়াসেই তাঁরা পাঠক-শ্রোতার রসানুভূতির সাড়া লাভ করেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর ধ্বনিগত অলঙ্কার আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, শব্দালঙ্কার কবিতার বা গীতবাণীর ভাষায় যোগ করে এমন অভিঘাত যা একজন স্রষ্টার শিল্পকর্মকে সঙ্গীতময়তা দান করে। বিশেষ করে অনুপ্রাসের অনুরণন গীতবাণীতে ব্যবহৃত প্রচল শব্দকে দান করে সম্মোহন-ক্ষমতা, যা সঙ্গীতের মতো পাঠকের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে তাকে মোহিত করে। একজন প্রতিভাবান শিল্পস্রষ্টা অনুপ্রাসকে কবিতার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেই ব্যক্তিত্বচিহ্নিত নির্মাণে অবতীর্ণ হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় অনুপ্রাসের অভিনবত্ব সৃষ্টিতে এঁরা দুজনই উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রকবিতার যে সঙ্গীতময়তা পাঠককে সম্মোহিত করে, তা-ও অনেকাংশেই অনুপ্রাসের অবদান। রবীন্দ্র-পরবর্তী শিল্পস্রষ্টারা রবীন্দ্রনাথের হাতে শিক্ষা নিলেও অনুপ্রাসের সেই শক্তিতে সমর্পিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ কখনো যুক্ত আবার কখনো বিযুক্তভাবে যখন বাক্যে একাধিকবার ধ্বনিত হয় তখন সেই বর্ণের অভিঘাত সমগ্র বাক্যটিকে অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দান করে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত অনুপ্রাসের কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

Aš Í ¨vbcvm

অন্ত্যানুপ্রাসে কবিতার বা গীতবাণীর প্রথম চরণের শেষ শব্দটির সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দটির অথবা প্রথম চরণের শেষ শব্দের সঙ্গে তৃতীয় চরণের শেষ শব্দের ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি হয়। এতে গীতবাণীর চরণেই শুধু নয়, বক্তব্যেও গতি সঞ্চারিত হয়। এই গতির কারণেই গানের বাণী কানের ভেতর দিয়ে পাঠক বা শ্রোতার প্রাণে প্রবেশ করে। এখন আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে অন্ত্যানুপ্রাসের অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হবো।

†MŠixcmb gRg`vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীকে আমরা সফল কবিতা হিসেবে পাঠ করতে চাই। কারণ তিনি কেবল সুরের মাধ্যমেই দূরের মানুষকে কাছে টানেন নি, তাঁর গীতবাণীর ভাষাকেও শিল্পের মহিমা দান করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর কয়েকটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে
বিবস রাধার তনু তোমারই বিরহ ভারে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৩৭)

খ. ও নদীরে
একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে।
বল কোথায় তোমার দেশ
তোমায় নেই কি চলার শেষ।
তোমার কোন বাঁধন নাই,
তুমি ঘরছাড়া কি তাই (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৮৯)

গ. এই না পাওয়ার ব্যথাভরা তিথিতে
মন আমার ভরে আছে স্মৃতিতে
হায় বাসর ভরা সেই ফুল
হলো কাঁটার আঘাতে যেন ভুল (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২:১০৮)

ঘ. কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল
কোথায় পথের প্রান্ত।
ঠিকান-হারানো চরণের গতি
হয়নি কি তবু ক্লান্ত। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২:১৯৮)

ঙ. হয়তো কিছুই নাহি পাবো
তবুও তোমায় আমি
দুর হতে ভালবেসে যাবো।
যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা
জানি তুমি বুঝিবেনা তবু তারই ভাষা। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২:২১২)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

গীতবাণীকে মধুর, মুখর এবং মর্মস্পর্শী করার জন্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাকে শিল্পের অবয়ব দিয়েই পাঠক/শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করেছেন। অন্ত্যানুপ্রাসের ক্ষেত্রে পুলকের কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। তাই তাঁর গীতবাণী কেবল গানের বাণী হিসেবেই বিবেচিত হয় নি, উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবেও পাঠ করা হয়। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি।

ক. অস্তরাগের রঙিন সুরে   রাঙাও আমার প্রাণ
সোনা রোদের গান
আমার বেলা শেষের গান।
সব পাখিরা একে একে
ফিরে এলো আকাশ থেকে
দুটি পাখির আলাপ শুধু   হয়নি অবসান ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ২২)

খ. তোমায় আমায় প্রথম দেখা   গানের প্রথম কলিতে
বৈশাখী এক দমকা হাওয়ায়   খেয়ালী পথ চলিতে
তোমায় আমায় আলাপ হলো সেই গানেরই অন্তরাতে
আকাশ যখন আষাঢ় মেঘের   ছন্দে মাতে   (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৩৮)

গ. জানি না ফুলের কী হয় ফাগুন দেখে
জানি না রাতের কী হয় জ্যোছ্না মেখে
আমি শুধু জানি
মনে মনে মানি
তোমাকে স্বপ্নে দেখেও সুখ
তোমাকে সামনে দেখেও সুখ। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৪৩)

ঘ. ও শ্যাম যখন তখন
খেলো না খেলা এমন
ধরলে আজ তোমায় ছাড়বো না
দুহাতে মনের সুখে
মাখাবো আবির মুখে
আজকে এই খেলাতে হারবো না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৪৮)

ঙ. প্রদীপ তুমি তুলষীতলায় জ্বোলো
আমার সয়না ঘরের আলো
এইতো ভালো আঁধার আমার ভালো!

বাঁশি তুমি বৃন্দাবনেই সেজো

রাধারাণীর রাখাল রাজাই সেজো

আর   চন্দ্রাবলীর কুঞ্জকুসুম হোক শুখিয়ে কালো। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৮৫)

eË¨vbcvm

বৃত্ত্যানুপ্রাস এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলেও যে-কোনো অনুপ্রাসকেই বৃত্ত্যনুপ্রাস বলা যায়। কারণ ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তি বা পুনরাবৃত্তি ছাড়া অনুপ্রাস সৃষ্টি হয় না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে বৃত্ত্যনুপ্রাসের ব্যবহার থাকলেও আমরা লক্ষ করব, তাঁদের গানের বাণীর ভাষা অনুপ্রাস-প্রবণতাকে খুব বেশি প্রশ্রয় দেয় নি, যা কেবল ধ্বনির অনুরণন হিসেবেই কথাকে আবৃত করেছে। তাই তাঁদের গীতবাণীপাঠে অনুপ্রাসের অনুরণন আলাদাভাবে অনুভূত হয় না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত বৃত্ত্যনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বৃত্ত্যানুপ্রাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে আমরা লক্ষ করি, তাঁর গীতবাণীর খুব সহজ ও সাধারণ ভাবও অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। গীতবাণীতে সুরসংযোজনের ফলে যেমন শ্রোতার চিত্তে অনুরণন সঞ্চারিত হয় তেমনি তা পাঠ করেও পাঠক সার্থক কবিতার রসাস্বাদন করতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

ক. প্রেমের শপথ যে কথা লিখিল মরমের শতদলে

তাই দিয়ে যেন এই মালাখানি পরাই তোমারই গলে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪)

খ. মোর অশ্রুসাগর কিনারে রয়েছে বেদনার এই খেয়া (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭০)

গ. রিনিকি ঝিনিকি বাজে বাজুক কাঁকন (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭২)

ঘ. এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৬)

ঙ. প্রাণে যদি এ গানের রেশ রয় (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১২)

উপরের উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার অনুপ্রাস-প্রয়োগের কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। গৌরী কেবল ধ্বনিগত চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুপ্রাসের স্মরণ নেন নি, উপরের দৃষ্টান্তসমূহের অনুপ্রাসমালায় ধ্বনিমাধুর্য ও ধ্বনিতরঙ্গে যে সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিস্ময়করভাবে গীতবাণীর বক্তব্যে ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। উদ্ধৃতি ক-এ 'ম' ধ্বনি তিনবার, 'র' তিনবার এবং 'ল' দু'বার ধ্বনিত হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে আমরা লক্ষ করছি, 'র' 'ল' এবং 'ন' ধ্বনি দু'বার করে উচ্চারিত হয়েছে। সহজেই অনুমেয়, এই পঙ্ক্তিদ্বয়ে একাধিক ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাসে বিস্ময়কর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি

Dhaka University Institutional Repository

খ-এ ‘র’ পাঁচবার এবং ‘ন’ দু’বার ধ্বনিত হয়েছে। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে ‘ক’ পাঁচবার এবং ‘ন’ এসেছে তিনবার। এই ধ্বনিদ্বয়ের অনুপ্রাস পুরো পঙ্‌ক্তিকেই প্রগাঢ়তা দিয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এ ‘ল’ এবং ‘ম’ এবং ‘জ’ দু’বার উচ্চারিত হয়েছে। উদ্ধৃতি ঙ-এর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ‘ন’ দু’বার এবং ‘র’ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা লক্ষ করছি, পাঠক/শ্রোতার কানে ধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলে সাঙ্গীতিক আবহ সৃষ্টি হচ্ছে এবং অধিকতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মাধ্যমে ভাবকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করছে। এভাবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে অনুপ্রাসপ্রয়োগের মাধ্যমে কবির উচ্চারিত কথামালা গভীরতর ভাব ও অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

cjK e‡›`¨vcva¨vq

বৃত্ত্যনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। তিনি এই অনুপ্রাসের ব্যবহারে খুব সহজ ও সাধারণ ভাবকেও অসাধারণ অভিব্যক্তির ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ধ্বনির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রচল শব্দকে বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তিনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

> ক. এ যে আমার চোখের তারা আমার দেহের প্রাণ! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬২)
>
> খ. চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭১)
>
> গ. আমারই প্রেমের মধুর মুরতি বরিণু আমারই এই মালায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭৪)
>
> ঘ. উলু ছিল শঙ্খ ছিল ছিল হাসি গান কানায় কানায় ভরা ছিল আনন্দেরই বান (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৪)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রাস-প্রয়োগের কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। গৌরী কেবল ধ্বনিগত চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুপ্রাসের স্মরণ নেন নি, উপরের দৃষ্টান্তসমূহের অনুপ্রাসমালায় ধ্বনিমাধুর্য ও ধ্বনিতরঙ্গে যে সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিস্ময়করভাবে গীতবাণীর বক্তব্যে ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। উদ্ধৃতি ক-এ ‘ম’ দু’বার, ‘ন’ বার, ‘র’ পাঁচবার ধ্বনিত হয়েছে। একাধিক ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাসে সমগ্র বাক্যটি বিস্ময়কর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি খ-এ ‘চ’ তিনবার এবং ‘ল’ তিনবার ধ্বনিত হয়েছে। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে ‘ম’ এবং ‘র’ এসেছে ছয়বার। এই ধ্বনিদ্বয়ের অনুপ্রাস পুরো পঙ্‌ক্তিকেই প্রগাঢ়তা দিয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ‘ছ’ এবং ‘ন’ এবং ‘ল’ পাঁচবার ‘র’ দু’বার এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রাসপ্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর গীতবাণীকে গভীরতর ভাব ও অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

†QKvbcvm

ছেকানুপ্রাসের প্রধান প্রবণতা হলো এই অনুপ্রাসে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ছেকানুপ্রাসের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. আমরা বয়ে চলা নদী চঞ্চল মেলি তরঙ্গ অঞ্চল (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১২৭)

খ. অবহেলা পেয়ে আমি আঁখিজলে সিক্তঅসহায় এই আমি কত যেন রিক্ত (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৫৭)

গ. তুমি যে আমার অন্তর্যামী সুন্দর আনন্দ ওগো (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৬)

ঘ. ছন্দ ভরা গন্ধ ধরা এ এক নতুন বেলা– (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৭৯)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

ক. ছন্দে ছন্দে রঙ্গে রঙ্গে অন্তর মরে লাজে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৮)

খ. আজ মালা চন্দনে মধু অভিনন্দনে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪০)

গ. ও তার অঙ্গ ভঙ্গিমায় বাতাস ছন্দ রেখেছে। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬২)

ঘ. আর একটা দুষ্ট ছেলে নামটি যে তার সুমন্ত ওরা ভারী দুরন্ত! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭২)

ঙ. কে অভিসারিণী হরিণী ভঙ্গে খুশি তরঙ্গে চলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্তভাবে ক্রমানুসারে ধ্বনিত হয়েছে। ফলে পুরো পঙ্ক্তিটি সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এভাবেই ছেকানুপ্রাস কবিতা বা গীতবাণীকে পাঠক/শ্রোতার কানে ও প্রাণে অনুরণন সৃষ্টি করে।

kæZ¨bcvm

বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে শ্রুত্যনুপ্রাস ঘটে থাকে। বলা হয়ে থাকে, শ্রুত্যনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসেরই সহকারীরূপে কাজ করে।। এই অনুপ্রাসে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারটি ধ্বনি সদৃশ ধ্বনি হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এমনকি প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ণেরও মিল হতে পারে। 'র' কম্পনজাত এবং 'ড়' তাড়নজাত ধ্বনি হলেও উচ্চারণ সাদৃশ্যের কারণে শ্রুত্যনুপ্রাস হয় (নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৫৪)। এবার আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে শ্রুত্যনুপ্রাস ব্যবহারের ধরনধারণ অনুধাবনের চেষ্টা করবো।

†MŠixcmb gRg‘vi

ক.ক খ : নেমে ছিল গঙ্গা নদী মহাদেবের জটা থেকে

দুঃখ পেলাম কলের জলে হেথায় তাকে বন্দী রেখে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৪৭)

খ. চ ছ : আধার হয়ে বুকের নীচে

ইচ্ছেটাকে বাঁচাই মিছে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১)

গ. ছ চ : সুখ-দুঃখে থাকি তবুও তো আছি

তোমার পায়ের ধূলি নিয়ে যেন বাঁচি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০)

ঘ. ঝ জ : আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাবিতেছ গগন মাঝে

মম সরসীতে তব উজল প্রভা বিস্মিত রাঙা লাজে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৩)

ঙ. দ ধ : খুলিয়া কুসুম আজ শ্রীমতি যে কাঁদে

অলখে রহিয়া কাণু ফুলরেণু সাধে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩)

চ. থ ত : এমন করে বেঁচে থাকার নেইতো কোন অর্থ

বুঝলাম না বাঁচতে হলে বাঁচার কি যে শর্ত (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৪১)

ছ. ত থ : মনে পড়ে যায় সে প্রথম দেখার স্মৃতি

মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি– (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৪)

জ. র ড় : একে একে ঐ ডুবে গেল তারা

তবু তুমি ওগো দিলে না তো সাড়া (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮)

cjK e‡›'¨vcva¨vq

ক. খ ক : হঠাৎ খুশির এই রঙিন পাখি

হাওয়ায় লেখে তার ডাকাডাকি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭)

খ. ঝ জ : আমি অবিশ্বাসী এই পৃথিবীর বুকের কাঝে

শুনতে পেলাম অঙ্গীকারের কী সুর বাজে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯৭)

গ. ধ দ : সেই অপরাধে আমি অপরাধী

এবার একলা আমি কাঁদি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮)

ঘ. থ ত : আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো আমি হারিয়ে যাবো তোমার সাথে

সেই অঙ্গীকারের রাখি পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪১)

ঙ. ড় র : ডেকেছি কে আগে কে দিয়েছে সাড়া

কার অনুরাগে কে গো দিশেহারা (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২)

চ. ট ঠ : শিশমহলে রোশনি জ্বলে রংবাহারী ফুল ফোটে

দিলদরদী দিলরুবাতে খুশ খোয়াবের সুর ওঠে ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯)

ছ. ভ ব : যদি অবুঝ হও গো তুমি কভু

আমি কীভাবে এগিয়ে যাবো তবু (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮০)

> অনুপ্রাসের মাধ্যমে কবিতায় কিংবা গীতবাণীতে সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। গীতবাণীর ভাষায় পাঠকের রসানুভূতি জাগানোর মূল শক্তিই বোধকরি এই সঙ্গীতময়তা। এই শক্তির উদ্বোধন অলঙ্কার প্রয়োগে সম্ভব হয়ে ওঠে। যে কোন শিল্পস্রষ্টার ভাবনাই ভাষায় ধরা দিলে তা সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা লাভ করে। ফরাসি কবি মালার্মে এবং ভালেরি কবিতায় সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড়। (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩২০)

এ প্রসঙ্গে স্তেফান মালার্মের মন্তব্যের শরণ নেয়া যাক –

> ...সঙ্গীত ও সাহিত্য হচ্ছে সেই একক, সনাতন বস্তুর প্রতিমান রূপ যাকে আমি বলেছি ভাব বা আইডিয়া। এই মিলিত রূপটি আপন সচলতায় কখনো বিলিন হয় অন্ধকারের বুকে, কখনো বা প্রোজ্জ্বল হয় অপরাজিতের মতো। এদের [সাহিত্য ও সঙ্গীত] একটি অপরটির দিকে প্রত্যাশায় নুয়ে পড়ে, অপরটির অন্তরে ডুব দিয়ে গহীন অতলে ছড়ানো মুক্তো আহরণ ক'রে ফিরে আসার জন্যে। আর এভাবেই সমগ্র বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। (স্তেফান মালার্মে ১৯৮৪ : ২৫)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর ভাষায় যে সঙ্গীতের ব্যঅনুভূত হয় তাতে অনুপ্রাসের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। অনুপ্রাসের আলোচনায় উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিসমূহেও আমরা সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গের দোলা অনুভব করেছি।

Dcgv

গীতবাণীর প্রকরণ-কাঠামো বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে উপমা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রকৃত অর্থে উপমার ব্যবহারে গীতবাণীতে ব্যবহৃত ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'কাব্যে শব্দ বা বাক্য একটি বিশেষ সংহতি এবং ধ্বনিবৃত্তির সাহায্যে বক্তব্যকে মুক্ত করে। যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উপমা একটি আশ্চর্য কৌশল।' (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৯ : ৬৪)। কোন কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় উপমার অভিনবত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। উপমা কেবল কবির বিমূর্ত ভাবনাকেই প্রকাশ করে না, এই প্রকাশ-প্রবণতার মধ্যে ধরা পড়ে তাঁর দূরদর্শিতা। উপমার ব্যবহারে কবিভাবনা বিস্তৃত হয়, পাঠকের চিন্তাকে সহায়তার মানসেই উপমার প্রয়োগ ঘটে বলেই কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত অর্থে

উপমা রোমান্টিক কবিকল্পনার অনুসন্ধিৎসাকে আপাত বিসদৃশ বস্তুরাশির মধ্যে ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> রোমান্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী; আবিষ্কারপ্রবণ; বিশ্বের আপাতবিদৃশ্য বস্তুরাশি – আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হ'য়ে থাকে – তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৯৯ : ৫২)

পরস্পর সম্পর্কহীন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে কবিতায় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়। 'আবেগের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কবি আবিষ্কার করেন আপাত দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও সুসামঞ্জস্য। এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের পুনরাবিষ্কারই কবিতায় উপমারূপে রূপায়িত হয়' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩২৪)। কবির অনুসন্ধিৎসা সূদূর এবং অপরিচয়ের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে তোলে যা কেবল ইঙ্গিতময়ই নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও বটে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে কাব্যলেখা বোধহয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৪ : ৩৯৩-৩৯৪)।

প্রকৃত অর্থে উপমেয় ও উপমানের রহস্যময় গোপন ইঙ্গিতের অভিঘাত পাঠকের চিন্তা-কল্পনা-স্বপ্ন-স্মৃতিকে প্রণোদিত করে, যদিও তা কবির বস্তুগত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই সংগৃহীত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা বিষয়ের মধ্যে উপমা সৃষ্টি করে অপ্রকাশিত এবং অপ্রত্যাশিত অভিঘাত। উপমার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিবিড় হলেও কেবল উপমার অভিনবত্বই কবিতার শিল্পসফলতার জন্যে যথেষ্ট নয়, কবিকল্পনার সামগ্রিকতাকে প্রকাশসম্ভব করে তোলার জন্যেও এর অবদান স্বীকার করতেই হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত উপমার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের জন্য আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে চাই।

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে জেগে থাকি

আর আমারই মত জাগে নীড়ে দুটি পাখি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮)

খ. ঝিরি ঝিরি বাতাস এলো ঝরা পাতার বনে

স্রোতের মতন স্বপ্ন এলো মনে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২১)

গ. এ আঁধারে আমি নিজের সাথে কথা বলি

ধূপের মতো সবটুকু দিয়ে নিঃশেষ হয়ে জ্বলি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৬)

ঘ. আমি কস্তুরী সে মৃগের মতন

নিজের গন্ধে নিজেই ভুলি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৫)

ঙ. প্রজাপতির মতন সে যে পুড়ে পুড়ে মরে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৫)

চ. ঝড়ের আঘাতে মোর প্রেম জানে ফুলের মতন ঝরিতে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬৩)

ছ. অলির কথা শুনে বকুল হাসে

কই তাহার মত তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭৯)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

ক. কেন দিনের আলোর মত সহজ হয়ে   এলে আমার গহন রাতে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২)

খ. মাগো তোমার কোলে শুয়ে শুয়ে   শিশুর মতো হাসি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩০)

গ. আমার আকাশ কাঙাল করে গো   পাঠিয়েছি মেঘ যত

তোমার কুঞ্জ বীথিকার ফুল   ফোটাতে মনের মত (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৫)

ঘ. ছোট্ট ভাই ছোট্ট থাকে   হোক না বড়ো যতো

স্নেহের ছায়া দেয় যে দিদি   বড়ো গাছের মতো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৬১)

ঙ. যে সুন্দর চাঁদের মতো

তার ধার করা জ্যোছনার কী প্রয়োজন? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৪)

চ. কতো যে সাগর নদী   পেরিয়ে এলাম আমি

কতো পথ   হলাম যে পার

তোমার মতন এ্যাতো   অপরূপ সুন্দর

কাউকে তো দিখিনি গো আর (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৯৪)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীতবাণীর উপমার শক্তি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। কবিতায় উপমাকে যতোটা জটিল এবং বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, সঙ্গত কারণেই গীতবাণীতে তা সম্ভব নয়। কারণ একজন গীতিকার তাঁর সৃষ্টির পরিপূর্ণতা দিতে

সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীর ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে গীতবাণীর ভাষা সরল সাবলীল এবং বোধ্যগম্য হতে হয়। উপমাও একই কারণে সরল অভিব্যক্তিকে রূপায়িত করে। তাই আমরা উদ্ধৃতিসমূহের স্বতন্ত্র্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না-করে কেবল উপমা-আশ্রিত পঙ্ক্তিসমূহে এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

Dr‡c¶v

একজন কবি বা গীতিকারের সৃজনপ্রতিভার প্রকৃতি অনুধাবনে উৎপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উৎপ্রেক্ষা শব্দটির অর্থ উৎকট জ্ঞান। কল্পনা বা মিথ্যা হলেও শক্তিশালী কবির নৈপুণ্যে এই অলঙ্কার পাঠকের রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্যের স্মরণ নেয়া যেতে পারে :

> শিল্পী যেমন তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধকে বস্তুরূপে প্রত্যয়যোগ্য করেন, কবিও তেমনি চিত্তের অনুভূতির নিগূঢ়তাকে উৎপ্রেক্ষারূপে প্রকাশমান করেন। (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৯ : ৬৪)

কবিতার অনুরাগী পাঠকমাত্রই জানেন, কবি উৎপ্রেক্ষায় যে সংশয়ের প্রকাশ ঘটান, তা অনেকাংশেই নিঃসংশয়ের আবহ বা আবেদন সৃষ্টি করে। কবি অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ হলে উৎপ্রেক্ষাও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞানের স্পর্শে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অলঙ্কার সৃজনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের গীতবাণী থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে :

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. আমরা যেন প্রদীপ শিখা   নিয়তি যে ধরে গো ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১)

খ. নতুন করে তাই যেন গো আজ   নিজেরে পাই গো পাই

প্রাণে আমার পরশ ছোঁয়ায়–   কিছু পাওয়ার শুভক্ষণ ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৪)

গ. সবাই যেন গো জেনে গেছে মনে মনে

কেহ নাই মোর কিছু নাই তুমি ছাড়া ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩২)

ঘ. তোমার আমার এইটুকু পরিচয় এরই মাঝে যেন কত কিছু জেগে রয়

যেথায় হারায় ভীরু অধরের ভাষা মনের বাঁশরী সেথায় তোলে যে সাড়া ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩২)

ঙ. রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই

শ্যাম সোহাগিনী চির অনুরাগিনী

ভাসে রাধা আঁখি ধারে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৭)

চ. এ লগনে তুমি আমি একই সুওে   মিশে যেতে চাই।

প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই। এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২:৫৪)

ছ. রাত জাগা দুটি চোখ যেন দুটি কবিতা (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০৭)

Dhaka University Institutional Repository

cjK e‡›`¨vcva¨vq

ক. যেন মনে লাগে দোলা সেই

দোলা লাগে বিনা কারণেই (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭)

খ. নতুন নতুন রঙ ধরেছে সোনার পৃথিবীতে

যেন ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে নীল আকাশের গায়

আমায় দেখতে দাও আমায় দেখতে দাও! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০)

গ. নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা

বুঝিবা পথ ভুলে যায়

কুলায় যেতে যেতে কী যেন কাকলী

আমারে দিয়ে যেতে চায়! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯১)

ঘ. কে যেন বলে গো আমায় আজ পৃথিবীতে নাই ব্যথা নাই

সে শুধু তুমি ওগো এ তো কাছে আছো তাই। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৩)

ঙ. কে যেন বলে গো আমায় আজ পৃথিবীতে নাই ব্যথা নাই

সে শুধু তুমি ওগো এ তো কাছে আছো তাই। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৬)

চ. দোকানে যখন আসি সাজবো বলে খোপাঁটা বেঁধে নিই ঠাণ্ডা হাওয়ায়

আর্সিতে যখন এই চোখ পড়ে যায়

মনে হয় বাবা যেন বলছে আমায় আয় খুকু আয়!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪২)

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, একজন কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার অন্যতম অভিজ্ঞান হলো উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের কুশলতা। উৎপ্রেক্ষায় কবির গভীরতম উপলব্ধির নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে শিল্পসম্মত উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে তাঁদের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার যুগল আলোক প্রক্ষেপে তাঁদের গীতবাণীর শরীরই কেবল উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, কবিকল্পনার হৃৎপিণ্ডেও তা অভিনব ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

i/cK

রূপকের আশ্রয়ে একজন কবি বা গীতিকার কবিতার কিংবা গীতবাণীর রূপ বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন। শব্দপ্রয়োগে কবির সংযত-সংহত প্রকাশ চরম হলেই রূপকের সৃষ্টি হয়। রূপকে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোন ভেদ বা ব্যবধান স্বীকার করা হয় না। হার্বার্ড রীড রূপকের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে –

> We might define metaphor summarily as the discovery of an illuminating correspondence between two objects but that too is inadequate for the subtleties of the process. (Herbert Read 1950 : 98)

রীড এখানে রূপক-সৃজনের ক্ষমতা এবং রূপকের মৌলিকত্বের আলোকে কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে রূপকের সাহায্যেই ভাষার ওপর কবির দখল অনুধাবন করা যায়। এ-প্রসঙ্গে আরো একজন সমালোচকের মন্তব্যের শরণ নেয়া যাক :

> প্রকাশকলায় নৈপুণ্য অর্জন করতে হ'লে প্রথাবদ্ধ ভাষা-প্রয়োগরীতি অতিক্রম করা-ছাড়া কবির বিকল্প নেই। আধুনিক কবির ভাষা-প্রয়োগরীতি প্রথাগত কাব্যভাষাকে বার-বার অতিক্রম ক'রে যায়। প্রচলিত প্রকাশপদ্ধতি ও কাব্যভাষা অতিক্রম করতে গিয়ে কবি কখনো নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন, কখনো কাব্যে প্রচলিত শব্দের নতুন প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করেন, কখনো কবিতার ভাষাকে করেন রূপকাশ্রিত। (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৩৮)

ফলে কোন শিল্পস্রষ্টার ভাষা-ব্যবহারের কৃতিত্ব অনেকাংশেই তাঁর রূপক-রচনার কৌশলের ওপর নির্ভর করে। রূপক কেবল একজন স্রষ্টার বক্তব্যকে সুসংবদ্ধই করে না, তাতে যোগ করে স্ফটিকসংহতি। এই সংহত শব্দবন্ধই পুরো কবিতায় বা গীতবাণীতে আলোক সঞ্চার করে থাকে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গীতবাণীর শব্দপ্রয়োগে বাহুল্যবর্জন করে আবেগকে এমন সংযতভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন মূলত রূপক সৃষ্টির বিস্ময়কর সাফল্যের কারণেই। তাঁদের গীতবাণীতে রূপক অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা লক্ষ করব, উপমেয় ও উপমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নিপুণ অস্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁরা রচনা করেছেন বিপুল-সংখ্যক শিল্পসফল পঙ্ক্তি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে –

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. অঙ্গের লাবণী হলো নয়নের জল   প্রেমের যমুনা কুল হয়েছে পিছল (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩)

খ. প্রদীপের স্বপ্ন হলো ঐ ভুল   নিভে যেতে চায় ধীরে ধীরে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৪)

গ. বাঁশি শুনে আজ কাজ নাই   সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬)

ঘ. পদ্মফোটা ঝিল রোদে শুধু ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি করে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯)

ঙ. তবু টলে না তো বজ্র কঠিন তোমার প্রাণ ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০)

চ. আমরা কাঁদি ওদের ক্ষেতে   হাসির ফসল ঝরে গো ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১)

ছ. ভ্রমর রাখাল পাখার বেণুতে   রচে একি আকুলতা (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৩)

জ. পথিক-পাখি যায় উড়ে যায়   কোন সে দূরে যায় গো যায় (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৪)

ঝ. হৃদয় বাঁশির ছায়ানটে যেন সকরুণ অবহেলা ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯)

ঞ. জীবনেরই প্রাণশালাতে উৎসবে প্রাণ মিশিয়ে নাও (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০)

ট. তুমি আমি রব না কেউ আয়ুর প্রদীপ হবেই ক্ষীণ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০)

ঠ. জ্বল জ্বল তারার প্রদীপ ঐ নিভে আসে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২১)

ড. প্রেমের শপথ যে কথা লিখিল মরমের শতদলে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪)

ঢ. অশ্রু মুকুলে মালাখানি মোর গাঁথি গো। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৭)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

K. সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১)

L. আমি রামের প্রেমের জীয়ন রসে সব কিছু কাজ সঁপে দিয়েছি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩)

গ. দরাজ বুকের মালা দিয়া মাতাল বাঁশি বাজায়রে ওই (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯)

ঘ. দেখি এক হরিণ শিশু কাঁপছে ভয়ে একা পথের দিশা হারিয়ে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬)

ঙ. যদি বন্দী আশারা দুঃসাহসী হতে চায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০)

চ. কৃষ্ণ-নামাবলী শুধু পরাও মোরে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩)

ছ. ভালোবাসার ভুবন গড়ে সুখী আমার এই বিধাতা (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭)

জ. গৌরী এ মন শিবের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন পেলো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৭)

ঝ. এর কাছে স্বর্গ-সুধার বেশি মূল্য কী আর (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৯)

ঞ. রেশমি চুড়ির আওয়াজ দিয়ে কত কথা যাও যে বলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫০)

ট. রিপুর খেলায় ভুলিয়ে ছিলি এবার খেলার ঘর ভেঙেছি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৪)

ঠ. সংকেত বাঁশি বাজার বেলা যে হয়ে এলো প্রায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৪)

ড. তাও যদি ঢাকে কালো মেঘে জ্বালাবে প্রেমের শিখা তবে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০১)

দৃষ্টান্তের তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক-ভাবনার বৈচিত্র্য অনুধাবনের জন্য এর বেশি উদ্ধৃতি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কবিতার ভাষাকে ভারমুক্ত করার জন্য শব্দ প্রয়োগে তাঁরা বিস্ময়কর মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কৃপণতার অভিযোগ থেকে তিনি মুক্ত; কারণ অজস্র রূপকের রন্ধ্রে রন্ধে তাঁরা তাঁদের ভাবকে বিস্তৃত করেছেন। তাঁদের গীতবাণীর ভাষা পাঠক-শ্রোতাকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে, কবিকল্পনার সঙ্গে নিজের মনকে বেঁধে নিয়ে পাঠক সৃষ্টির আনন্দ লাভ করে। গীতবাণীতে উপমা-প্রয়োগের অভিনবত্বই তাঁদের এই প্রকাশ-নৈপুণ্যের অন্যতম কারণ বলে আমরা মনে করি।

mgv‡mvw³

কবির কল্পনা-প্রতিভার জোরে নিষ্প্রাণ বস্তুতেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এই প্রাণ-সঞ্চারের কাজটি করতে গিয়েই কবিতা বা গীতবাণীতে সমাসোক্তির সৃষ্টি হয়। সমাসোক্তিতে বিষয় বা উপমেয়ের ওপর বিষয়ীর বা উপমানের ব্যবহার বা বৈশিষ্ট্য বা কোন বিশেষ প্রবণতা আরোপিত হয়। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> বর্ণনীয় চেতন, অচেতন, মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী যাই হোক না কেন, তার ওপরে অন্য যে-কোন বস্তুর স্বভাব আরোপ করলেই সমাসোক্তি অলঙ্কার হতে পারে' (নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৯৯)।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি, কবিতায় বা গীতবাণীতে অপ্রাণীর ওপর প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের সংবেদনা বা অনুভব আরোপ করেই সমাসোক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে সমাসোক্তির ব্যবহার শিল্পোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করে তাঁদের গীতবাণীকে বিশেষ মাত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তিকে গীতবাণীতে ধারণ করার প্রয়োজনে তাঁরা প্রভূত পরিমাণে সমাসোক্তি সৃষ্টি করেছেন। । তাঁদের বিপুলসংখ্যক গীতবাণী রয়েছে যার পুরোটাই সমাসোক্তি-নির্ভর। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী থেকে কয়েকটি সমাসোক্তির উদাহরণ বিবেচনা করা যাক :

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. কথা দিয়েছিলে আসিবে গো ফিরে
চাঁদ জাগে দূরে আকাশের তীরে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮)

খ. ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপভরা সম্ভাষণ
এই কি তবে বসন্তেরই নিমন্ত্রণ?
দখিন হাওয়া এ ঐ বন্ধু হয়ে তাই কি আজ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৪)

গ. আহা তাই এ বাঁশি খুজে পায় কি হাসি সুরে আজ পড়ে সে বাঁধা,
তবে ফাগুন কেন দেখেও আমায় কাছে টানে না (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৭)

ঘ. যে রাত ঘুমায় মনে হয় যেন
মরণেরই কালো বেশ। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৮)

ঙ. এ ব্যথা পারি না সহিতে এ তো জানে শুধু বহিতে
কেঁদে ফিরে যায় চাঁদ জাগা এই রাতি গো ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৭)

cjK e‡›‘¨vcva¨vq

ক. বাঁশি তুমি বৃন্দাবনেই বেজো
রাধারাণীর রাখাল রাজাই সেজো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৫)

খ. আকাশ জানে ঝরলো কোথায় তারার রূপাঞ্জলি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৮)

গ. সেদিন চাঁদের আলো চেয়েছিল জানতে
ওর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কি? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০০)

ঘ. ওগো আধো চাঁদ তুমি তো দেখলে চেয়ে গো মনে রেখো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৮)

ঙ. ই যে নীল আকাশ ও এখন শুধুই হাসে
ওর কী বা যায় আসে আমি যে চেনা দিয়েও রইগো অচেনা !! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৯)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী থেকে সংগৃহীত উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো বর্ণনামূলক এবং প্রত্যেকটি বর্ণনা সমাসোক্তির জোরেই যেন ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যার কাজটি সমাসোক্তি সহজেই স্বল্প শব্দ-সমন্বয়ে সম্পন্ন করে নিয়েছে। উদ্ধৃতিগুচ্ছে অচেতন ও বিমূর্ত বস্তু বা বিষয় যেমন সপ্রাণ ও দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে, তেমনি দৃশ্যমান জীবন্ত বস্তুকেও তা মানবীয় সংবেদনায় ঋদ্ধ করে তুলেছে।

Ab¨vm³

অন্যাসক্ত অলঙ্কারে জড় বস্তু বা কোন বিমূর্ত বিষয়ের ওপর সপ্রাণ বা চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ আরোপিত হয়। অর্থাৎ, চেতনের ক্রিয়ার পরিবর্তে এখানে কেবল বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে অন্যাসক্তের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। মূলত প্রত্যেক গীতিকবিই অন্যাসক্তের প্রয়োগ করে নিজের অনুভবের রঙে বস্তুকে সাজিয়ে তোলেন। প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের k¨vgjx কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতার শরণ নেয়া যেতে পারে–

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে –
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর' –
সুন্দর হলো সে।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬ : ১০/১৪৬)

কবি বস্তুর মধ্যে সপ্রাণ সচেতনের গুণাবলি আরোপ তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার সপ্রাণতা প্রমাণ করেন। সমাসোক্তির মতোই অন্যাসক্ত কবিতার বা গীতবাণীর পঙ্‌ক্তিকে সপ্রাণ-সজীব-প্রাণবন্ত করে তোলে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে প্রভূত পরিমাণে অন্যাসক্তের ব্যবহার লক্ষ করা যায় যা তাঁদের গীতবাণীকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তাঁদের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি অন্যাসক্ত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

†MŠixcmb gRg‘vi

ক. বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬)

খ. চাঁদ জাগে দূরে আকাশের তীরে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮)

গ. আমি স্বপ্নভরা কাজলে যদি মধুর নাহি হতাম (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৫)

ঘ. তোমাদেরই হাতে ঢেলেছে যে সেই ব্যথাভরা আঁখিজল (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৮)

ঙ. বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি নিবিড় নিশিথে যবে জ্বলবে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩০)

চ. মম সরসীতে তব উজল প্রভা বিস্মিত রাঙা লাজে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৩)

ছ. ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৮)

জ. কোন উতলা মাধবী রাতে স্মৃতি যদি ব্যথা আনে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬০)

ঝ. আমি প্রলয়ের বাঁশি আমি মেঘের অট্টহাসি (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬৩)

ঞ. গরবী করবী ঐ ফুটেছে দেখ। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭২)

cjK e‡›‘¨vcva¨vq

ক. ওই যে ঘুম পাহাড় জেগে বেশ ঘুমিয়ে দেখে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৯)

খ. আর সোহাগের নদী ভেঙে যাবে তার কূল (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১০)

গ. ঘুমন্ত ফুলেদের জাগিয়ে তুলে সাত রঙে রঙ করি পাপড়ি খুলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৭)

ঘ. দুরন্ত অস্থির আবেগে একটু খুশির খেলা খেলি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২১)

ঙ. গ্রীষ্মের খরতাপে সারাঘরে মিষ্টিকথার বৃষ্টি নাচে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৫)

চ. একরাশ সবুজ খুশি দেখেই গেলাম চোখের চাওয়ায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬)

ছ. ক্লান্ত প্রদীপ ওগো হঠাৎ আলোয় ফুটো না (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৭)

জ. উচ্ছল যৌবন কলতানে প্রেম আসে প্রতিদিন এই প্রাণে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৮)

ঝ. তবু নির্ভাবনার শান্তিকে ছেড়ে অশান্তি নিতে এলাম। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪০)

ঞ. সোহাগের বসুধা এমন গরল হবে বুঝি নি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪৭)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত অলঙ্কার কোন রকম অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় না দিয়ে তা গীতিকবির ভাবকে পাঠক ও শ্রোতার বোধের সীমায় পৌঁছে দেয়। গীতবাণীর ভাষায় অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁরা পরিচিত শব্দের শরীরে জুড়ে দেন অনাস্বাদিত দীপ্তি, যা অনায়াসে আমাদের আলোড়িত করে, পরিতৃপ্ত করে। তাঁদের অভিজ্ঞতার জগৎ অন্তর্ভূমির গাঢ় চেতনার স্পর্শে অভিষিক্ত হয়ে তাঁদের কাব্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। অলঙ্কারের সাহায্যে তাঁরা গীতবাণীতে অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতের উদ্ভাসন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন বলেই অলঙ্কার প্রয়োগে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য।

Z_¨wb‡‘k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড (সম্পাদক : শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

২. জমিল শরাফী (সম্পাদক), ১৯৭৫, mfvl g‡Lvcva¨v‡qi Kve¨ msKjb, প্রথম বাংলাদেশী সংস্করণ, লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯

৪. প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮, ceÜmsMn, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৫. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৯, Kwj ‘v‡mi †gN‘Z, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৬. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, ex‡‘e emi KweZv : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশীদ, ১৯৮৪, wZbwU divmx ceÜ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৪, Rxeb¯§wZ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

১০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৬৩, Dcgv Kwj ‘vmm¨, নব সংস্করণ, কলকাতা।

১১. সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৯, KweZvi iƒcKí, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১২. স্তেফান মালার্মে, mwnZ¨ I m½xZ (অনুবাদক : হারুণ-উর রশিদ : তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

১৩. Herbert Read, 1950, *Collected Essays in Literary Criticism*, second edition, Reprinted, MCMLiv and MCMLxii, Faber & Faber Ltd. London.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

wPÎKí

চতুর্থ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

WPÎKí

চিত্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে একজন কবি তাঁর অন্তর্গত সৌন্দর্য তথা শিল্পসত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক তৈরির প্রয়াস পান। চিত্রকল্প পাঠকের চৈতন্যে যে চিত্র বা চিত্রাণুভবের আভাস রচনা করে, কেবল দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলেই তা অধ্যয়ন বা অনুভব করে আমরা একজন সৃজনশীল মানুষের দৃষ্টির দিগন্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাই। কবিতার মর্মে প্রবেশ করে কবির অনুভব-আবেগ-অভিজ্ঞতাকে আস্বাদনের আনন্দ এনে দেয় চিত্রকল্প। শব্দই কবির চৈতন্যের নানা প্রান্তকে প্রাণবন্ত করে তোলে। একজন কবি শব্দের সন্নিবেশে নতুনত্ব এনে, তাঁর বোধের বর্ণিল প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হলেই তিনি পাঠকের চিন্তাকে উদ্দীপিত করতে পারেন। কবির প্রকরণ-কৌশল পরিচিত শব্দের ভেতর দিয়ে যে মানস-প্রতিবিম্ব নির্মাণ করে, তার প্রগাঢ় অনুভব পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকেও আলোড়িত করে। কবি-প্রাণের উষ্ণতায় তাঁর শব্দ-প্রতিমা সজীব হয়ে ওঠে। কবির অভিজ্ঞতার শৈল্পিক সংহতি অপূর্ব দীপ্তি লাভ করলে তা অন্যের আনন্দেও যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা। চিত্রকল্প কবির উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে কবিতার হৃদ্‌স্পন্দনে পাঠককে জাগ্রত করে। কবিকল্পনার সঙ্গে পাঠকের অনুভূতির যোগেই চিত্রকল্প সার্থকতা লাভ করে। কবির সৃষ্টি এখানে পাঠকের দৃষ্টিকেই কেবল সচকিত করে না, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কাছে তা বার্তা প্রেরণ করে। এই বার্তায় ভর করেই কবির আত্মার সঙ্গে পাঠকের একাত্ম হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

চিত্রকল্পে আমরা কেবল চিত্রেরই অন্বেষণ করি না, সেই চিত্রের স্রষ্টার চিত্তকেও অনুধাবন করতে চাই। এই অনুধাবনের প্রয়াস থেকেই স্রষ্টার অনন্যতা চিহ্নিত হয়ে যায়। কবিতা কিংবা গীতবাণীতে বিম্বিত চিত্রকল্পে কবির জীবনদর্শন শৈল্পিক ঋদ্ধি লাভ করে। তাই কবিতার সজীবতা বা সপ্রাণতা চিত্রকল্পে প্রতিফলিত হয় উল্লেখ করে Stephen J. Brown বলেছেন, `This must surely be obvious as regards poetry : imagery is its very life.' (1927 : 7). সি. ডি. লুইস বলেছেন, ‘What the moderns look for in imagery, I suggest, is freshness, intensity, and evocative power’ (C. Day Lewis 1968 : 40). চিত্রকল্পে কবির তাৎক্ষণিক আবেগ মেধার স্পর্শেই অন্য মাত্রা লাভ করে বলে এজরা পাউন্ড উল্লেখ করেছেন। "A Few Don'ts by an Imagiste" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “An ‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. (Ezra Pound 1976 : 18). স্টিফেন স্পেন্ডারের বিবেচনায় চিত্রকল্পই কবিতার মূল উপাদান, ‘The image is the basic unit of poetry...’ (Stephen Spender 1965 : 120)। চিত্রকল্প শব্দনির্মিত চিত্রের মধ্যেই তার অর্থকে

সীমাবদ্ধ রাখে না, পাঠকের চেতনার রঙ তাতে যুক্ত করে অধিকতর ব্যঞ্জনা। দৃশ্যমান ছবির সঙ্গে মনের ছবি যুক্ত হয়ে তা অর্জন করে তৃতীয় মাত্রা। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য :

> মানুষ তো শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটা দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ, একথা মানা চলিবে না। চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।' (১৩৮৯ : ১২৩)

কবিতা কিংবা গীতবাণীর পাঠক হিসেবে আমরা জানি, চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতাকে অনুধাবনের বিচিত্র পথে পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম।' (১৯৮৪ : ৯)। কবিতার রহস্যময়তা ও জটিল স্বপ্নময়তার পাঠ নির্ণয় করে চিত্রকল্প। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে–

> ...একটি শব্দ বা চিত্রকল্প তখনই, 'প্রতীকী' হয়, যখন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এমন কিছু, যা তার স্পষ্ট, প্রকট, তাৎক্ষণিক অর্থের চেয়েও আরো কিছু বেশি (কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ ১৪০৬ : ৩–৪)

চিত্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে একজন স্রষ্টা মানব-অনুভূতির নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করেন। চিত্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচকের মতামতের ভিত্তিতে একজন গবেষক চিত্রকল্পের মৌল প্রবণতাকে নিম্নরূপে সূত্রাবদ্ধ করেছেন–

ক. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দচিত্র বা উপমানচিত্রকে চিত্রকল্পে উন্নীত হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়, তা হলো – উপমানচিত্রটিকে হতে হবে–

(১) সজীব বা প্রাণময়

(২) প্রগাঢ় অনুভবযুক্ত ও

(৩) মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

এই তিনটি শর্ত যখন একটি উপমানচিত্রে রূপায়িত হয় তখনই রচিত হয় পরিপূর্ণ চিত্রকল্প।

খ. চিত্রকল্পে কবি-মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অংশে লুকিয়ে থাকা অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ঘটে।

গ. কবির দার্শনিক অভিপ্রায়কে চিত্রকল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। (সরকার আমিন ২০০৬ : ১৩)

ঘ. উপরিউক্ত প্রবণতার আলোকে চিত্রকল্পের শক্তি, সৌন্দর্য ও ঋদ্ধি অনুধাবন করা সম্ভব। এই শিল্প-প্রকরণের প্রকৃতি ও প্রবণতা বিবেচনায় রেখে বলা যায়, চিত্রকল্পই কবির কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ, যেখানে সম্ভাবনার প্রায় সবটুকুই সম্ভব হয়ে উঠতে চায়।

চিত্রকল্পের ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুধাবনের প্রয়োজনে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ইংল্যান্ডের চিত্রকল্পবাদী কাব্য-আন্দোলনের দিকে। এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯১২-১৯১৭) ইংল্যান্ডে এই কাব্যান্দোলনের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে উইন্ডহ্যাম লুইস, এমি লাউয়েল ও হ্যারিয়েট মনরোর সমর্থনে তা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে হিলডা ডোলিটন, ডি. এইচ. লরেন্স, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, জন গোল্ড ফ্লেচার এবং রিচার্ড এলডিংটন এই কাব্যান্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিরিশের কবিরা ইউরোপীয় কাব্যান্দোলনের নানা প্রকরণ-প্রকৌশলে বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধ করলেও চিত্রকল্পবাদীদের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের কবিতায় চিত্রকল্প সৃজনের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা গেলেও তাতে কবিচৈতন্যের যে পরিচয় বিধৃত, তা স্বকীয় শিল্পভাবনায় ঋদ্ধ। বাংলা কবিতা কিংবা গীতবাণীর চিত্রকল্প অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের শরণ নিলেও আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রয়াসকে তাঁদের আত্মকৃত অভিপ্রায়ের স্মারক হিসেবেই বিবেচনার চেষ্টা করব।

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণী কখনো বক্তব্য-নির্ভরতায় নির্মিত হয়েছে, আবার কখনো-বা চিত্রনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। জীবনসম্পৃক্ত যে শিল্পাদর্শকে তিনি ধারণ করেছেন, তাঁর চিত্রকল্প সেই শিল্পসত্যকেই মূর্ত করে তুলেছে। তাঁর শব্দকল্প কোন জটিলতা ও অস্পষ্টতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, সেখানে সহজ-স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই নির্মিত হয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। কারণ চিত্রকল্পে মসৃণ ও সমাজবীক্ষার তীব্র অভীপ্সা বস্তুর বাস্তবরূপের ভেতর রহস্যময় ভিন্নরূপের সন্ধান দেয় – যেন চিরচেনা জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্যজগৎ। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় বিপর্যস্ত মানবমনের নানা প্রান্তে আলোক প্রক্ষেপণের প্রয়োজনেই কবিতা কিংবা গীতবাণীর অন্তর্ভূমিতে কবি বাস্তব ও স্বপ্নের আলো-আঁধারিকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। ফলে আধুনিক কবিতায় মানুষের মগ্নচেতনার অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যয় এবং সামূহিক নির্জ্ঞান মিথ আকারে চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে (বার্ণিক রায় ১৩৩৮ : ৩৪)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর মিথিক আবহে নির্মিত নতুন বাস্তবতাও পাঠককে আলোর দিকে আহক্ষান করে। তাঁর গীতবাণীর চিত্রকল্প হিসেবে অন্ধকারের অবস্থিতি যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি কবির উত্তরণ-অন্বেষায় অন্ধকারের বিপরীত প্রান্ত অর্থাৎ আলোর উৎসারণও কম নয়।

চিত্রকল্প-সৃজনে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মনোযোগ তাঁর গীতবাণীতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের গীতবাণীর চেয়ে পরবর্তী পর্যায়ে রচিত গীতবাণীতে চিত্রকল্প অধিকতর প্রগাঢ়তা লাভ করেছে। তাঁর ব্যঞ্জনাধর্মী গীতবাণীর ভাষা পরিশীলনের মধ্য দিয়ে অন্তর্গত সত্তার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে ততই তা অর্জন করেছে চিত্রময়তা। গৌরীপ্রসন্নের ভাবনা বিচিত্র বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং তাঁর স্নেহজ শব্দ অনুভবের সততায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই উজ্জ্বলতা কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান হ্রাস

করেছে। দূরত্ব দূর করার এই প্রয়াস যখনই সংহত রূপ লাভ করেছে, তখনই সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব চিত্রকল্প।

চিত্রকল্প-বিষয়ক আলোচনায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর অনুসরণে অগ্রসর হলে একই বিষয়ে একাধিক চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ করতে হয়, যাতে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই আমরা তাঁর গীতবাণীর উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পসমূহ অনুসন্ধান করে সেগুলোকে বিষয় ও মোটিফ অনুযায়ী সন্নিবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমরা লক্ষ করব, গৌরীপ্রসন্নের বাকপ্রতিমা তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে নি, বরং বিশ্বাসের উত্তাপ তাতে যুক্ত করেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। নিম্নোক্ত চিত্রকল্পসমূহে তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার বর্ণিল প্রান্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে –

মিনতি শুনে হায়

পাষাণও গলে যায়

তুমি তো দেখো না গো চেয়ে

বেদনা পেয়ে

আমরা কাঁদি ওদের ক্ষেতে

হাসির ফসল ঝরে গো ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১)

এই উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ করছি, কবি তাঁর মিনতি প্রকাশের আন্তরিকতা বোঝাতে মিনতির প্রগাঢ়তার সঙ্গে পাষাণের তুলনা করেছেন। এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা যেন কবির মিনতিকে আমাদের অন্তরে দ্রবীভূত হতে দেখি। পাষাণকে যেমন ছুঁয়ে দেখা যায়, তেমনি এই মিনতিও যেন পাঠকের স্পর্শের সীমায় চলে আসে। একই গীতবাণীতে তিনি তাঁর বেদনাকে ফসলের রূপকল্পে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির চোখের জল যখন কারো ক্ষেতের ফসল হয়ে ফলে, তখন সেই ফসলের ওপর বাতাসের ঢেউ খেলানোও দুঃখের ঢেউ হয়ে ওঠে। সেই ফসলে যখন রৌদ্র এসে পড়ে, সেই রৌদ্রও কবির বেদনাকে আরো দুর্বিষহ করে দেয়। এভাবেই কবির মিনতি ও চোখের জল পাঠকের একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাছে সজাগ-সচকিত হয়ে ওঠে, যা চিত্রকল্প হিসেবে অসাধারণ ব্যঞ্জনাসঞ্চারী।

ভ্রমর রাখাল পাখার বেণুতে

রচে একি আকুলতা,

তবু আরো ভালো লাগে এই দুটি কথা–

'তুমি আমি তুমি আমি'।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৩)

এই উদ্ধৃতিটিতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর আকুলতাকে ভ্রমরের পাখার শব্দের সঙ্গে তুলনা করে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। আকুলতা কেবল অনুভবের বিষয় হলেও ভ্রমরের গানের সঙ্গে এর তুলনায় আকুলতাও পাঠকের শ্রবণের সীমায় চলে আসে। এখানে আকুলতা কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কেই সক্রিয় করছে না, সেই সঙ্গে আকুলতার একটা বাহ্যিক অবয়বও যেন নির্মাণ করেছেন তিনি। এভাবেই একাধিক ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে আকুলতা প্রাণবন্ত চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে।

হাওয়ার মত এ প্রাণে আমার
সে শুধু সুর আনে
তারে হৃদয় জানে
এত কাছে থেকে তবুও সেকি
চিরদিনই দূরে রবে?
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গানের সুরকে হাওয়ার রূপকল্পে ধারণ করে সুরকে শ্রবণের সীমা থেকে অনুভবের একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুর হাওয়ায় ভর করেই মানুষের কানে প্রবেশ করে। এই সুর কানের ভেতর দিয়ে প্রাণকেও পল্লবিত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুর হাওয়ার মতো প্রকৃতির মধ্যে আন্দোলন তুলছে এবং সেই আন্দোলন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে– এই কল্পনায় কবির সৃজনপ্রতিভা চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে। সুরের এই সর্বত্রবিস্তারি শক্তিই কবিকে পৌঁছে দিচ্ছে অনুভবের অন্য দিগন্তে যেখানে প্রিয় মানুষকে কাছে পেয়েও মনে হয়, সে যেন অনেক দূরের একজন মানুষ। হাওয়ার মতো হয়ে ওঠা সুর এখানে চিত্রকল্প হিসেবে সার্থক।

তবে কিগো এই আঁধারের মাঝে
হবে আজ সব শেষ,
যে রাত ঘুমায় মনে হয় যেন
মরণেরই কালো বেশ।
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৮)

কবি এই গীতবাণীতে অন্তর্গত কষ্টকে অন্ধকারের রূপকল্পে নির্মাণ করেছেন। কবি যে কষ্টের কথা এই গানে তুলে ধরেছেন তা মৃত্যুযন্ত্রণার মতো নির্মম, ভয়াবহ। মৃত্যুযন্ত্রণা কেবলই অনুভবের ব্যাপার, কিছুতেই তা দৃষ্টির সীমায় ধরা দেয় না। কিন্তু কবি এই যন্ত্রণাকেও অন্ধকার রাতের আবহে নির্মাণ করেছেন যা দর্শণেন্দ্রিয়কেও সক্রিয় করে তোলে। রাতের অন্ধকারকে কবি যেখন মরণের কালো চুলের

সঙ্গে তুলনা করেন, তখন মৃত্যুদেবির চেহারাও ধরাছোঁয়ার সীমায় পৌঁছে যায়। এভাবেই কবির গভীরতর কষ্ট একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাছে বার্তা প্রেরণ করে, যা সফল চিত্রকল্পেরই উজ্জ্বল উদাহরণ।

শুধু দুটি ফোঁটা আঁখি জলে
একটি ভুলের মধুর কাহিনী
মুকুতার মত ঝলে ॥
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৬)

কবি এই গীতবাণীতে ভুলকে মুক্তার সঙ্গে তূলনা করে কেবল ভুলের মধুর দিকটিকেই তুলে ধরেন নি, সেইসঙ্গে ভুলের একটা অবয়বও নির্মাণ করেছেন যা চোখে দেখা যায়। এই ভুলকে কবি অভিনন্দিত করছেন, উপভোগ করছেন। কিন্তু পাঠকের চোখের সামনে ভুলটি যেন ঝলমলে পোশাক পরে দাঁড়িয়ে যায়, সেই ভুলের সান্নিধ্যে চোখের জলের সার্থকতা ফুটে ওঠে। যে ভুল মানুষের চোখে জল আনে, সেই ভুলও উপভোগ্য হয়ে ওঠে কখনো কখনো। এই উপভোগ্যতারই প্রকাশ মুক্তার রূপকল্পে ধারণ করেছেন কবি। চিত্রকল্প হিসেবে এই ভুল বিস্ময়কর শিল্পসংহতি লাভ করেছে।

আজ প্রাণের খুশি
গানের খেয়ার পাল তোলে–
মোর সপ্ত সুরের সপ্তডিঙ্গা
তাই দোলে।
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৯)

এই গীতবাণীতে আকাশ কবিকে নতুন করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। বাতাসও তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে। তাই কবির প্রাণে খুশির ঝড় উঠেছে। কিন্তু সেই খুশি যখন গানের খেয়ায় পাল তোলে বুকের নদীতে ভেসে যায়, তা কেবল অনুভবের ভেতরেই আবদ্ধ থাকে না, তা চোখের সামনেও ভেসে ভেসে ওঠে। অর্থাৎ কবির খুশি এখানে পাঠকের দৃষ্টিকেও সুখ দিচ্ছে। গৌরীর সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞাই এই গীতবাণীতে চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। খুশি এখানে অরূপের আগল ভেঙে রূপ ধরে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই রূপ ধরার মাধ্যমেই তা পাঠকের একাধিক ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে, যা সফল চিত্রকল্পের উদাহরণ হতে পারে।

মুছে যাওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ের বেদনার
রঙে রঙে ছবি আঁকে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৪)

এই গীতবাণীতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ফেলে আসার দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই স্মৃতি কবিকে বারবার পিছু ডাকে। নানা দিনের নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে ভালোবাসার মানুষকে মনে করার ভেতর দিয়ে কবি স্মৃতিকে একটা প্রাণবন্ত অবয়ব দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। যে স্মৃতি হৃদয়ে বেদনার ছবি হয়ে ওঠে, সেই স্মৃতি তো কেবল অনুভূতিকেই পল্লবিত করে না, চোখের দাবিদাওয়াকেও তা পুরণ করার দুঃসাহস দেখায়। এই দুঃসাহসেরই সংহত প্রকাশে কবিতাটিতে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে। স্মৃতি হৃদয়ে যে ছবি আঁকে তাতে নানা বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন কবি। বর্ণের ভাষা বুঝতে হলে চোখের সহায়তা নিতে হয়। অর্থাৎ স্মৃতি এখানে চোখের কাছেও তার আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম। এই সক্ষমতার জন্যই স্মৃতি এখানে চিত্রকল্পের মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে
আমারই এ দুয়ার প্রান্তে
সে তো হায় মৃদু পায়
এসেছিল পারিনি তো জানতে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭৬)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রেমকে তাঁর দুয়ারে আসতে দেখেছেন। শুধুই দেখেনই নি, প্রেমের মৃদু পায়ের শব্দও শুনতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই পায়ের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে নি। তাই সেই প্রেমকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি। সেই আক্ষেপই এই গীতবাণীতে সংহত হয়েছে। প্রেম যখন মৃদু পায়ে দুয়ারে আসে, তখন সেই প্রেমের গতায়াত চোখে দেখা অসম্ভব নয়। কবি এখানে প্রেমের একটা অবয়ব নির্মাণের প্রয়াস পেযেছেন, যা হাঁটাচলা করতে পারে। এই গতিশীল প্রেমকেই কবি দৃশ্যমান রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বাতাস প্রেমের আগমনবার্তা ঘোষণা করে নি বলে কবি দ্বীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারেন নি। কিন্তু প্রেমের পায়ের শব্দ পাঠকের অনুভূতির নানা প্রান্তে আলো ফেলে বলেই চিত্রকল্প হিসেবে উদ্ধৃতিটি অসাধারণ।

ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল
তুমি বাতাসে ওড়ালে ভীরু অঞ্চল
ঐ রূপের মাধুরী মোর সঞ্চয়ে রেখেছি।

কবি উপরের উদ্ধৃতিটিতে প্রেমিকার অবয়বটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে পাঠক অনায়াসে সেই লাবণ্যময়ীকে দেখে নিতে পারেন। ভাবে ভরা চোখের চঞ্চলতা কেবল কবিকেই নয়, পাঠককেও সচকিত করে। আর বাতাসে যখন সেই রূপসীর আঁচল ওড়ে, সেই আঁচল ওড়া কেবল দেখাই যায় না, আঁচল ওড়ার শব্দও যেন আমরা শুনতে পাই। কবি যে রূপের মাধুরীকে হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখেন, সেই সঞ্চয়ে

পাঠক হিসেবে আমাদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্মাণ-প্রকৌশল কবিতাটিতে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে।

যে অতিথি এসেছিল মোর এই দ্বারে–
পারিনি তো এত করে ঠাঁই দিতে তারে,
মনের কথাটি, মোর হল যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ।

উপরের উদ্ধৃতিটিতে আমরা লক্ষ করছি, কবির দ্বারে যে অতিথি এসেছিল কবি তাকে আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই না-পারার কষ্ট এই গীতবাণীতে ধরা পড়েছে। কিন্তু কবির মনের কথা যখন মেঘে ঢাকা তারার রূপ ধারণ করে, তখনই নির্মিত হয় চিত্রকল্প। মেঘে ঢাকা চাঁদও কখনো কখনো মেঘের আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং তার রূপের মোহে পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করে। প্রেম যখনই মেঘে ঢাকা চাঁদ হয়ে ওঠে, তখনই প্রেম আড়ালে থেকেও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় এবং মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। মন-মেঘ-চাঁদের ত্রিমাত্রিক সন্নিবেশে নির্মিত এই চিত্রকল্পে কবির সৃজনপ্রতিভার স্বাক্ষর স্পষ্ট।

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু
একটি সে নাম,
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে
তারে যেন মুছিয়া দিলাম।
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৭)

এই গীতবাণীতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রেমকে সমুদ্রের বেলাভূমিতে নাম লেখার মতো করে তুলে ধরেছেন। সাগরের ঢেউ এসে তীরের স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিলেও মনের গভীর গহনে প্রিয় মানুষের নামটি যে চিরস্থায়ী আসন রচনা করেছে, তা উল্লেখ না করলেও পাঠক হিসেবে আমরা তা বুঝে নিতে পারি। কবির আবেগের ঢেউ যখন বেলাভূমিতে আঘাত করে তার আন্দোলন পাঠক হিসেবে আমরা যেন টের পাই। আমরা সেই বেলাভূমির স্নিগ্ধতা অনুভব করতে পারি। আমরা কবিকে অনুসরণ করি এবং সেই ঢেউকেও স্পর্শ করার আনন্দ লাভ করি। সরল ভাষায় উপলব্ধির সরসতা প্রকাশ পাওয়ায় গীতবাণীর সঙ্গে আমরা সহজেই একাত্ম হতে পারি। বালুকা বেলায় কবির সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এবং তীর-স্পর্শী ঢেউয়ের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ-সঞ্চারী এই গীতবাণী যে চিত্রকল্প সৃজন করে তা চিত্তের নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চার করে।

ও তো আঁখি নয় ওগো ললিতে–
দুটি ভ্রমর বসেছে দুটি কলিতে,
লাগিছে মধুর তব এই নব সাজ।
(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০১)

কবি নায়িকার চোখের ছবি আঁকতে গিয়ে চোখের ভেতর দুটি কালো ভ্রমরের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। চোখ যখন কলির রূপকল্পে ধরা দেয়, তখন সেই কলির আকর্ষণে ভ্রমরের উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক-সঙ্গত। এই সঙ্গতির মধ্যেই কবির কল্পনাপ্রতিভার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়ে আছে। ভ্রমর তো কেবল কলির বুকে বসেই থাকে না, সে গান গায়, পাখা ঝাপটায় কখনো-বা গানও গেয়ে ওঠে। এই কথা না বললেও আমরা বুঝতে পারি, কবি যে চোখের কথা বলছেন, সেই চোখ নানা ভাষায় কথা বলে। সেই চোখের ভাষা কবি বুঝতে পারেন। প্রেয়সীর চোখের যে ছবি এই গীতবাণীতে বিধৃত তা কেবল অস্থির ও অসহিষ্ণুই নয়, পাঠকের চৈতন্যে তা উদ্দীপনা-সঞ্চারী। চিত্রকল্প হিসেবে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি অসাধারণ।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গীতবাণীর আশ্রয়ে তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেমানুভূতিকেই মূলত বাণীরূপ দিয়েছেন। তিনি যা ভাবছেন বা কল্পনা করছেন তা পাঠক বা শ্রোতার অনুভবের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। সঙ্গীত যেহেতু একটি যৌথ শিল্পকলা সেহেতু গীতবাণী যে বাকপ্রতিমা নির্মাণ করে তা কেবল গীতিকার সুরকার বা শিল্পীর একক নির্মাণ নয়। কিন্তু সুরকার ও শিল্পীকে তো গীতবাণীর ওপর ভর করেই সামনে এগুতে হয়। গৌরীপ্রসন্ন সেই এগিয়ে দেয়ার কাজটি শিল্পসফলভাবেই সম্পন্ন করেছেন। তাই তাঁর গানের বাণী পাঠে কাব্যপাঠের আনন্দ লাভ করা যায়।

cjK e‡›`¨vcva¨vq

গীতবাণীতে চিত্রকল্প সৃজনে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি প্রেমকে কেবল অনুভবের সীমায় আবদ্ধ রাখেন নি, বরং সেই প্রেমের একটি দৃশ্যমান অবয়ব দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই অবয়ব কেবল দর্শণেন্দ্রিয়কেই সচকিত করে না, কখনো কখনো তা পাঠকের চিত্তে স্পর্শের শিহরণ ছড়িয়ে দেয়, আবার কখনো-বা আমরা সেই প্রেমের মধুর-মুখর কলরব শুনে পুলকিত হই। গীতবাণীর প্রধান বিষয় যেহেতু প্রেম, তাই পুলক বন্দ্যোপাধ্যাদয় তাঁর গানের বাণীতে প্রেমের বাণীমূর্তি সৃজনেই অধিকতর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রেমের আনন্দকে তিনি বিচিত্ররূপে উপস্থিত করেছেন, আবার তার বেদনাকেও করে তুলেছেন বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়ী। প্রাপ্তির সুখকে তিনি এমনভাবে নির্মাণ করেন যেন সেই প্রাপ্তির একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা পাঠক বা শ্রোতার সামনে হাজির হয়। একইভাবে অপ্রাপ্তি বা অতৃপ্তিজনিত শূন্যতা বা হাহাকারকেও তিনি দৃশ্যের সীমায় এনে উপস্থিত করেন, স্পর্শের যোগ্য করে তোলেন। প্রেমিকার সৌন্দর্য সৃজনে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ মনোযোগ তাঁর গানের শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। তিনি যখন সুন্দরের কথা বলেন, সেই সুন্দরকে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এমন অবয়ব দেন যে, তা অনুভবের জন্য আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। চিত্রকল্প বা বাক্প্রতিমা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমরা যেসব দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকি তা হলো :

> শব্দের মরমী অভিঘাতে কাব্যে যে সিদ্ধি এল তা আমাদের কাছে কোন ছবিটি দৃশ্যমান করে তুলল, ঝঙ্কার তুলে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় কী পরিমাণে তৃপ্তি বিস্তার করল, অথবা ঘ্রাণের যে অনুভূতির বিস্তার করেছে তার নাগাল কতটুকু পেলাম, কিংবা স্বাদ পেলাম কিনা অথবা স্পর্শের নিবিড় শিহরণ। (বিপ্রদাশ বড়ুয়া ২০০৯ : ১৮)

সমালোচকের উপরিউক্ত বিবেচনাসমূহ কবিতার চিত্রকল্প চিহ্নিত করার প্রয়াস হিসেবে উচ্চারিত হলেও গীতবাণীর বাক্‌প্রতিমা অনুসন্ধানেও তা সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকল্প নির্মাণের বিশেষত্ব চিহ্নিত করার প্রয়াস পাবো।

ডাগর কালো নয়নে অমন বিনা কারণে
নয়নতারা ফুল ফুটিয়ে স্বপ্ন তুমি ছোয়োনা!
সোনা বৌ, ঘরের আগল খুলোনা
বাঁশীর ডাকে ভুলোনা
ময়ূর-মুখী হাতের বালায় রিনিক্ রিনিক তুলো না
ও ভাবে গুনগুনিয়ে যেওনা কিছু শুনিয়ে
শুনতে পারে রসিক ডাকাত ওভাবে গান গেয়ো না।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫-৬)

উপরের উদ্ধৃত গীতবাণীতে গ্রাম্য নিসর্গের সমান্তরালে পুলক তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির চমৎকার এক বাণীমূর্তি নির্মাণ করেছেন। কোন এক উদাস দুপুরে কবি শুনতে পাচ্ছেন ঝরা পাতার শব্দ যা কবির কাছে নূপুরের মতো মনোহর মনে হচ্ছে। সেই মনোরম পরিবেশে ডাহুকের ডাক ভেসে আসছে দূরের মাঠ থেকে। একজন গ্রাম্য বধূ যেন সেই ডাহুকের ডাকে সাড়া দিয়ে পাখির মতো সেই মাঠের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এই গ্রাম্য মেয়েটির যে রূপ কবির চোখে ধরা পড়ছে তা তো কেবর চোখের দেখা নয়। সেই সোনা বউ নয়নতারা ফুলের মতো যেন বাতাসে ভেসে বেড়াতে চাইছে। কিছুতেই তাকে ঘরে আটকে রাখা যাচ্ছে না। যে বাঁশির ডাকে এই গ্রাম্য বধূ ঘর ছাড়ছে সেই বাঁশির নাগাল সে পাবে কিনা আমরা জানি , কিন্তু আমরা এই পল্লীবালার সৌন্দর্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সজীবতাকে যেন চোখের পলকে পাঠ করে নিই। রতু মুখোপাধ্যায়ের সুর করা এই গানটি আমরা যখন নির্মলা মিত্রের কণ্ঠে শুনতে পাই তখন সেই গাঁয়ের বধূর ছবিটি আমাদের অনুভূতির নানা প্রান্তে অপরূপ শিহরণ ছড়িয়ে দেয়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গানে তাঁর প্রেয়সীর মুখের কথা ও মনের কথার ব্যবধান চিহ্নিত করতে গিয়ে চমৎকার বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন। কথা ও চিন্তার পার্থক্য থেকে সৃষ্ট নানা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে নায়িকার রেশমি চুড়ির ভাষা বোঝার চেষ্টা করেছেন। রেশমি চুড়ি থেকে যে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে সেই

Dhaka University Institutional Repository

আওয়াজ কীভাবে কবিকে গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ করে, তারই ছবি এঁকেছেন তিনি। পুলক নায়িকার চোখের ভাষা গীতবাণীতে অনুবাদ করতে গিয়ে যে কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছেন না। এই সংশয়ের আবহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে চোখের চাহনির বহুমাত্রিকতা। কবির প্রেমিকা যে কথা মন খুলে বলতে পারছেন না তা বোঝার চেষ্টা থেকেই সৌন্দর্যের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। অস্বীকার বা অসম্মতির ভেতর দিয়ে প্রেম কীভাবে গভীরতা লাভ করে তারই ছবি এই বাক্‌প্রতিমায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। প্রেমিকাকে বুঝতে না-পারাকে তাই তিনি চিহ্নিত করেন না-বুঝে প্রেমের পুথি পড়ার সঙ্গে। এই বুঝতে না-পারার কারণেই প্রেমিকার প্রতি কবির আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠছে। নিচের দৃষ্টান্তটুকু বিবেচনা করা যাক :

রেশমি চুড়ির আওয়াজ দিয়ে
কত কথা যাও যে বলে
কত কথা বলে ওঠো
কালো চোখের ওই কাজলে
আবার কত কথা বলি বলি
করেও কিছু বলো না!
(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৫০)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনপ্রিয় গীতবাণী ‘নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা/বুঝিবা পথ ভুলে যায়/কুলায় যেতে যেতে কী যেন কাকলী/আমারে দিয়ে যেতে চায়!’ এই গানে কবি প্রকৃতির সঙ্গে গভীর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির আহক্ষানে সাড়া দিয়ে নিজের অনুভবের রঙে পুলক দৃশ্যমান বাস্তবতার ভিন্নতর একটি ছবি নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। দূরের পাহাড় ও ভাসমান মেঘের মিতালিকে তিনি বাগ্ময় তরে তুলেছেন। বনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় যে গান বেজে ওঠে সেই গানের মর্মার্থ উপলব্ধির প্রয়াস এই গীতবাণীতে বিস্ময়কর শিল্পসংহতি লাভ করেছে। স্বপ্নের কথাগুলো যখন কলি হয়ে ওঠে এবং তা ফোটার অপেক্ষায় থাকে তখন স্বপ্নও যেন ধরাছোঁয়ার সীমায় চলে আসে :

দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে
ওই গোধূলির রঙিন সোহাগ মেশে
বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি
কী বাঁশী ফেলে রাখে হায়!
কোন অপরূপ অরূপ রূপের রাগে
সুর হয়ে রয় আমার গানের আগে
স্বপন কথাকলি ফোটে কি ফোটে না
সুরভি তবু আঁখি ছায়!!
(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৯১)

প্রিয় মানুষকে দীর্ঘদিন না-দেখার দুঃখকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কতদিন পরে এলে একটু বোসো/তোমায় অনেক কথা বলার ছিল যদি শোনো!'– এই গানটিতে বাণীরূপ দিয়েছেন। ভালোবাসার মানুষ কাছে এলে দেহ-মনে যে শিহরণ জাগে তারই ছবি এঁকেছেন কবি। আর সেই কাছে আসা যদি দীর্ঘ বিরতির পর হয় তাহলে শিহরণের মাত্রাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এই গীতবাণীতে কবি তাঁর অন্তরের ঝড় বা অস্থিরতাকে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যক্তিক ব্যাকুলতার একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা নির্মাণ করেছেন। এই ঝড় কেবল দর্শণেন্দ্রিয়কেই সচকিত করে না, স্পর্শের অনুভবও সঞ্চার করে। প্রেয়সীর ছায়ায় কবি নিজের জীবনের যে পথ নির্মাণ করেছেন সেই পথ যখন সবুজে ঢেকে যায়, তখন পাঠক বা শ্রোতা হিসেবে আমরা বুঝতে পারি এখানে শান্তির আবহ নির্মাণ করাই কবির উদ্দেশ্য। সেই অর্থে শান্তিরও একটি দর্শনযোগ্য ছবি খুঁজে পাওয়া যায় এই গীতবাণীতে। নিচের দৃষ্টান্তটুকু বিবেচনা করা যেতে পারে :

আকাশে বৃষ্টি আসুক গাছেরা উঠুক কেঁপে ঝড়ে
সেই ঝড় একটু উঠুক তোমার মনের ঘরে
বহুদিন এমন কথা বলার ছুটি পাইনি জোনো!
জীবনের যে পথ আমার ছিল গো তোমার ছায়ায় আঁকা
সেই-পথ তেমনি আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা
চেনাগান বাজলো যদিই বেজেই আবার থামবে কেন??

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৪)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গানে আমরা লক্ষ করি, প্রিয় মানুষকে দুঃখ দেয়ার প্রযত্ন প্রয়াসকে বাণীবদ্ধ করেছেন তিনি। 'তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো/দিতে পারোনি!/কী তার জবাব দেবে যদি বলি আমিই কি হেরেছি/তুমিও কি একটুও হারোনি?'– এই গানে জয়-পরাজয়ের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে দুজনে মিলে দুঃখ ভোগ করার আনন্দ। দুঃখ ভোগের আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ নানারূপে রসে শব্দবন্দি করেছেন। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে একাকার হয়ে আছে। এ-প্রসঙ্গে MxZweZvb থেকে বিশ্বকবির একটি গীতবাণীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'আনন্দগান উঠুক বাজি/এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।/অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি/পারের তরী থাকুক ভাসিতে।' (১২৯ : ১৯৭১)। পুলকের গানেও আমরা এই আনন্দ-বেদনার যুগলছবি অবলোকন করি। তাই অন্তরের বেদনা ছেঁড়া পাতার রূপকল্পে ধরা দেয়, বুকের সাজানো বাগান দৃশ্যমান ফুলের বাগানের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এবং তাতে সেই ফুলের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মগত কষ্টের গহীনতা স্পষ্ট করে তোলেন। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি :

সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলেছো ফুলেতে আগুন তুমি জ্বেলেছো
ফাগুনের সব কেড়ো নিয়েছো স্মৃতিটুকু কেন কার কাড়োনি?

অন্তরে আলো জ্বেলে রেখে
দৃষ্টিকে গেছো শুধু আঁধারেতে ঢেকে;
নিজেকে প্রশ্ন করে দ্যাখোনা   যার নাম তুমি আর লেখোনা
কেন তাকে ধরে আছো হৃদয়ে   বিদায়ের পথ কেন ছাড়োনি??
(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৫)

'বড়ো সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি/কত কাল দেখিনি তোমায়।'– পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গানে আমরা লক্ষ করি, কবি স্মৃতির জানলা খুলে বসে থাকেন। স্মৃতি এখানে দৈহিক অবয়ব লাভ করেছে। পুলকের স্মৃতিনির্মিত ঘরে বসে পুরনো প্রেমের আনন্দ-বেদনা উপভোগের প্রলোভন এড়ানো কঠিন। এই ঘরে যে আলোর আসা-যাওয়া সেই আলো তো মনের কালিমা দূর করে দেয়। তাই না-পাওয়ার বেদনা যে অন্ধকারের জন্ম দেয় সেই অন্ধকারও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। স্মৃতি যখন গান হয়ে বেজে ওঠে, তখন তা কেবল দৃশ্যের সীমায় বন্দি থাকে না, তা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কেও সচকিত করে তোলে :

স্মৃতির জানলা খুলে   চেয়ে থাকি চোখ তুলে
যতটুকু আলো আসে   সে-আলোয় মন ভরে যায়!
আমার এ অন্ধকারে   কতরাত কেটে গেলো
আমি   আঁধারেই রয়ে গেলাম;
তবু   ভোরের স্বপ্ন থেকে সেই ছবি যাই এঁকে
রঙে রঙে সুরে সুরে   ওরা যদি গান হয়ে যায়!!
(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬)

বৃষ্টির সঙ্গে কথোপকথনে ব্যক্তিগত বেদনা বা বিরহের ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে পুলকের 'ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়োনা/আমার এত সাধের কান্নার দাগ ধুয়োনা/সে যেন এসে দ্যাখে পথ চেয়ে তার কেমন করে কেঁদেছি।'– এই গীতবাণীতে। বৃষ্টি এখানে মানবিক অনুভূতি লাভ করে কবির কষ্টের প্রহরকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সেইসঙ্গে গানের বীণাও হয়ে উঠেছে কবির বেদনার অন্যতম দোসর। ক্লান্ত প্রদীপের রূপকল্পে কবি যখন নিজের নিয়তির নির্মম ছবি উন্মোচনের প্রয়াস পান, তখন প্রদীপ কেবল আলো বিতরণের উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত হয় না, কবির উপলব্ধির আলো-সঞ্চারি দিকের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। বৃষ্টি, গানের বীণা ও ক্লান্ত প্রদীপের কাছে কবির প্রার্থনা এই গীতবাণীতে প্রকাশিত হলেও এর আড়ালে বসে কবি নিজেকেই নানা মূর্তিতে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টা থেকেই নির্মিত হয় নানা রঙের ছবি, যে ছবির প্রাণ আছে, কান আছে এমন কি মান-অভিমানও আছে :

দোহাই গানের বীণা মনকে ভরে তুলোনা

দেখেই তাকে ব্যথার এ -গান ভুলোনা

সে যেন এসে শোনে তার বিরহে কী সুর আমি সেধেছি!

ক্লান্ত প্রদীপ ওগো হঠাৎ আলোয় ফুটোনা

দেখেই তাকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটোনা

সে যেন সে জানে কোন আধারে এ-রাত আমি বেঁধেছি !

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬)

প্রেমিকার চুল বাঁধা দেখতে দেখতে যখন কাঁচের আয়না ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখনও আমরা একটি চমৎকার বাক্প্রতিমায় প্রবেশ করি। 'তোমার চুল বাঁধা দেখতে দেখতে/ভাঙলো কাঁচের আয়না/তোমার ছলাকলা দেখতে দেখতে/ভাঙলো বুকের আয়না!' এই গীতবাণীর পাঠক কিংবা শ্রোতা হিসেবে আমরা বুঝতে পারি, এই আয়না কবির ব্যক্তি-অনুভবেরই দৃশ্যমান রূপ। বলা যায়, সুন্দরের সংস্পর্শে নিজেকে ভেঙেচুরে দেখার কথাই এই ভাঙা-আয়নার রূপকল্পে ধরা পড়ছে। প্রেমিকার যে ভরা যৌবনের ছবি এঁকেছেন কবি, সেই যৌবনে পৌঁছাতে ষোলটি ফাগুনের যে আত্মদান, তা তো কবির পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব। কবি বলেছেন, এই ভাঙা আয়নার বেদনা বুঝতে না পারলে কবিকে বোঝা অসম্ভব। তাই কবি একটি আয়নার বিধক্ষস্ত রূপ নির্মাণ করার আড়ালে নিজের বিপন্নতার ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর প্রেমিকাকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী আয়নার সামনে, যে আয়নার অন্তরের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবিকল বাণীমূর্তি উপস্থাপনে সক্ষম। নিচের উদাহরণটির নিবিড় পাঠে আমরা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমানুভূতির প্রকৃতি যেমন অনুধাবন করতে পারব, তেমনি চিত্রকল্প সৃজনে কবির গভীরতর অভিনিবেশেরও পরিচয় পাবো :

ভরা যৌবনে সাজাতে তোমায়

ষোলটি ফাগুন লেগে গেছে

তোমার অতো রূপ ধরে রাখতে

পাগল হলো যে আয়না!

আমি যেমন তোমার-ই ছিলাম

তেমন তোমার-ই আছি

তুমি আয়নাকে প্রশ্ন করো

শুনে নাও কী বলে আয়না?

তুমি একদিন এখানে এসো

আমার চোখের দিকে শুধু চাও

তুমি তবেই বুঝবে আমাকে

চোখ যে মনের আয়না!!

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৭)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী থেকে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, প্রেমের মতো মানবীয় উপলব্ধির বিষয়গুলোকে তিনি দৃষ্টি ও স্পর্শের সীমায় এনে চমৎকার সব চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতি ও প্রেমকে তিনি কবিকল্পনার ঋদ্ধতায় সূত্রবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পের সত্যকে শব্দের স্বতঃস্ফূর্ততায় গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে পুলকের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। গীতবাণীর বাক্‌প্রতিমা অন্বেষণে অবতীর্ণ হয়ে একথা ভুলে গেলে চলে না যে, গীতবাণীর সঙ্গে সুরস্রষ্টা ও কণ্ঠশিল্পীর সম্মিলনেই তা গান হয়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। ফলে গীতিকারকে কবিতার অনেক জটিল ও বৈদগ্ধের পথ পরিহার করে সরলতার দিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবন্ধ রাখতে হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী এই সরলতাকে স্বীকরণ করেও শিল্পের দাবির প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমরা মনে করি। তাঁর চিত্রকল্পে প্রেমিক-হৃদয়ের আশা ও আশঙ্কার শিল্পসফল উন্মীলন ঘটেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর অধিকাংশ চিত্রকল্পেই তাঁদের প্রকৃতি, প্রেম, বিরহ, সৌন্দর্যচিন্তা এবং জীবন সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের অনেক নানা অনুষঙ্গেই তাঁরা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। গীতবাণীকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতেই হয়। তাই চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁরা মানুষের কাছের এবং একান্ত অনুভবের জিনিসকেই গীতবাণীর উপকরণ ও প্রেরণা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সরল ভাষায় অনুভবের নিবিড় পরিচর্যায় তিনি তাঁর ভাবনাকে গ্রথিত করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে শব্দের শক্তি নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দিয়ে ঝর্ণার মতো গান গেয়ে উঠেছে। প্রতীকী অর্থমাত্রায় ঋদ্ধ শব্দাবলি তাঁদের চিত্রকল্পে নতুন মাত্রা এনেছে। অন্যাসক্ত এবং সমাসোক্তির সাবলীল ব্যবহার তাঁদের গীতবাণীর প্রধান প্রবণতা হলেও, অধিকাংশ শিল্পসফল চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে উপমা এবং রূপকের সাহায্যে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুভব ও উপলব্ধির জগতই গীতবাণীতে বিম্বিত হয়েছে। তাঁদের গীতবাণীতে প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ যেমন সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় বাণীরূপ পেয়েছে, তেমনি অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করার প্রয়াসে গীতবাণীর ভাষায় এনেছে সজীবতা এবং সংহতি।

Z_¨wb‡'k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, †MŠixcmb iPbv msMn প্রথম খণ্ড (সম্পাদনা-শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

২. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, Avgvi wcq Mvb,এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯

৩. বার্ণিক রায়, ১৩৭৮, KweZv : wPwÎZ Qvqv, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

৪. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, e×‡'e emi KweZv : welq I cKiY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৯, wewPÎ ceÜ, তৃতীয় সংস্করণ,পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৬. সরকার আমিন, ২০০৬, evsjv‡'‡ki KweZvq wPÎKí, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, আলো-আধাঁরের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, KweZvq evKcwZgv, সাহিত্য প্রকাশনালয়, দ্বি. স. ঢাকা ২০০৯

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, MxZweZvb 1, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭১

১০. C. D. Lewis, 1968, *The Poetic Image*, Jonathan Cape, London.

১১. Stephen J. Brown, 1927, *The Word of Imagery*, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London.

১২. Stephen Spender, 1965, *The Struggle of the Modern*, University Paperbacks, London.

১৩. William J. Handy & Max Westbrook [Ed.], 1976, *Twentieth Century Criticism : The Major Statements,* Indian Edition. Life & Light Publishers, New Delhi.

চতুর্থ অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

cZXK

চতুর্থ অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

cZxK

শিল্প-সাহিত্যে আমরা যাপিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত জীবনেরই নান্দনিক প্রকাশ প্রত্যাশা করি। সঙ্গীতের সম্মোহন আমাদের চৈতন্যে অধরা এবং অপ্রকাশ্য অভিজ্ঞতার শিহরণ এনে দেয়। গানের বাণী জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকে ধারণ করলেই তা সুরের ডানায় ভর দিয়ে অন্তরের আকাশে বিচরণ করতে পারে। জীবনকে সাহিত্য ও সঙ্গীতে রূপ দেয়ার প্রয়োজনেই স্রষ্টার অনুভব নানা রকম শিল্পপ্রকৌশলের আশ্রয়ে সুন্দর-সাবলীল-স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে তা পাঠক বা শ্রোতার সৃজনভাবনাকেও নতুন মাত্রায় উন্নীত করে। প্রতীক কবিতা বা গানের বাণীকে দান করে সেই সংহতি ও শিল্পঋদ্ধি যা স্রষ্টার ভাব বা বক্তব্যকে দূরসঞ্চারী করে তোলে। গ্রিক শব্দ symballein ও symbolon থেকে উৎপন্ন symbol-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে গৃহীত 'প্রতীক'-এর পরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে J.A. Cuddon বলেন, `It is an object, animate or inanimate, which represents or `stands for' something else' (J.A. Cuddon 1982 : 671.) প্রকৃতপক্ষে প্রতীক বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে তাতে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে বক্তব্যকে বক্তার বা স্রষ্টার জীবনাভিজ্ঞতার বর্ণিলতায় শিল্পসংহতি দান করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জগন্নাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> প্রতীক এক বিশেষ অর্থের প্রতিনিধি নয়। প্রতীকের মধ্যে অনেক অকথিত, অপ্রকাশিত অর্থ যোগরূঢ় হয়ে থাকে। নর্তকী যেমন নাচের মানে কি বলতে পারে না; তা বলা যায় না বলে কষ্ট করে দেখাতে হয়; তেমনি প্রতীকও ব্যাখ্যার মধ্যে পেতে চেষ্টা করা ভুল। তাকে প্রতীকের মধ্যে প্রতীক হিসেবেই পেতে হয়। প্রতীক বলে না, বলতে চায়। কোন বক্তব্য নয়, বলার আগ্রহই তার ভাষা। (জগন্নাথ চক্রবর্তীর ১৯৬৫ : ১৯৪–১৯৫)

শিল্পস্রষ্টার জীবনবোধ ও উপলব্ধিই তাঁকে প্রতীক সৃষ্টিতে প্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণার সঙ্গে অনুভব যুক্ত হলেই তা ভাবনার বিচিত্র প্রান্তে পাঠক বা শ্রোতার প্রবেশের পথ রচিত হয়। তাই প্রতীক কবির জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে। সেই সঙ্গে শিল্পস্রষ্টার প্রকাশকলার স্বতন্ত্র রূপটিও প্রতীকের মাধ্যমে চিহ্নিত হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক:

> A symbol, in the broadest sense of term, is anything which signifies something else...Symbol is applied only to a word or set of words that signifies an object or event which itself signifies something else; that is, the words refer to something which suggests a range of reference beyond itself. (M.H. Abrams : 1999 : 168)

সাহিত্য কিংবা সঙ্গীতের স্রষ্টা নিজের ইচ্ছের অনুকূলে প্রতীকের প্রয়োগ ঘটান। তিনি বস্তুর গভীর থেকে যেমন জীবনবীক্ষার বীজ সংগ্রহ করেন, তেমনি বাস্তবের নানা সমস্যা-সংঘাতও হয়ে ওঠে প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল। কবিতা বা গানে আমরা জীবনের রহস্য ও জটিল স্বপ্নময়তার সন্ধান করি যা আমাদের স্বপ্নচেতনাকে সঞ্জীবিত করতে পারে। প্রতীক পাঠক বা শ্রোতার কাঙ্ক্ষিত রহস্যময়তাকে ধারণ করে বলেই প্রতীকের আশ্রয়ে আমরা আনন্দময় অভিনবত্বের সন্ধান পাই। (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৭০)। প্রতীকের সাহায্যে কবিতায় যে জগত চিত্রিত হয় তা অরূপ ও অতীন্দ্রিয়। প্রতীক জাগতিক রূপময় ভাষার এমন এক অবয়ব নির্মাণ করে নেয় যা শব্দের প্রচলিত অর্থের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। চিন্তা ও কল্পনাকে দূরসঞ্চারী করতে না পারলে প্রতীকের প্রতীয়মান অর্থের উপলব্ধি করা যায় না। প্রতীক যে ভাব প্রকাশ করে, তার অর্থোদ্ধার অনেকটা পাঠকের অনুভবের গভীরতার ওপর নির্ভরশীল। ‘প্রতীক সম্বন্ধে যা বলা চলে তা হলো এই, প্রতীকে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়। ...আসলে প্রতীক বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শন শুধু নয়, প্রতীক হচ্ছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি, সম্মিলন, একটি গভীর রহস্য, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনা। শুধু একটি অর্থ উদ্ধার করে প্রতীক বিশ্লেষণ চলে না।’ (আহমদ কবির ১৯৯৫ : ৯৯–১০০)। প্রতীক, যা নিরাবরণ-নিরাভরণ প্রগাঢ় অভিব্যক্তির ধারক, পাঠকের অনুসন্ধিৎসাকে রহস্যাবৃত করে। প্রতীক কবির ভাষা ও বক্তব্যের সরলরৈখিকতাকে অতিক্রম করে তাতে দান করে নিবিড়তা ও সঙ্কেতময়তা। প্রতীক সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে কবির প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সুগভীর উপলব্ধির বর্ণিল প্রান্তর। প্রেরণার সঙ্গে অনুভব লীন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তা প্রকাশের পথ করে নেয়। ‘বস্তুত প্রতীক হচ্ছে একধরনের গোপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খেলা, অর্থ খুঁজে পেলেই পাঠকের বুদ্ধি নান্দনিক হয়ে ওঠে।’ (বেগম আকতার কামাল ১৯৯২ : ১৯০)। কবিতার পাঠক যেমন এই ধরনের কবিতা পাঠে নান্দনিক বোধের সঙ্গে একাত্ম হয়, তেমনি গানের শ্রোতাও প্রতীকের আশ্রয়ে গীতিকারের সৃজনভুবনের সঙ্গে সন্নিহিত হয়ে ব্যাখ্যাতীত আনন্দ লাভ করেন। কোন একটি কবিতা বা গানে ব্যবহৃত প্রতীক পুরো কবিতা বা গানকেই তার দ্যুতিময়তা দান করে। এ-প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র মন্তব্য স্মরণ করা যায় : ‘সার্থক প্রতীকী কবিতা রূপ পায় সমগ্র কবিতার বা কবিতার স্তবকের মধ্য দিয়েই, আদ্যন্তরূপায়ণেই।’ (১৯৭৫ : ১৩৪)। বিষ্ণু দে’র এ মন্তব্য কবিতার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রতীকাশ্রয়ী গানের বাণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সার্থক কবিতা বা গানের বাণী যে দ্যোতনা সৃষ্টি করে তা প্রতিনিয়ত তার অর্থের সীমা লঙ্ঘন করে নতুন অর্থের ইঙ্গিত করে। প্রতীক সেই অর্থে বহুস্তরী ভাবাদর্শের ইঙ্গিত সম্পন্ন বাকপ্রতিমায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। (অমলেন্দু বসু ১৩৭৯ : ৮৩-৮৬)। এই ইঙ্গিতময়তার জোরেই প্রতীক ভাবের প্রকাশক এবং অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠক বা শ্রোতার সৃষ্টিশীলতাকে সচকিত করে তোলে। অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতাকেও তা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উপরিউক্ত বিবেচনা সামনে রেখে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের শৈলী-বিচারে তাঁদের প্রতীকী-তাৎপর্য মূল্যায়ন করার প্রয়াস পাবো।

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর প্রধান অবলম্বন প্রেম বলেই প্রেমেরই নানা প্রান্ত প্রতীকী তাৎপর্যে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। মানুষের এই চিরন্তন অনুভূতির চিত্রায়ণে যুগ যুগ ধরে আমাদের শিল্পস্রষ্টারা কতিপয় মোটিফকে বিশেষ অর্থে ও তাৎপর্যে উপস্থাপন করে আসছেন। ভালোবাসার আলোকিত দিকের প্রতি তাঁদের মনোযোগ যেমন চোখে পড়ার মতো, তেমনি না-পাওয়ার বেদনাকেও তাঁরা শৈল্পিক অবয়ব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর প্রতীকী উদ্ভাসন চিহ্নিত করার প্রয়োজনে আমরা প্রধান কয়েকটি প্রবণতাকে গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই। নিম্নের আলোচনা থেকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের প্রতীকী-প্রবণতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

AÜKvi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে অন্ধকার নানা প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনের নানা অনুষঙ্গ থেকে অন্ধকারের বিভিন্ন তাৎপর্য উদ্ধার করেছেন তিনি। এরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে গীতিকবির শিল্পবোধ ও সমাজমনস্কতা। অন্ধকারকে তিনি চিত্রিত করেছেন অজানা রহস্যের প্রতীক হিসেবে। আবার অন্ধকারের তপস্যাকে আলো জ্বালানোর প্রয়াস হিসেবেও দেখিয়েছেন তিনি। গৌরীর গানে অন্ধকারকে যেমন হতাশা ও প্রতিবন্ধকতার সঙ্কেত হিসেবে পাই, আবার কখনো কখনো তা আলোর জন্য অপেক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবেও উদ্ধৃত হতে দেখি। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :

ক. আঁধার হ'য়ে দীপের নীচে
ইচ্ছেটাকে বাঁচাই মিছে
ফুল কুড়িয়েও মালাটি মোর
সূঁচ সুতোতে গাঁথা নেই। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১)

খ. তুমি যে আমার দিশা
অকুল অন্ধকারে,
দাওগো আমায় ভরে
তোমার অহংকারে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮২)

গ. আঁধারের ভ্রুকুটিতে ভয় নাই—
মাগো তোমার চরণে জানি পাব ঠাঁই,
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায়
হাসিমুখে সে বেদনা সব। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৭)

AvKvk

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে মানবমনের বিশালতা এবং বৈচিত্র্য বোঝাতে আকাশ-প্রসঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আকাশ-প্রতীক ব্যবহার করে গানকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। সৃজনশীল মনের উদারতাও আকাশ-প্রসঙ্গে নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে। কল্পনার পাখা বিস্তারের অবাধ ক্ষেত্র হিসেবেও আকাশ-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে কবি মানুষের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের কথা বলেছেন। প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ানোর কথাও বলেছেন গৌরীপ্রসন্ন। কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক :

ক. আকাশ আমায় ডাক দিয়েছে
নতুন নিমন্ত্রণে
বাতাস আমায় জড়িয়ে ধরে
প্রাণের আলিঙ্গণে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৯)

খ. নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী
আর পৃথিবীর 'পরে ওই নীল আকাশ,
তুমি দেখছ কি?
আকাশ আকাশ শুধু নীল ঘন নীল নীলাকাশ
সেই নীল মুছে দিয়ে আসে রাত,
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে তুমি দেখছো কি?
তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছো কি?
শুনেছো কি রাত্রির কান্না বাতাসে বাতাসে বাজে
তুমি শুনেছো কি? (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৮)

গ. মনে হয়, মানুষেরই সুখে দুখে মিশে থাকি
তাদের কাছে ডাকি,
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরে বলি যেতে দিও না আমায়
না না না যাব না।।
যদি সব কিছু ছে দিতে হবে
তবু এই আকাশ এই বাতাস
পিছু ডাকে কেন তবে।। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২২৪)

গৌরীপ্রসন্নের গীতবাণীতে আকাশ-প্রতীক যেমন বিচিত্র ভাব ও অভিজ্ঞতার দ্যোতনা দিয়েছে, তেমনি তাঁর প্রেমানুভূতির প্রকাশকেও তা দূরসঞ্চারী এবং বর্ণীল চৈতন্যের স্মারক করে তুলেছে।

Av¸b

আগুন গৌরীপ্রসন্নের গানে বিচিত্র অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে তা লাভ করেছে প্রতীকী তাৎপর্য মাত্রা। কখনো আগুনের পরশমনি আবার কখনো-বা তার বিধ্বংসী রূপ তাঁর গানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কখনো সৃষ্টির উল্লাসে তিনি আগুনের উত্তাপ অনুভব করেছেন, আবার কখনো-বা আগুন এসেছে নিজের ভেতরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার প্রেরণা হিসেবে। চোখের জলই শুধু কাম্য নয় তাঁর, কখনো আবার চোখের আগুনে ভস্মিভূত করতে চান তাঁর প্রিয়জনের মনের জটিলতাকে। দুঃসময়ের রূপকল্প হিসেবেও আগুন-প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখি তাঁর গানে। এভাবেই তিনি আগুনকে নিজের ইচ্ছের আনন্দে ব্যবহার করেছেন তাঁর গীতবাণীতে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি :

বনে নয় আজ মনে হয়
যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে
আমি তাই গেয়ে যাই
এ কোন খুশি প্রাণে জেগেছে
প্রাণে প্রাণে গানে গানে
ফাগুনে আগুন বুঝি লেগেছে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫০)

জীবনের বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে আগুনের প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গানের বাণীকে দূরসঞ্চারী করে তোলেন এবং গানের বাণীতে যোগ করেন শিল্পসংহতি।

Av‡jqv

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার অধরা বিষয় বা বস্তু অধিকার করার প্রয়াসকে প্রকাশ করেছেন আলেয়া প্রতীকের মাধ্যমে। মানুষের মনের গোপন-গভীর প্রদেশকে জয় করার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখনি তিনি আলেয়ার অনুষঙ্গে সেই ব্যর্থতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। মানুষের জীবনের অপ্রাপ্তির কিংবা অতৃপ্তির শেষ নেই। সেই অচরিতার্থতা যখন অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনি তাঁর জীবনভাবনা একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে/আমারই এ দুয়ার প্রান্তে/সে তো হায় মৃদু পায়/এসেছিল পারিনি তো জানতে।'—এই গানে গৌরী আলেয়া-প্রতীক ব্যবহার করে জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকে শিল্পিরূপ দিয়েছেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করলেই কবির জীবনভাবনার প্রকৃতি অনুভব করা যাবে–

সে যে আলো হয়ে এসেছিল কাচে মোর
আজ তারে আলেয়া যে মনে হয় ॥

এ আঁধারে একাকী এ মন আজ

আঁধারের সাথে শুধু কথা কয়।

আজ কাছে তারে এত আমি ডাকি গো

সে যে মরীচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো

ভাগ্যে যা আছে লেখা হয় রে

জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৭৬)

Kv‡jv

গৌরীপ্রসন্ন কালো-প্রতীকের আশ্রয়ে জীবনের আলোকিত দিককে যেমন মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি অন্ধকারের অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকেও রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে গানের বাণীতে ধরতে দিয়ে জীবনপথের বাধা-বিঘ্নকেও তুলে ধরেছেন তিনি। কালো সেই প্রতিবন্ধকতাসমূহকেই নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাধা অতিক্রমণের প্রয়াস যেমন তাতে উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি আবার কালোর সৌন্দর্যও তাতে ধরা পড়েছে কখনো কখনো। তাঁর গীতবাণীতে কালো যেমন সুন্দরকে উপভোগ করার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে এসেছে, তেমনি কালো চুলের সৌন্দর্যও এতে ধরা পড়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো :

মেঘ কালো আঁধার কালো

আর কলঙ্ক যে কালো

যে-কালিতে বিনোদিনী হারাল তার কুল।

তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৮৮)

কালোটাকা, কালোবাজারী,

কালোকথা মখে

নয়ত কালো শিশুর হাসি

মায়ের শীতল বুকে।

পাথর ভাঙ্গে, কাঁচ ভাঙ্গে,

ভাঙ্গে নদীর কূল

ঘরভাঙ্গে, কপাল ভাঙ্গে

ভাঙ্গে না তো ভুল

বুঝলেন কি কথাটা।। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৫৩)

†LjvNi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার খেলাঘর প্রতীক ব্যবহার করে ক্ষণস্থায়ী জীবনের অপ্রাপ্তি বা অচরিতার্থতাকে রূপায়িত করেছেন। কবি জীবনকে খেলাঘরের সঙ্গে তুলনা করে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভালোবাসার অতৃপ্তিকেই শৈল্পিক ঋদ্ধি দান করেছেন। 'পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো/ফুল জানে পাখী কেন গান গায়,/রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো/ চাঁদ জানে রাত কার পানে চায়।'– এই গীতবাণীতে আমরা লক্ষ করি :

সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে
মন চায় সেই সুরে হাসিতে,
নদী চায় সাগরে যে মিশিতে
সাগর নদীরে তাই কাছে পায়।
কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায় গো,
খেলাঘর কেন ভেঙে যায় যায় গো,
সীমার বাঁধনে আমারে বাঁধিতে চাও
যত খেলা মোর নীরবে সাধিতে দাও,
ধুলির যা আছে ধুলিতেই থাক পড়ে
ঝরা মালা মোর রেখে গেনু তব পায় ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৭)

wPZv

চিতা মানুষের জীবনের অন্তিম আনুষ্ঠানিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মানুষের দুঃখ-বেদনা যখন সাধারণ বর্ণনায় ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন চিতার অগ্নির সঙ্গে ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে তুলনা করা হয়। চিতা সেই অর্থে মানুষের অদৃশ্য কষ্টযাপনের প্রতীক হিসেবে শিল্পসাহিত্যে গৃহীত হয়ে থাকে। গৌরীপ্রসন্ন চিতা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেই বর্ণনাতীত বেদনাকেই শিল্পসংহতি দিয়েছেন। আজীবন গানের বাণী রচনায় নিবেদিত শিল্পী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারও গানকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিজের বেঁচে থাকার সার্থকতা অন্বেষণ করেছেন। তাই প্রিয় মানুষের অনাদর-অবহেলা উপেক্ষা করে গানকেই শিরোধার্য করেছেন তিনি। চিতার আগুনের প্রতীকী-প্রকাশে তিনি তাঁর গানের গৌরবদীপ্ত উপস্থিতিকে আবাহন করেছেন। কবি মানুষের জীবনে তাঁর গানের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই, ব্যক্তিগত যন্ত্রণার শেষ পরিণাম মৃত্যু সম্পর্কে চিতার আগুন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে সবার জন্য রেখে যাওয়ার কথা বলেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি :

বিরহ যে তার শিরনামা ওগো
জানিনা বধুর নাম,
তাই যে গো হায় পারিনা লিখিতে
কি তার নাম ঠিকানা ধাম।
সে যদি না পড়ে এ প্রাণ লিখন
বিধি চিতায় দাও গো জ্বালি। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৭)

†Pvivewj

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে প্রেমের বিপদ চিহ্নিত করতে গিয়ে চোরাবালি-প্রতীক ব্যবহার করেছেন। প্রেমে কেবল নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দই থাকে না, থাকে পদে পদ বিপদের আশঙ্কা। সেই আশঙ্কাকেই চোরাবালি প্রতীকের আশ্রয়ে তুলে ধরেছেন কবি। একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

আমি আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাই
চক্ষের জলে কালি,
আর পাজর ছিঁড়িয়া লিখি এই কথা
পিরীতি যে চোরাবালি। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৭)

So

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ঝড়ের মতো একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে মানুষের অন্তর্গত অস্থিরতাকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।। ঝড়ের বিধক্ষংসী রূপ সম্পর্কে আমরা জানি। কিন্তু মানব মনের অন্তর্গত ভাঙচুর আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। গৌরীপ্রসন্ন মানুষের অন্তর্নিহিত আলোড়নকে ঝড়ের অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। ঝড় যেমন এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত মানসিক দুর্যোগের প্রতিনিধিত্ব করেছে, তেমনি বৃষ্টি উপস্থিত হয়েছে প্রত্যাশিত স্বস্তি ও শান্তির বার্তাবহ হিসেবে। ঝড় প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে এমন আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ক. কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায় গো,
খেলাঘর কেন ভেঙে যায় যায় গো,
সীমার বাঁধনে আমারে বাঁধিতে চাও
যত খেলা মোর নীরবে সাধিতে দাও,
ধুলির যা আছে ধুলিতেই থাক পড়ে
ঝরা মালা মোর রেখে গেনু তব পায় ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৭)

খ. পিছনের পথে উঠেছে ধূলির ঝড়

সমুখে অন্ধকার,
বল তবে ওগো কবে হবে অভিসার।
তৃষিত আশারে কোরোনা গো তুমি ভ্রান্ত। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৮)

†XD

নদী বা সমুদ্রের জলে বাতাসের আলোড়ন যে ঢেউ তোলে সেই ঢেউ-ই কবিকল্পনার মানবমনের অস্থিরতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই ঢেউ কখনো ভালোবাসার তীব্রতাকে প্রকাশ করে, আবার কখনো না-পাওয়ার বেদনাকেও মূর্ত করে তোলে। মনের ইতিবাচক অস্থিরতা প্রকাশ করতে গিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কখনো কখনো ঢেউয়ের অনুষঙ্গ উপস্থিত করেছেন যা চমৎকার প্রতীকী মূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কাঙ্ক্ষিতজনের সান্নিধ্যে মনে যে ঝড় ওঠে, তা চিন্তা ও কল্পনার সমুদ্রে প্রবল আলোড়ন তোলে। এই আলোড়নকে তিনি ঢেউ-প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

ক. মনের কথাটি বলতে পারিনি মুখে
দ্বারে এসে ফিরে গেলে তাই
তোমার আখির ছায়া ছিল এ আখিতে আঁকা
দেখে তবু চেয়ে দেখি নাই
যে নদী গভীর হয়
ঢেউ তাতে নাহি হয়
তাই মোরে চিনিলো না
বুকে এ কি বাধা পাই
এই প্রাণে কেঁদে মরে
না বলা যে কথা
শুধু তীর বেধা পাখি জানে
মোর আকুলতা । (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৪)

খ. এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু
একটি সে নাম,
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে
তারে যেন মুছিয়া দিলাম। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৭)

cwL

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর মনের মানুষকে পাখির প্রতীকে শিল্পিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর গীতবাণীতে অবাধ-উন্মুক্ত-স্বাধীন মনের প্রতীক হিসেবে পাখি-প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। কবিতা-গানে

প্রিয়জনকে ব্যক্তিগত খাঁচায় বন্দি করার ইচ্ছে একটি অতি পুরাতন ও প্রিয় প্রথা বলা যায়। প্রিয়জনের মনের খাঁচায় পাখির মতো বন্দী হওয়ার বাসনাও প্রকাশ করেছেন তিনি। আবার কাছের মানুষ যখন প্রেমের বন্ধন উপেক্ষা করে দূরে চলে গেছে তখনও তা প্রকাশ করেছেন পাখির অনুষঙ্গে। পাখি জীবনের আরো গভীরতর বাস্তবতার স্মারক হয়ে ওঠে যখন তা যাযাবর পাখি হয়ে ওঠে। এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের লেনদেন সম্পর্কেই ইঙ্গিত দেয় যাযাবর পাখি। নিচের উদাহরণে গৌরীপ্রসন্নের ভাবনায় পাখির প্রতীকী প্রকাশ লক্ষ করা যাবে :

এই প্রাণে কেঁদে মরে
না বলা যে কথা
শুধু তীর বেধা পাখি জানে
মোর আকুলতা । (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৪)

C‘XC

কবিতায় গানে প্রদীপ-অনুষঙ্গ বিচিত্র অর্থমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানে প্রদীপ কখনো আলোর উৎস হিসেবে, কখনো জীবনের আয়ু হিসেবে, কখনো-বা প্রিয় মানুষের সৌন্দর্য বা দীপ্তি প্রকাশক অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের স্মারক হিসেবেও তিনি প্রদীপের প্রসঙ্গ তোলেন। মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন প্রকাশের প্রয়োজনে কিংবা প্রিয় মানুষের সৌন্দর্য ও দীপ্তিকে গানে ধারণ করতে গিয়ে পুলক কবি কখনো আবার দীপ অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যা প্রতীকী অর্থদীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই :

ক. আমি আলেয়ার হাতছানি
আমি প্রদীপ নেভাতে জানি,
বিষ ভৃঙ্গারে সুধা শৃঙ্গার
অধরে জানি গো ধরিতে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬৩)

খ. সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ হে তুমি
প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো।
বিষের ভাণ্ড যে হাতে
সেই হাতে তোমার প্রভু অমৃত ঢালো। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০৫)

evjPi

কেন তবু বারে বারে ভুলে যাই– গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে বালুচর-প্রসঙ্গে মানুষের দীর্ঘশ্বাসভারাক্রান্ত জীবনের শিল্পসংহত প্রকাশ লক্ষ করি। কবি উপলব্ধি করেছেন, হতাশা যখন মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, তখন নিজেকে মরুভূমির মতো মনে হয়। তাঁর মনের এই বিপন্ন অবস্থার রূপায়ণে বালুচর প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। চলার পথে যখন আপনজনের অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন তিনি, তখন বালুচরের নিরস-নিঃসঙ্গ অবস্থা তাঁকে হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে। তবু থেমে থাকেন নি তিনি, আপন মনে নিজের পথটিকে রচনা করেছেন। সুন্দর আলোকিত আগামীর জন্য আশায় বুক বেঁধে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। সেই এগিয়ে চলার প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন অতীতের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে। এই জীবনবোধ তাঁর গানে যুক্ত করেছে বিশেষ তাৎপর্য অভিব্যক্তি। 'এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু/একটি সে নাম/আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে/তারে যেন মুছিয়া দিলাম।'– গৌরীপ্রসন্নের এই জনপ্রিয় গীতবাণীতে বালুচর চমৎকার শৈল্পিক আবহ রচনা করেছে :

> আজ মোর কিছু নাই,
> ভুলের এ বালুচরে যে বাসর বাঁধা হলো
> জানি তার নেই কোন দাম। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৭)

b'x

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে নদী-প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রত্যেকটি নদীই ভিন্নতর অর্থমাত্রায় উচ্চারিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলা কবিতা ও গীতবাণীর পাঠক হিসেবে আমরা জানি, মানব জীবনকে নদীর রূপকল্পে চিত্রিত করা একটি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে লোকসাহিত্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। জীবনের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করার উপায় হিসেবে বারবার নদীর উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে লোকগানে। পারাপারের অবলম্বন হিসেবেই শুধু নয়, প্রেমের স্রোতে ভেসে বেড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নৌকা-প্রতীক বেশ শৈল্পিক ঋদ্ধি লাভ করেছে। নদীর সঙ্গে গৌরী নিজের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন। প্রিয়জনের হাত ধরে যে নদীর তীরে এসে তিনি দাঁড়াতে চান, সেই নদীর সঙ্গে জীবনের যোগ নিবিড় বলেই তাঁর গানে পাঠক-শ্রোতা পুলকিত হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক–

> ক. সেই ছেঁড়া খাতার পাতাগুলো
> ফিরে পেতাম যদি
> হয়তো সাগর হত মরুর বুকে
> হারানো এক নদী। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১)

খ. আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগর আর তের নদীর পারে,
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৬)

গ. সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে
মন চায় সেই সুরে হাসিতে,
নদী চায় সাগরে যে মিশিতে
সাগর নদীরে তাই কাছে পায়। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৭)

ঘ. ও নদীরে
একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে।
বল কোথায় তোমার দেশ
তোমায় নেই কি চলার শেষ। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৯)

ågi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর প্রধান অবলম্বন যেহেতু প্রেম তাই এতে ভ্রমরের গুঞ্জনও অনিবার্যভাবে শোনা যাবে। প্রেমের টানে প্রেয়সীর কাছে প্রেমিকের অস্থির আসা-যাওয়ার ছবি ফুটিয়ে তুলতে ভ্রমরের মতো শক্তিশালী প্রতীক বোধকরি খুব বেশি নেই। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক হিসেবে দেখা রোমান্টিক গীতিকবির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের আলিঙ্গনের দৃশ্যে প্রিয়জনকে কাছে পাবার বাসনা যে তীব্রতা লাভ করে, তার পরিচয়ও আমরা বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করার মতো। গৌরীর গীতবাণীতে ভ্রমরের প্রসঙ্গে সেই রূপকল্পই সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়জনের কাছাকাছি থাকার ইচ্ছের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ভ্রমরের আপন মনে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যে, ভ্রমরের পাখনায় ক্লান্তি নেমে এলেও তিনি থাকতে চান ক্লান্তিহীন ভ্রমরের সঙ্গে তিনি যে কথা বলেন, তা আসলে প্রিয়জনকেই বলা যায়। সেই অর্থে ভ্রমর কখনো কখনো প্রেম নিবেদনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর গানে মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষাই চিত্রিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ফুলের কানে ভ্রমর আনে
স্বপ্নভরা সম্ভাষণ
এই কি তবে বসন্তেরই নিমন্ত্রণ? (পৃ. ১৪)

cRvcZ

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে প্রজাপতি-অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে নানা রূপকল্পে। কখনো সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে, আবার কখনো-বা মানুষের সুখকর বন্ধনের বার্তাবহ হিসেবে চিত্রিত করেছেন তিনি। মন

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটিও প্রজাপতির আশ্রয়েই তিনি শিল্পসংহতি দিয়েছেন। আবার ফুলের সান্নিধ্যে প্রজাপতির গায়ে যে কাঁটার আঘাত লাগে তার সঙ্গে প্রেমের পথের প্রতিবন্ধকতার ঐক্য আবিষ্কারের প্রয়াস পান তিনি। উদাহরণটি লক্ষ করা যাক :

> প্রদীপের পায়ে প্রজাপতি তার প্রেম প্রকৃতির নানা উপাদান-অনুষঙ্গ। মানুষের মানবিক অনুভূতির বিশেষ স্তরকে প্রতীকের আশ্রয়ে তুলে ধরার এই প্রয়াস তাঁর গীতবাণীতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

cjK e‡›'¨vcva¨vq

AÜKvi

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় অন্ধকার নানা প্রতীকী অর্থমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্পবোধ ও সমাজমনস্কতা তাঁর যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ থেকে অন্ধকারের বিভিন্ন তাৎপর্য উদ্ধার করেছে। অন্ধকারকে অজানা রহস্যের প্রতীক হিসেবে যেমন ব্যবহার করেছেন তিনি, তেমনি অন্ধকারে অন্ধকার ঘষে আলো জ্বালানোর তপস্যাও তাকে প্রণোদিত করেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। পুলকের গানে অন্ধকার কেবল হতাশা ও প্রতিবন্ধকতার সঙ্কেত হিসেবেই নয়, কখনো কখনো তা ব্যবহৃত হয়েছে আলোর জন্য অপেক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবেও। কয়েকটি উদাহরণ দেই –

ক. আলোর বন্যাধারা
ভাঙুক অন্ধ-কারা
মুক্ত হাওয়ায় হৃদয় নিল যে ভরা নিশ্বাস ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯/৪)

খ. আমি যে আঁধারে নিজেকে ঢাকি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৪/১৫)

গ. পথ চেয়ে ছিনু যবে
হলো না সময়
আঁধারে প্রদীপ মোর
নিল পরাজয় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৫/১০২)

ঘ. আমার এ অন্ধকারে কত রাত কেটে গেলো
আমি আঁধারেই রয়ে গেলাম (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৮৮/১২৬)

পুলকের গানে অন্ধকার কখনো কখনো দুঃসময়ের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখি। অন্ধকার পার হয়ে এমন এক সময়ে কবি পৌঁছাতে চান যেখানে সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার মহৎ আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। কবি অন্ধকারকে আলোর জন্মদাতা হিসেবেও চিত্রিত করেছেন। অন্ধকারের চোখে আলোর হাতছানি কবিকে আশান্বিত করেছে। অন্ধকারের এই সৃজনীশক্তি চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। অন্ধকারের বহুবর্ণিল উপস্থাপনায় তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তার প্রকাশ যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

জীবনদৃষ্টির দূরসঞ্চারী বৈশিষ্ট্যও তাতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনার স্পর্শে অন্ধকার এভাবেই বিচিত্র অর্থমাত্রায় দ্যোতনা লাভ করেছে।

AvKvk

মানবমনের বিশালতা এবং বৈচিত্র্য বোঝাতে আকাশ-প্রসঙ্গ ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবে চর্চিত হয়ে আসছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ধারাবাহিকতায় আকাশ-প্রতীক ব্যবহার করে তাঁর গানকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সৃজনশীল মনের উদারতাও আকাশ-প্রসঙ্গে নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে। কল্পনার পাখা বিস্তারের অবাধ ক্ষেত্র হিসেবেও আকাশ-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে পুলকের গানে। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড়ের ঘুমিয়ে থাকার ছবি কাজী নজরুল ইসলামের গানে চিত্রিত হয়েছে। পুলকের গানেও সেই রকম আকাশের বিস্তার ও বৈভব লক্ষ করার মতো। উন্মুক্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি কখনো কখনো মানুষের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের কথা বলেছেন, কখনো বা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আপনমনে উড়ে বেড়ানোর কথাও বলেছেন তিনি। কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক–

ক. তুমি দিলে সে কথা   পাখী নিয়ে গায়
আকাশের নীল স্বপ্নে   আলো হয়ে যায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪/১১)

খ. যদি আকাশ হতো আঁখি
তুমি হতে রাতের পাখী
উড়ে যেতে যেতে আবার কোথাও
দেখা হতো নাকি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৪/১৫)

গ. সব পাখীরা একে একে
ফিরে এলো আকাশ থেকে
দুটি পাখীর আলাপ শুধু হয়নি অবসান!
চলার পথের গান
আমার বেলা শেষের গান! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৮/২২)

আকাশ-প্রতীক পুলকের গানের বাণীকে যেমন বিচিত্র ভাব ও অভিজ্ঞতার দ্যোতনা দিয়েছে, তেমনি তাঁর প্রেমানুভূতির প্রকাশকেও করে তুলেছে দূরসঞ্চারী এবং বর্ণীল চৈতন্যের স্মারক।

Av¸b

আগুন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে বিচিত্র অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কখনো আগুনের পরশমনি আবার কখনো-বা তার বিধক্ষংসী রূপ তাঁর গানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

কখনো সৃষ্টির উল্লাসে তিনি আগুনের উত্তাপ অনুভব করেছেন, আবার কখনো-বা আগুন এসেছে নিজের ভেতরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার প্রেরণা হিসেবে। প্রতিহিংসার যন্ত্রণাকে তিনি আগুনের সঙ্গে একীভূত করেন: ' হিংসা আগুন হয়ে যত বুকে জ্বলে উঠে/মুখে হাসি খুঁজে মরে স্বপ্নবেলা' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩২/১৫), আবার কখনো কখনো বিধ্বস্ত মনের বিহ্বলতাকেও তিনি আগুনের বিধ্বংসী বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নেন : 'মন ভেঙে যার সব একাকার/ ফাগুনে আগুন ঝরে যায়/ আকাশ ভেঙেই পড়ে যায়/দুঃখ কেন বাজবে গো তার/এ-ঘর ভেঙে পড়াতে?' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯২/৪৩)। চোখের জলই শুধু কাম্য নয় তাঁর, কখনো আবার চোখের আগুনে ভস্মিভূত করতে চান তাঁর প্রিয়জনের মনের জটিলতাকে। দুঃসময়ের রূপকল্প হিসেবেও আগুন-প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখি তাঁর গানে। আবার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির গুরুত্ব বা সৌন্দর্য বা গুণের প্রসঙ্গেও তিনি আগুনের প্রসঙ্গ টানেন : 'আমার ফুলের বনে আগুন তুমিই/আমার প্রাণের দীপে আগুন তুমিই' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৩/৪৮)। দুঃখ ভোলানো স্নিগ্ধ-মধুর গান হিসেবেও আগুন এসে উপস্থিত হয়েছে তাঁর বাণীতে। এভাবেই তিনি আগুনকে নিজের ইচ্ছের মাপে তৈরি করে নেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি :

ক. গানের আগুন জ্বালা নয়ন তারা
দেখে দেখে এই চোখ আপন হারা (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪০/৬৬)

খ. ওকে ওরা আগুন বলে আমি বলি বরষা
ওকে ওরা প্রলয় বলে আমি পাই ভরসা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১২/১০১)

গ. সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলেছো
ফুলের আগুন তুমি জ্বেলেছো
ফাগুনের সব কেড়ে নিয়েছো
স্মৃতিটুকু কেন তার কাড়োনি? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২১/১০৫)
আমি অনেক দূরের আগুন হয়েই বেশ ছিলাম
কেন যে কাছে এসে তোমার মনে ছড়ালাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১/১৭১)

এভাবেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে আগুনের প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে গানের বাণীকে দূরসঞ্চারী করে তোলেন।

Av‡jqv

অধরা বিষয় বা বস্তু অধিকার করার প্রয়াসকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আলেয়া প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মানুষের মনের গোপন-গভীর প্রদেশকে জয় করার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখনি তিনি আলেয়ার অনুষঙ্গে সেই ব্যর্থতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। মানুষের জীবনের অপ্রাপ্তির কিংবা অতৃপ্তির

শেষ নেই। সেই অচরিতার্থতা যখন অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনি তাঁর জীবনভাবনা একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। একটি উদাহরণ লক্ষ করি :

যে-আশা হয়েছে জানি মিছে
শুধু আলেয়ার পিছে পিছে
সমব্যথা দিয়ে তারে দেখোনা !! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪/৬)

K‡cvZ K‡cvZx

কপোত কপোতী শান্তিময় প্রেমযাপন বা দাম্পত্যজীবনের প্রতীক হিসেবে লোক-অভিজ্ঞতায় গ্রহীত হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লোকবিশ্বাসকেই তাঁর গানের বাণীতে ধারণ করেছেন। কপোত কপোতীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মানবমনের কাঙ্ক্ষিত আরামদায়ক জীবনের তৃষ্ণা প্রবলতর হয়েছে। তাই এই প্রচলিত প্রতীকটিকে তিনি শৈল্পিক ঋদ্ধি দান করেছেন :

কপোতের বুকে ওই সুখে কপোতী ঘুমায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬৩/৭৭)

Kv‡jv

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে গানের বাণীতে ধরতে দিয়ে জীবনপথের বাধা-বিঘ্নকেও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। কালো সেই প্রতিবন্ধকতাসমূহকেই মূর্ত করে তুলেছে। বাধা অতিক্রমণের প্রয়াস যেমন তাতে উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি আবার কালোর সৌন্দর্যও তাতে ধরা পড়েছে কখনো কখনো। তিনি যখন বলেন : 'তুমি আঁধার দ্যাখো/নীল আকাশে চাঁদকে যখন ওই কালো মেঘ ঢাকে এসে/আমি আঁধার দেখি/চাঁদ মুখে ওই আনলে আড়াল মেঘলা বরণ কালো কেশে!' (৩০/১৩), তখন কালো যেমন সুন্দরকে উপভোগ করার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে এসেছে, তেমনি কালো চুলের সৌন্দর্যও এতে ধরা পড়েছে। সঙ্গীতের সুমধুর বাণীতে কালো তাই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনভাবনার বিচিত্র দিককে প্রতীকী বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. ও-কালো রূপের ছটা
চোখে আনে আলো
কালো রূপ দেখে (ওই কৃষ্ণ রূপ দেখে দেখে)
আঁখি হলো কালো
কী হবে নয়নে আর কাজল পরে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫১/২৩)

খ. গলাতে গাড়ের মালাগাঁথোনা যুঁইফুলে
রূপোর এক কাজললতা রাখোনা কালো চুলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৩/৩৩)

গ. ওই কালো দুটি চোখে

কিছু কথা বলে গেলো কে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৪/৩৩)

ঘ. কী দেখি পাইনা ভেবে গো

ওই মেঘের কালো বরণ

নাকি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৮/৩৫)

KvUv

ফুলের প্রতি যাদের টান আছে তারা কখনো কাঁটার আঘাতে হতাশ হয় না। দুঃখ ছাড়া কখনো সুখ লাভ করা যায় না। সুন্দরকে নিজের করে পেতে হলে তা অর্জনের পথে যে-সব বাধা আছে তাকে ভয় পেলে সুন্দরের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের কষ্টসাধ্য অভিযাত্রাকে কাঁটার প্রতীকী প্রতিবন্ধক হিসেবে শিল্পিত করেছেন। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

হার মেনে যদি মেলে রত্নমালা

জয় করে চাইনা এ-কাঁটার জ্বালা (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২/১০)

ক. ক' ফোটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি

ভালোবাসবে?

পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে

কী করে এখানে তুমি আসবে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৯/৪১)

খ. ফুলশয্যার সব ফুল যার ভুল হয়ে ঝরে যায়

কাঁটায় শয্যা ভরে যায়

বলো আসবে যাবে এমন কী তার

খোঁপার পদ্ম ঝরাতে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯২/৪২)

যে জীবন আমরা যাপন করি তা কখনো আনন্দে প্লাবিত হয়, কখনো-বা দুঃখের স্রোতে হাবুডুবু খাই। এই দুঃখ-সুখের দোলায় ভেসেই মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছে যায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সেই বাস্তব প্রেক্ষিতকেই কাঁটার প্রতীকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

†KwKj

কোকিল গানের পাখি। তাই গানে কোকিল-প্রসঙ্গ অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোকিলের সঙ্গে কথোপকথনে আমরা আমাদের নিজের কথাগুলোকেই অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস পাই। আবার ঘরহীন মানুষের প্রতীক হিসেবেও কোকিল গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম দেয়ার কাহিনী তাই কবিতায়-গানে ঘুরেফিরে এসেছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেন : 'ও কোকিলা তোরে

শুধাইরে/সবারই তো ঘর রয়েছে/কেনরে তোর বাসা কোথাও নাইরে?’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১/৯), তখন ছিন্নমূল মানুষের বেদনাই মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার কাছের মানুষকে হারিয়ে নিজের মধ্যে সান্তনা খুঁজতেও কোকিলের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি : ‘আর ডেকো না/ও কালো কোকিল তুমি আর কেঁদো না/যে গেছে যাকনা তারে অমন আকুল সুরে/পিছু ডেকো না!’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৫/৩৯)। যে কোকিল চৈতী হাওয়ার কথকতায় মগ্ন তার বক্তব্যের তাৎপর্যও লেখকের সঙ্গীতভাবনায় যুক্ত করে নতুন ব্যঞ্জনা। তিনি প্রশ্ন করেন, ‘কোকিল কখনো কথা কয়?’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৫/৭৩)। আসলে কোকিল নিজের কথা বলার সুযোগ পায় না, আমরা আমাদের ভাবনাকেই কোকিলের কণ্ঠে বসিয়ে দিতে ভালোবাসি। কোকিল বা কোকিলের কণ্ঠ বসন্ত ঋতুর প্রতীক হিসেবেও ব্যবহার করেছেন তিনি। এভাবেই নানা অনুষঙ্গে কোকিল ব্যবহৃত হয়ে তা প্রতীকী মূল্য লাভ করেছে :

ক. ও পলাশ ফিরে চেয়োনা
ও কোকিল তুমি গেয়োনা
লাজুক লতা হয়তো গো লাজ পাবে
তার মুখের কথা মুখেই রয়ে যাবে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৯/৭৫)

খ. যাই যাই করে শীত যায়নি
কোকিলরা সবে গলা সেধেছে
তখনো কোথাও গান গায়নি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪২/১১১)

গ. কুঞ্জ কোকিলা পঞ্চম রাগে রাঙা মিতালীর সুর তোলে
রাঙা ফুলে ফুলে সুরে দুলে দুলে রঙিলা ভ্রমরা কথা বলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪২৩/১৭৬)

ঘ. পলাশ ডালে ফুল ধরে কি কোকিল পাখী না-এলে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫০৮/২১৩)

ঙ. বানানো সে ফুল দিয়ে
সাজালে ফাগুন কোকিল কি গান কভু গায়? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩০০/৩০১)

†LjvNi

ক্ষণস্থায়ী জীবনের অপ্রাপ্তি বা অচরিতার্থতাকে রূপায়িত করতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাঘর প্রতীক ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীতে মানুষের স্বপ্ন বা ইচ্ছের কোন সীমা নেই। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সময় খুবই অল্প। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের Kwe উপন্যাসে কবিয়াল নিতাই যখন স্বপ্লায়ু জীবনের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করে আক্ষেপ প্রকাশ করেন–

এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ– কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০০২/ ১০৮)

তখন নিতাই কবিয়ালের বেদনা পাঠককে একটি দার্শনিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। নিতাইয়ের প্রিয় মানুষ বসন্তের প্রতি তার ভালোবাসা আকাশে বাতাসে বিস্তৃত হয়ে সবাইকে প্রেমাকুল এবং বেদনাবিহক্ষল করে তোলে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে খেলাঘরের সঙ্গে তুলনা করে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভালোবাসার অতৃপ্তিকেই শৈল্পিক ঋদ্ধি দান করেছেন ।কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

ক. অধর কোণে কাঁদে 'বলি বলি' করে
সত্যি হওয়ায় স্বপ্ন কাঁদে আশার খেলাঘরে
বিধিলিপি লেখায় কাঁদে জীবন-মরণ ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩/৬)

খ. তারা সব ফিরে এসে জানায় যে অনুরোধ
সেই খেলাঘরখানি সৃষ্টি করার। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৬/১৬)

গ. কবে আছি কবে নেই
এই ধরণীর খেলাঘরে
এই কটা দিন গেয়ে যেতে দাও
শুধু গান প্রাণ ভরে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮০/৩৬)

P\ '

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে চাঁদ রোমান্টিক ভাবকল্পের অনুষঙ্গেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালির স্বপ্ন-কল্পনার সঙ্গে চাঁদের ঘনিষ্টতা প্রাচীন যুগ থেকে সমাদৃত বলেই আমাদের জীবন ও সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বারবার চাঁদ এসে উপস্থিত হয়েছে। লোকজীবনের অভিজ্ঞতাকে আমাদের লোককবিরা যখন গীতিকায় ধারণ করেছেন, তখনও অবলীলায় চাঁদকে সঙ্গী করেছেন। গীতিকায়ও সর্বাধিক সংখ্যক চাঁদ প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। লোকজীবনকেন্দ্রিক ওই সব 'গীতিকায় মানবদেহের সৌন্দর্য, দেহের উজ্জ্বলতা, দুর্লভ সৌন্দর্য বা দুর্লভ সামগ্রী, মুখের সৌন্দর্য প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য চাঁদের বিভিন্ন প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চাঁদের অবস্থান মর্ত্য থেকে অনেক উপরে। এ কারণে এর সৌন্দর্য দুর্লভ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই কখনো কখনো সুন্দর চাঁদ উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণীর আভিজাত্যেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে।' (মোঃ শাহনেওয়াজ রিপন ২০০৮ : ৫৯)। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় মানুষকে চাঁদের সঙ্গে মিতালী গড়ে তোলার আহক্ষান জানিয়ে বলেন : 'মিষ্টি চাঁদ কথা বলতে জানে/তুমি শুনতে পেলেনা!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫/১১), আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যকেও চাঁদের নৌকায় তুলে দিয়ে তীরে বসে তার আন্দোলন উপভোগ করেন তিনি : 'হাজার তারা আসমানে/জ্বালায় বাতি সেই গানে/রূপ-দরিয়ায় জ্যোছনা দোলে/চাঁদের পরীর নাও ছোটে ॥' (পুলক

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪২/১৯)। প্রেমানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ চাঁদ-অনুষঙ্গে চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে পুলক বন্দ্যোপাধায়ের গানে :

ক. কিছু করলে চুরি নষ্ট চাঁদের দুষ্টু তিথি থাকলে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৩/২৪)
আমি দেখি চাঁদের আলো
তুমি দ্যাখো কলঙ্ক (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৯/২৭)

খ. পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে ওই
হংসুটে চাঁদ থাকনা চেয়ে থাক! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭১/৩২)

গ. চৈতালী চাঁদ যাক যাক ডুবে যাক
গহন আঁধারে রাত থাক থাক ভরে থাক (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৭/৫৯)
এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো!
সেই চাঁদের পাহাড় দেখতে পাবো! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৭/৩৭৫)

ঘ. আকাশের চাঁদ চাই না বাবু চাই পরাণের ভালোবাসা
সেই আশাতেই এ-গান নিয়ে তোমাদের এই ঘরে আসা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৮০/২০০)

ঙ. যে সুন্দর চাঁদের মতো
তার ধার করা জ্যোছনার কী প্রয়োজন? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৩৮/২৭৪)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে পুলকের শিল্পবোধ এবং সৌন্দর্যভাবনা চাঁদ-প্রতীকের আশ্রয়ে দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। প্রিয় মানুষের বাইরের সৌন্দর্যই কেবল নয়, তার অন্তর্গত অভিব্যক্তিকেও পাঠক-শ্রোতার চৈতন্যের সীমায় নিয়ে এসেছেন তিনি। এভাবেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদ গানের বাণীকে প্রাণের বীণায় পরিণত করেছে।

\PZv

মানুষের দুঃখ-বেদনা যখন সাধারণ বর্ণনায় ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন চিতার অগ্নির সঙ্গে ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে তুলনা করা হয়। চিতা সেই অর্থে মানুষের অদৃশ্য কষ্টযাপনের প্রতীক হিসেবে শিল্পসাহিত্যে গৃহীত হয়ে থাকে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় চিতা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেই বর্ণনাতীত বেদনাকেই শিল্পসংহতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানের প্রতি গভীরতর প্রেম ও মমত্ব প্রকাশ করে বলেছেন :

তোমার কাছে এ বর মাগি,
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন

মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০০৪ / ২০৮)

আজীবন গানের বাণী রচনায় নিবেদিত শিল্পী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও গানকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিজের বেঁচে থাকার সার্থকতা অন্বেষণ করেছেন। তাই প্রিয় মানুষের অনাদর-অবহেলা উপেক্ষা করে গানকেই শিরোধার্য করেছেন তিনি। চিতার আগুনের প্রতীকী-প্রকাশে তিনি তাঁর গানের গৌরবদীপ্ত উপস্থিতিকে আবাহন করেছেন :

চিতার আগুনে আমাকে পোড়াতে পারবে
সাদা ছাইগুলো বাতাসে ওড়াতে পারবে
আমার গানকে পোড়াতে পারবে না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৬৭/২৪১)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জীবনে তাঁর গানের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই, ব্যক্তিগত যন্ত্রণার শেষ পরিণাম মৃত্যু সম্পর্কে চিতার আগুন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে সবার জন্য রেখে যাওয়ার কথা বলেন।

So

ঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঝড়ের বিধক্ষংসী রূপ সম্পর্কে আমরা অবগত হলেও মানবমনের অন্তর্গত ভাঙচুর সম্পর্কে আমরা সব সময় জানতে পারি না। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্ত র্নিহিত আলোড়নকে ঝড়ের অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাই কাছের মানুষ যখন ভুল বুঝে দূরে সরে যেতে চায় তখন তিনি সাময়িক অস্থিরতা কেটে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে তাকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন : 'না যেয়ো না তুমি যেয়ো না/থামবে এ-ঝড় থামবে/এখনি বৃষ্টি নামবে/রুক্ষ এ-দিন শেষ হবে' (৬৪/২৯)। ঝড় যেমন এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত মানসিক দুর্যোগের প্রতিনিধিত্ব করেছে, তেমনি বৃষ্টি উপস্থিত হয়েছে প্রত্যাশিত স্বস্তি ও শান্তির বার্তাবহ হিসেবে। ঝড় প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে এমন আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. দুস্তর দিকহারা মরু সাহারা
ঝড় যদি আনেই বয়ে
তবু তুমি পাশে থেকো আমারই হয়ে ! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৭/৫৯)

খ. আমি ঝড়ের মুখে শপথ পেয়ে সর্বনাশের
নতুন পাতা উল্টে পেলাম ইতিহাসের
আমি নতুন আকাশ খুঁজে পেলাম

সূর্যের সন্ধানে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৪/৯৭)

গ. কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেলো

সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেলো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪১০/১৭১)

পুলকের গানে মানসিক অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা আরো তীব্রতর হয়েছে যখন তিনি কালবৈশাখী ঝড়ের উল্লেখ করেছেন। বৈশাখের ঝড়ে যেমন জীবন ও পরিবেশের বাহ্যিক বাস্তবতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনি কোন কোন সময় মানসিক অস্থিরতাও একজন মানুষকে বিকল করে দিতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়েকটি গান থেকে উদাহরণ দেয়া যাক :

ক. সময় যে কখন থমকে দাঁড়ালো

কাল বোশেখীর মাসে

কী যে করে মন জানেনা এখন

ঝড়ের পূর্বাভাসে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৪/২০)

খ. তোমায় আমায় প্রথম দেখা গানের প্রথম কলিতে

বৈশাখী এক দমকা হাওয়ায় খেয়ালী পথ চলিতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৩/৩৮)

ফাগুন এসেও অজান্তে আজ

হলো কি বৈশাখী ?? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩০/৬১)

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়কে সব সময় নেতিবাচক অনুষঙ্গের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন নি। প্রিয়জনকে কাছে পেলে মানুষের মনে যে অস্থিরতা উপস্থিত হয়, তার প্রকাশও কখনো কখনো ঝড়ের-প্রতীকে চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহেও তাঁর এই প্রেমাকূল প্রকাশের ঝড়ো-রূপ লক্ষ করার মতো।

†XD

মনের ইতিবাচক অস্থিরতা প্রকাশ করতে গিয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো কখনো ঢেউয়ের অনুষঙ্গ উপস্থিত করেছেন যা চমৎকার প্রতীকী মূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কাঙ্ক্ষিতজনের সান্নিধ্যে মনে যে ঝড় ওঠে, তা চিন্তা ও কল্পনার সমুদ্রে প্রবল আলোড়ন তোলে। এই আলোড়নকে তিনি ঢেউ-প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি হয়েছি কেন খুশী

খুশী বিনা কারণে

কেন ঢেউ তোলে কেন দোলে হিল্লোলে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১/১)

c¶xivR

রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। নিজের কল্পনার গতিবিধি ও বিস্তার নির্দেশ করার অনুকূল অনুষঙ্গ হিসেবে পক্ষীরাজের উল্লেখ বেশ অর্থবহ ব্যঞ্জনা পেয়েছে। বাস্তব জীবনের বাঁধা ছক থেকে বেরিয়ে অবাধ-উন্মুক্ত এক জগতে প্রবেশের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রতীক। পক্ষীরাজ এই গীতিকবির সৃজনভাবনার বিশালতাকে নতুন মূল্য দিয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

খেয়ালের পক্ষীরাজে চড়ে
বাঁধা ছক দাওনা বদল করে
সে ক'দিন ভুলেই থাকো সকল অবিশ্বাস ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬/৫৯)

cwL

অবাধ-উন্মুক্ত-স্বাধীন মনের প্রতীক হিসেবে পাখি-প্রসঙ্গ ব্যবহার করায় পাখি প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো কখনো তাঁর মনের মানুষকেও পাখির প্রতীকে শিল্পিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রিয়জনের মনের খাঁচায় পাখির মতো বন্দী হওয়ার বাসনাও প্রকাশ করেছেন তিনি। আবার কাছের মানুষ যখন প্রেমের বন্ধন উপেক্ষা করে দূরে চলে গেছে তখনও তা প্রকাশ করেছেন পাখির অনুষঙ্গে। নিচের উদাহরণগুলোতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় পাখির বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যাবে :

ক. দেহেরই পিঞ্জিরায় প্রাণপাখী কাঁদে
প্রাণেরি পিঞ্জিরাতে মন
মনেরি পিঞ্জিরায় আশা কাঁদে সারাক্ষণ! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩/৬)

খ. লাজুক মিতা তোরে ডাকি
পুষবি নাকি বুনো পাখি
রাঙা মনের তাপ নিতে
বিবশ হিয়ার সাধ হলো !! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০/৯)

গ. এ-মন ভরা যতো কথা বলার ছিলো
সবি তো সেই পাখি বলে দিলো;
আমি ফিরে চেয়ে দেখি পারোনি আমায় বুঝতে
তুমি পাখীর কণ্ঠে চাওনি সে কথা খুঁজতে
চলে গেছো তুমি উড়ে গেছে পাখী শুধু আছে হাহাকার! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪১/১৯)

ঘ. মন-পাখীরে অমন করে কেউ কি ধরে রাখে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৬/৩০)
ওই যে নিশাচর দুষ্টু পাখীটায় ডাকছে দোসর পাখী

সাড়া কি দেবেনা যদিগো তোমাকেও এমনি করে ডাকি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭১/৩২)

ঙ. দূরের আকাশ ভোলে যে সুর

পাখী তা ভোলে না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯৬/৪৪-৪৫)

পাখি জীবনের আরো গভীরতর বাস্তবতার স্মারক হয়ে ওঠে যখন তা যাযাবর পাখি হয়ে ওঠে। এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের লেনদেন সম্পর্কেই ইঙ্গিত দেয় যাযাবর পাখি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করার প্রয়োজনে এই প্রতীক ব্যবহার করেছেন :

ক. ওই যে যাযাবর পাখী পাখা মেলে

পালকে কিছু লিখে দিয়ে গেলো ফেলে

ওখানে ভেসে গেছি ও দলে মিশে গেছি

কাউকে পিছু ডাকি না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫০/২৩)

খ. যাযাবর পাখির পাখায়

নয়নের নেশা উড়ে যায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৯/৯৪)

পুলকের গানে যাযাবর পাখিই শুধু নয়, এসেছে শুকপাখির প্রসঙ্গও। রূপকথায় এই শুকপাখিকে বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি, সেই শুকপাখি এই গীতিকবির গানে উপস্থিত হয়েছে তাঁর প্রিয়তমার রূপকল্পে। যে পাখিকে কবি সোনার শিকলে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছেন, সেই পাখির সকল বন্ধন ছিঁড়ে উড়ে যাওয়ার বর্ণনায় তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনাই বিধৃত হয়েছে :

সুখ নামে শুকপাখীটায় ধরতে গিয়ে

কিনেছি সোনার খাঁচা

যা কিছু সব বিকিয়ে

সোনার শিকল কেটে হায়

সে-পাখী আমার যায় উড়ে যায়

ভাবিনি সেই সে-আশার এই পরিণাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭/৮)

C'¨C

প্রদীপ কখনো আলোর উৎস হিসেবে, কখনো জীবনের আয়ু হিসেবে, কখনো-বা প্রিয় মানুষের সৌন্দর্য বা দীপ্তি প্রকাশক অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে। আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের স্মারক হিসেবেও তিনি প্রদীপের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি যখন বলেন : 'আকাশে প্রদীপ জ্বলে/অন্তরে আলো আমি পাই॥' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬/৭), কিংবা 'সাধের প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে/নিজেই আমি পুড়ে গেলাম!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭/৮); তখন তাঁর গানে প্রকৃতি এবং প্রিয়জন একাকার

হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো চৈতন্যের প্রকৃত প্রদীপের সঙ্গে রূপকথার আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও প্রযুক্ত করে দেন তিনি : ‘ নাচছি তা-ধিন্ তা-ধিন্/সোনার প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘুরছি আলাদীন’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬১৩/২৬৩)। প্রদীপ-অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে তা প্রতীকী মাত্রা লাভ করেছে এমন আরো কিছু উদাহরণ :

ক. সাধের প্রদীপ আমি জ্বালায়ে রাখি
সে-আলোয় পথপানে চেয়ে থাকি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯/৯)

খ. মরমে প্রদীপ শিখা যতই জ্বেলেছি
ততই সে মোরে দিল যে ধাঁধিয়ে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৯/৩৬)

গ. আমি পথ হারাবো একটি প্রদীপ নিয়ে
যে-দীপ জুড়ে তোমার আলো জাগে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৬/৯৩)

ঘ. প্রদীপের পিছনে যে ছিনু ছায়া সমতুল !! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৮/৯৯)
প্রদীপের-ই শিখা ও রূপসী নারী

ঙ. আমি যে পতঙ্গ পুড়ে পুড়ে মরি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৪১/২৭৫)
প্রদীপটা কাঁপছে নিভে যাবে হয়তো

চ. এ তোমার ভালোবাসা নয়তো। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৫৯/২৮৩)

মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন প্রকাশের প্রয়োজনে কিংবা প্রিয় মানুষের সৌন্দর্য ও দীপ্তিকে গানে ধারণ করতে গিয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো আবার দীপ অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যা প্রতীকী অর্থদীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. তোমার ভুবনে তুমি আলোর প্রভাত দিয়েছো
আঁধার সেও তো তুমি দাও
তুমি আবার দীপ জ্বালাতে শেখাও! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৫/২০)

খ. দীপের গরব বাড়িয়ে
কত শিখা গেছে হারিয়ে
কত মেঘ ঝরে গেছে গো
আকাশে নীলাভা লাগাতে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪৯/৭১)

গ. দীপ ছিল শিখা ছিল
শুধু তুমি ছিলে না বলে আলো জ্বললো না (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৬৫/১৯৫)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রদীপ বা দীপের পরিবর্তে মণিদীপ প্রতীক ব্যবহার করেন তখন তা আবার ভিন্নতর অর্থদীপ্তি লাভ করে : ‘চোখের স্মৃতির মণিদীপ/মনের আলোয় কভুকি নেভে?’ (পুলক

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৬/৩৯), কিংবা 'নিজ হাতে মণিদীপ নিভায়ে/আবার নিজেই দিলে জ্বেলে !' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৩/৬২)। এভাবে প্রদীপ, দীপ কিংবা মণিদীপ প্রতীক পুলকের গানকে দূরাভিসারী ব্যঞ্জনা দান করে।

ejvKv

মানুষের মনের নিষ্কলুষ অবস্থা যেমন বলাকা প্রতীকের আশ্রয়ে মূর্ত হয়, তেমনি তা মানবচৈতন্যের বাঁধাবন্ধনহীন অবস্থাকেও রূপায়িত করে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গানের সুরের অবাধ উড্ডয়নকে বলাকার আকাশভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার তাঁর গানে আকাশের সঙ্গে পাখির সম্পর্কের মাত্রা নির্দেশ করতেও বলাকার উল্লেখ লক্ষ করা যায়। আকাশ ও বলাকা তখন গীতিকবির সঙ্গে তাঁর প্রিয়জনের বন্ধনকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছে। আবার মনের মানুষকে আকাশ ভেবে নিজে বলাকা হয়ে উড়ে বেড়ানোর ইচ্ছেও পোষণ করেছেন তিনি। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি :

ক. এই সুর বলাকা মেলে পাখা আপন অনুরাগে
কেন সে মানে না সুদূর তাকে ডাক দিয়েছে আগে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫/১০)

খ. কোনোদিন বলাকারা   অতোদূরে যেতো কি
ওই আকাশ না ডাকলে?
তাই বলি কোনো বাঁশি   সুর খুঁজে পেতো কি
কারো নূপুর না থাকলে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৫/৩৪)

গ. তুমি, আকাশ এখন যদি হতে
আমি, বলাকার মত পাখা মেলতাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৮/৯৪)

evjPi

হতাশা যখন মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, তখন নিজেকে মরুভূমির মতো নিরস এবং নিঃসঙ্গ মনে হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের এই বিপর্যস্ত অবস্থার রূপায়ণে বালুচর প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। চলার পথে যখন আপনজনের অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন তিনি, তখন বালুচরের নিরস-নিঃসঙ্গ অবস্থা তাঁকে হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে। তবু থেমে থাকেন নি তিনি, আপন মনে নিজের পথটিকে রচনা করেছেন :

ক. দুরাশার বালুচরে
একা একা আজো গান গাই
প্লাবনের ঢেউ আসে
তবু আমি ঘর বেঁধে যাই (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬/৭)

খ. বালুচরে থেমে যাওয়া তরণী

কোনখানে ভেসে ছিল

কোন তীরে এসেছিল

লিখে যাবো কত সেই স্মরণী (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭৩/৮২)

সুন্দর আলোকিত আগামীর জন্য আশায় বুক বেঁধে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। সেই এগিয়ে চলার প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন অতীতের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে। এই জীবনবোধ তাঁর গানে যুক্ত করেছে বিশেষ তাৎপর্য অভিব্যক্তি।

বালুচরের প্রসঙ্গে মরুভূমি বিষয়টিও বিবেচনা করা যায়। পুলকের গানে মরুভূমির ব্যবহার শিল্পসংহতি লাভ করে প্রতীক হয়ে উঠেছে। নিচের দৃষ্টান্তেআমরা লক্ষ করবো, মরুভূমি ও বালুচর কবির একই অভিব্যক্তিকে ধারণ করেছে :

ক. মরুভূমি
দেখেছো কোথাও তুমি
মালতীর প্রিয় হয়েছে গো মরুভূমি (১৬৪/৭৮)

খ. আমার এ-পথে শুধু
আছে মরুভূমি ধূ ধূ
আমি   কী ভাবে বাঁচাবো তোমার মাধমী ওই! (১৬৬/৭৯)

e›`vebb

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরাণিক অনুষঙ্গকেও তাঁর গানে প্রতীকী তাৎপর্য দিয়েছেন। শিল্পভাবনার স্বাতন্ত্র্যের গুণেই বৃন্দাবন প্রসঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তি দূরাভিসারী হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবন 'মথুরার তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বাম তটে অবস্থিত নগর ও বন। স্বনামখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের নিহত করেন। তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।' (সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪১২ : ৩৬৬)। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃন্দাবন এবং রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ চমৎকার প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যবহার করে তাঁর গানকে অভিনব ব্যঞ্জনা দিয়েছেন :

ক. বাঁশি তুমি বৃন্দাবনেই বেজো
রাধারানীর রাখাল রাজাই সেজো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭৯/৮৫)

খ. আবার দুজনে দেখা   যমুনার কিনারে
না না বৃন্দাবনে নয়   নয় ওই ব্রজপুরে
তার চেয়ে কিছু দূরে   কুতুবের মিনারে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪২/১১১)

গ. আমার এই শ্যামটি ছাড়া

শূন্যপুরী এই ব্রজধাম !! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫১৭/২১৭)

ঘ. এদেশে নেই মথুরা নেই দ্বারকা

শুধু বৃন্দাবনের ছড়াছড়ি (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৪৭/২৩১-৩২)

ঙ. এসেছে তোমার রাধা

মঞ্জুল মধুবনে

নিরিখি শ্যামল শশী বৃন্দাবনে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৫৭/২৩৬)

একই বক্তব্যের অনুকূলে কবি যমুনা অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর প্রেমভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'যমুনাতে ঘাট না পেলেও/ডুব দিতে তার কী ক্ষতি/নয়ন জলের যমুনাতেই/ভাসায় যাকে নিয়তি' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯২/৪২)– এই অভিব্যক্তি বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে কানাই বা শ্যামের আড়ালে নিজের প্রেম নিবেদনের প্রতিষ্ঠিত রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিচের উদারহরণটি থেকেও বৈষ্ণবীয় ভাবনার আড়ালে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমাভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যাবে :

যমুনার জল ঘুলিয়ে কথাতে রং ফলিয়ে

যতই রটাও মন্দ নাম

তবু সে তেমনি রবে কিছুনা বদল হবে

বুকের মাঝেই থাকবে আমার শ্যাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫১৭/২১৭)

b'x

মানব জীবনকে নদীর রূপকল্পে চিত্রিত করা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে লোকসাহিত্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। জীবনের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করার উপায় হিসেবে বারবার নদীর উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে লোকগানে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নদীকে সেই অর্থেই গ্রহণ করেছেন। সময়ের বহমানতা চিহ্নিত করার জন্যও এসেছে নদীর প্রসঙ্গ। পুলক প্রিয়জনের সঙ্গে নিজের দূরত্ব নির্দেশ করতেও শরণ নিয়েছেন, নদীর পূর্ণতার পাশে নিজের শূন্যতাকে চিত্রিত করেন : 'একটু পরেই ওই নদী কূলে কূলে জোয়ার পেলো/ একটি সাগর জলরঙে ওই ছবি রাঙিয়ে গেলো/ আমি তাই জেগে জেগে একা একা থাকি/তুমি দেখতে এলেনা!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫/১১)। নদীর জোয়ার-ভাটার সঙ্গে জীবনের উত্থান-পতনের ছবিও অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই :

ক. দিয়ে গেছি সবি তবু দিলে ফাঁকি

ভব-নদীপারে আজো বসে থাকি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪/২)

খ. ওই সময়ের নদী যায় যাকনা বয়ে
মিলন-লগ্নতবু যায় যে রয়ে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৬/২১)

গ. যতোই ভরুক নদী জোয়ার ভাটায়
যে-তরীতে মাঝি নেই কী করে সে যায়? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৯৭/৩০০)

নদী-প্রসঙ্গে নৌকার ব্যবহারও পুলকের গানের বাণীকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে। পারাপারের অবলম্বন হিসেবেই শুধু নয়, প্রেমের স্রোতে ভেসে বেড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নৌকা-প্রতীক বেশ শৈল্পিক ঋদ্ধি লাভ করেছে :'মাঝ দরিয়ায় হারায় যখন ছোট্ট নাও/আমি কল যে হারা/তোমার প্রেমের দিশেহারা অতল গাঙের এই দেশে ॥' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩০/১৪)। আবার নদীর সঙ্গে নিজের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রিয়জনের হাত ধরে যে নদীর তীরে এসে তিনি দাঁড়াতে চান, সেই নদীর সঙ্গে জীবনের যোগ নিবিড় বলেই পুলকের গানে পাঠক-শ্রোতা পুলকিত হয়। আরো একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক–

যে-নদীতে পাল তুলে তরীটি যায় ভেসে
ইচ্ছে করে তার কূলেতে আমরা দাঁড়াই এসে
বুক ভরে যাই নিয়ে যাই নদীর কলতান! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৭৯/১৫৮)

ågi

ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক হিসেবে দেখা রোমান্টিক গীতিকবির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের আলিঙ্গনের দৃশ্যে প্রিয়জনকে কাছে পাবার বাসনা যে তীব্রতা লাভ করে, তার পরিচয়ও আমরা বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করার মতো। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভ্রমরের প্রসঙ্গে সেই রূপকল্পই সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়জনের কাছাকাছি থাকার ইচ্ছের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ভ্রমরের আপন মনে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যে, ভ্রমরের পাখনায় ক্লান্তি নেমে এলেও তিনি থাকতে চান ক্লান্তিহীন : 'কাকলীর গান যদি অকালে থামে/ভ্রমরের পাখনায় ক্লান্তি নামে/অশান্তদুর্বার ঘূর্ণি হাওয়ায়/দীপ যদি নেভেই ভয়ে/তবু তুমি পাশে থেকো আমারই হয়ে !' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৭/৬০)। ভ্রমরের সঙ্গে তিনি যে কথা বলেন, তা আসলে প্রিয়জনকেই বলা যায়। সেই অর্থে ভ্রমর কখনো কখনো প্রেম নিবেদনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর গানে। তিনি যখন বলেন : 'ভোমরারে তুই এ-ফুলে ও-ফুলে কী কথা শুনিয়ে যাসরে?/সে কী না-লেখা কোনো কবিতা তাই লুকিয়ে কিছু শুনে তা/খুশীতে আবেশে কাঁপে যে ফাগুন মাসরে!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫২/১১৫)– তখন মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষাই চিত্রিত হয়। পুলকের গানে ভ্রমরের অনুষঙ্গ এসেছে বারবার। তাঁর শিল্পদৃষ্টি ভ্রমরকে বিচিত্র সব ভাব প্রকাশের ভার দিয়েছে :

ক. ভ্রমর পাখা আবেশ আনে
গানে গানে প্রাণে প্রাণে কানে কানে
শিশির ভেজা বনের পাতা অবুঝ হয়ে যায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৯/২২)

খ. ফুল কুমারী এই তো বাসর সাজালো
ভ্রমর মিতা প্রাণের বাঁশী বাজালো
আহা ওই প্রজাপতি দিল মিলন মন্ত্র
তারে বরণ করে তোলো! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮১/৩৭)

গ. কথার ফুলে সুরের ভ্রমর যেথায় মিলন সুখে হাসে! (৩৬১/১৫১)

এভাবেই ভ্রমরের গুঞ্জনের সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান একীভূত হয়ে যায়। প্রেমের বিচিত্র দিককে তিনি শিল্পিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা ভ্রমরের অনুষঙ্গে পাঠক/শ্রোতার অনুভব ও উপলব্ধিকে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে।

cRvcwZ

পুলকের গানে প্রজাপতি কখনো সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে, আবার কখনো-বা মানুষের সুখকর বন্ধনের বার্তাবহ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটিও প্রজাপতির আশ্রয়ে বেশ জমে উঠেছে তাঁর গানে। তাই মল্লিকা ও প্রজাপতির কথোপকথন নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন তিনি : 'মল্লিকা ডেকে বলে প্রজাপতি/লুকোচুরি খেলো যদি নেই ক্ষতি' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৬/৫৪)। আবার ফুলের সান্নিধ্যে প্রজাপতির গায়ে যে কাঁটার আঘাত লাগে তার সঙ্গে প্রেমের পথের প্রতিবন্ধকতার ঐক্য আবিষ্কারের প্রয়াস পান তিনি। ফুলের পরাগমাখা প্রজাপতি প্রেমের শারীরিক উদ্ভাসনকে মনে করিয়ে দেয়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক :

ক. প্রজাপতি পেলো যে ব্যথা
কাঁটা বনে ফুল জাগাতে
তবু সুখ
তাতেই ভরেছে মোর বুক! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪৯/৭০)

খ. প্রজাপতিদের পাখায় পাখায়
ফুলের পরাগ মাখা (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬২/৭৭)

গ. দলছাড়া এক প্রজাপতি দেখতে ওকে আসে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৭৮/১৫৮)

প্রজাপতি প্রতীকের মাধ্যমে কবির প্রেমভাবনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রিয়জনের কাছে আসার ব্যাকুলতা এবং কাছে এলে দেহমনে যে শিহরণ জাগে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তা-ই প্রজাপতির অনুষঙ্গে ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

gqi

মনের আনন্দঘন উপলব্ধিকে ময়ূরের নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ প্রবণতা। নিজের খুশির অনুভব অন্যের কাছে দৃশ্যমান করার চেষ্টা থেকেই ময়ূর প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রথম বরষা যেদিন জীবনে এলো/খেয়ালী মূয়র খুশীর মাধুরী পেলো/মরমী বীণায় যে গান রেখেছি/সে যে শুধু তোমারি তোমারি তোমারি' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮/৪) – গানের এই বাণী প্রেমের স্পর্শে দেহমনের শিহরণকেই শিল্পিত করে। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতেও আমরা লক্ষ করবো, তাতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনন্দের নানা রূপই শিল্পসংহতি লাভ করেছে :

ক. ধীরে ধীরে এগোও না রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে
আধো আধো বাধো বাধো মিঠি মিঠি কথা কয়ে
যেন এখনি হয় না সুরু মনের ময়ূর নাচ! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৬/১২)

খ. খুলে দাও হৃদয় দুয়ার
রাত ময়ূরের পাখার বিলাসে
খেয়ারের খুশীর আভাসে ॥ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৪/৭৩)

এই ময়ূর কেবল মনের ভাবকেই রূপায়িত করে নি, কখনো তা প্রেমিকার শারীরিক সৌন্দর্যকেও করে তুলেছে অভিনব। 'ময়ূর-মুখী হাতের বালায় রিনিক্ ঝিনিক্ তুলোনা' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২/৬) বলে যখন কবি তাঁর প্রিয়জনের দৈহিক উপস্থিতিকে মূর্ত করার প্রয়াস পান, তখন ময়ূরের নৃত্যের ছন্দে আমরা পুলক বোধ করি এবং পল্লবিত হই।

i\gab

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে রামধনুর বা রঙধনুর বর্ণীল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কবির মনের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, বিশেষ করে আকাশের বিস্তৃতির মঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করায় তা প্রতীকী মূল্য লাভ করেছে। মেঘ বা অন্ধকারের বিপরীত অবস্থা বা ভালোবাসা বিনিময়ের অনুকূল অবস্থা বোঝাতে রঙধনু প্রতীক ব্যবহার করেছেন তিনি। 'আকাশে যে মেঘ ছিল এতো দিন/সে কেন আজ হলো স্বপ্ন রঙিন/সাতরঙা রামধনু উঠলো তাতে ক্ষতি কী হলো?' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২/১০)– এই বর্ণনায় তিনি মন দেয়া-নেয়ার উপযুক্ত পরিবেশ নির্দেশ করেছেন। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

ক. আমায় দেখতে দাও আমায় দেখতে দাও
ওই মন ভোলানো রামধনু দেখতে দাও (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩/১০)

খ. তোমার আকাশ থেকে

রামধনু দিতে আমি বলিনি তোমাকে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৪৭/২৪)

গ. আকাশেতে রামধনু উঠেছে তো কতোবার
মেঘতরী ভেসে গেছে হাওয়া ভরা পালে তার (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬০/৭৬)

ঘ. সেই চাঁদের পাহাড় মাথায় যাহার
ওই রামধনু রাঙা হয় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৭৪/১৫৬)

প্রিয়জনের দৈহিক সৌন্দর্য বোঝাতেও কবি রামধনু প্রসঙ্গ টেনে আনেন : ' রামধনু আঁকা দুটি চোখ মেলে/একবারই চাওয়া যায়!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৭৬/২৪৫)। এভাবেই রঙধনু বা রামধনু পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রতীক হয়ে উঠেছে।

jZv

পরনির্ভর নারীর রূপকল্পে লতার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে খুবই পরিচিত। বাংলা গানেও এই অর্থে লতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্ভরতার অনুষঙ্গকে মানবিক সম্পর্কের মধুরতর অভিজ্ঞতার প্রতীকে পরিণত করেছেন। তাঁর অনেক গানে প্রেমিকার দৈহিক লাবণ্য বা সচল-স্নিগ্ধ-স্বতঃস্ফূর্ততাকে লতা প্রতীকের সাহায্যে শিল্পিত করেছেন। বিশেষ করে মাধবী কিংবা মালতী লতার অবয়বে প্রিয় মানুষকে চিত্রিত করার এই প্রয়াস লাভ করেছে চমৎকার শিল্পসংহতি :

ক. আমার মালতী লতা ওগো কী আবেশে দোলে
আমি সে-কথা জানিনা আমায় কেগো দেবে বলে? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১/১)

খ. আবার মাধবীলতা বাতাসে চেয়োনা তুমি দোলাতে
যে-ব্যথা নিয়েছি মেনে কারণে এসোনা তা ভোলাতে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪/৬)

nwiY

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে হরিণ কখনো সৌন্দর্যের প্রতীক, কখনো-বা মনের চাঞ্চল্য বা চপলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভালোবাসার পথে চলতে গিয়ে তাঁর মনের মানুষ যখন ভীরুতার পরিচয় দিয়েছে, তখনও আনা হয়েছে হরিণ-অনুষঙ্গ। 'মেলা দেখে ফিরছিলাম/হঠাৎ গেলাম দাঁড়িয়ে/ দেখি এক হরিণ শিশু কাঁপছে ভয়ে ভয়ে/পথের দিশা হারিয়ে/তাকে ছুটে গিয়ে বুকে নিলাম এদুটি হাত বাড়িয়ে!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৫/১৬)– গানের এই বাণীতে ভীরু হরিণ-শিশু একজন রোমান্টিক প্রেমিক পুরুষের প্রিয় মানুষের দ্বিধা-বিহ্ক্ষল চাহনীরই প্রকাশ ঘটেছে। প্রিয়তমার চাহনীর মধ্যে হরিণের চকিত চলার ছবি আঁকার এই রীতি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে খুবই পরিচিত একটি অনুষঙ্গ। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. অনেক নেশার ঝলক আছে
হরিণ চোখের পলক আছে
যা খুশী কিনতে চাও কেনো না
চোখের এ জল শুধু তুমি চেয়ো না (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৮/৪০)

খ. হরিণীর মত পায় বুনো মেয়ে ছুটে যায় (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬৭/৭৯)
আকাশে যখন প্রথম তারাটি জ্বলে
কে অভিসারিণী   হরিণী ভঙ্গে

গ. খুশী তরঙ্গে চলে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬৮/৮০)

কাঙ্ক্ষিত নারীর বা নায়িকার সৌন্দর্য, ভীরুতা ও চপলতার উদ্ভাসন হরিণের রূপকল্পে ঈর্ষণীয় শিল্পসংহতি লাভ করেছে পুলকের গানের বাণীতে। কেবল বাইরের রূপই শুধু নয়, হরিণ-প্রতীকের আশ্রয়ে নারীর অন্তর্গত বা আন্তরিক স্নিগ্ধতাও ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। এই প্রতীকী প্রকাশ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমরা মনে করি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের প্রতীক-প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, এখানে তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পবিশ্বাসের মৌল প্রান্তেরই প্রকাশ ঘটেছে। গান ও জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন তিনি। মানুষের সমস্যাকে চিহ্নিত করার ভাষা যেমন তাঁর গান, তেমনি সম্ভাবনার বর্ণীল উপস্থাপনার কাজেও তাঁর গানের বাণী দৃপ্ত বাক্‌ভঙ্গি অর্জন করে নিয়েছে। তাঁর গানের বাণী কেবল যাপিত জীবনকেই চিত্রিত করে নি, দিন-বদল এবং মন-বদলের স্বপ্নকেও তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমেই মূর্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর গান সমাজের নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরে মানুষের মহৎ গুণাবলির প্রকাশ প্রত্যাশা করে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে ব্যবহৃত প্রধান প্রতীকসমূহ তাঁর শিল্পবোধ ও জীবনদৃষ্টির সুদৃঢ় ভিতকেই প্রোজ্জ্বল করে তোলে।

Z_¨wb‡`©k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ১৯৯২।

২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন গীতি সমগ্র প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ২০০৩।

৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯।

৪. J.A. Cuddon, *A Dictionary of Lirerary Terms*, Penguin Books, 1982, p. 671.

৫. জগন্নাথ চক্রবর্তী, 'প্রতীকের প্রয়োগ' AvaybK KweZvi BwZnvm, (সম্পাদক–অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়), ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১৯৪–১৯৫

৬. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, †MŠixcmb iPbv msMÖn প্রথম খণ্ড (সম্পাদনা-শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

৭. M.H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms*, Raziv Beri for Macmillan India Limited, New Delhi, 1999, p.168

৮. মাহবুব সাদিক, 'প্রতীক', e×‡`e emi KweZv : welq I cKiY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৭০

৯. আহমদ কবির, ie»`Kve¨ : Dcgv I cZxK, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৯–১০০

১০. বেগম আকতার কামাল, 'বিষ্ণু দে-র কাব্য : বিষয় ও শিল্পরূপ', weò †`-i Kwe¨fve I Kve¨iƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৯০

১১. বিষ্ণু দে, Rbmvavi‡Yi iæwP, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৪

১২. অমলেন্দু বসু, mvwnZ¨wPšÍv, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৮৩-৮৬

১৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, Avgvi wcÖq Mvb, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৪। বর্তমান গবেষণায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের মূলপাঠ অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ না থাকলে এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে বুঝতে হবে। উদ্ধৃতি শেষে গানের ক্রমিক-সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা বন্দনী-চিহ্নের মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে।

১৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, Kwe, মম প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১০৮

১৫. মোঃ শাহনেওয়াজ রিপন, 'বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক', evsjv †jvKMxwZKvq cZxK I wPµK‡íi e¨envi, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৯

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, MxZvjx, ie»`-iPbvejx, ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০৮

১৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), †cŠivwYK Awfavb, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ciVY

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ

civY

শিল্পসাহিত্যে পুরাণ কিংবা পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহারে একজন স্রষ্টার ঐতিহ্য সংলগ্নতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। একজন সৃষ্টিশীল শিল্পের যে-অঙ্গনেই সক্রিয় থাকুন না কেন তাঁকে সমকালীন সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই নিজস্ব সৃজনভাবনার স্বাক্ষর রাখতে হয়। তিনি অতীতের সকল অর্জনকে স্বীকরণ করেন এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্নে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সৃজনশীল মানুষের ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির প্রকাশেই তাঁর শিল্পকর্ম ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হয়। তবু তাঁর এই ব্যক্তিগত ভুবনে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত–সময়ের এই ত্রিধারায় স্নাত হয়ে স্বাতন্ত্র্য সংযোজনার প্রয়াস পায়। সময় ও সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হলে নিজের ভেতর থেকে নেমে না এসে তাঁর উপায় নেই। এভাবেই একজন কালজয়ী শিল্পস্রষ্টার আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ফলে সামনে এগিয়ে যাওয়াও তাঁর জন্য সহজ, সার্থক ও সুখকর হয়। তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবেন না, সবার সঙ্গে রঙ মেলানোর এই পথযাত্রায় তিনি শেকড়ের সুদৃঢ়তায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই শেকড়-ভাবনাই একজন সাহিত্যিককে পুরাণ অন্বেষায় অনুপ্রাণিত করে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার প্রয়াসে একজন মানুষ যখন নিজের কালকে অতিক্রম করতে চান, তখন পুরাণের বিপলায়তন বিশ্বে তাঁকে স্বচ্ছন্দে চলার উপায়টিও তিনি নিজের মতো করেই নির্মাণ করে নেন।

আধুনিক জীবনযাত্রার নানা বিপর্যয়, বিসঙ্গতি, অপ্রাপ্তি এবং অক্ষমতার শিল্পরূপ দিতে গিয়ে একজন শিল্পস্রষ্টা পুরা-কাহিনীর নানা চরিত্রের সহায়তা গ্রহন করেন। কখনো কখনো পৌরাণিক ঘটনার অনুকরণ কিংবা অনুরণনে তিনি বর্তমানকে বিচার-বিবেচনার চেষ্টা করেন। পুরাণের সঙ্গে ধর্মকাহিনীর সংযোগ থাকলেও আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন শিল্পনির্মাতার ব্যক্তিত্বের উত্তাপে ধর্মবিশ্বাসের খোলস ভেঙে যায়। তাই আমরা লক্ষ করি, যাপিত জীবনের জটিল-কুটিল আবর্তে বিপন্ন মানুষের মানসিক অস্থিরতার পরিচয় দিতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যে পুরাণের আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। পুরাণ প্রয়োগের প্রেরণা কোন আরোপিত অনুষঙ্গ নয়, একজন সাহিত্যিক প্রাণের টানেই নিজের ভেতর থেকে এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনার কাজটি পুরাণ প্রয়োগেই সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অভিনব রূপ লাভ করে। 'পুরাণ'-এর উৎস অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে আমরা লক্ষ করব, 'পুরাণ' নামটির মধ্যে পুরাতনের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এর একটি উদ্দেশ্য বোধকরি 'পুরাতন' ঐতিহ্যকে বহাল রাখা। তবু বলা যায়, পুরাণসমূহ এই সময়ে যে বিবেচনায় ব্যবহৃত হয় তা পুরাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তবে কোন কোন সমালোচক 'পূরণ' শব্দটির মধ্যে পুরাণের একটি উৎসমূল অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : 'পূরণ শব্দটি সম্ভবত পুরাণ শব্দের মৌলসূত্র সন্ধানে আমাদের সাহায্য করে। যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে।' (ধ্রুবকুমার, ১৯৯১ : ৫০১) সাহিত্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গের প্রয়োগ বিবেচনার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে।

একজন আধুনিক শিল্পস্রষ্টা ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের ব্যবধান হ্রাস করার কাজটি পুরাণ ব্যবহারের মাধ্যমে করে থাকেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতা ও গানে পুরাণের ব্যবহার সরলরৈখিক নয়, তা কাব্য কিংবা গীতবাণীর দেহে যোগ করেছে নতুন ব্যঞ্জনা। বিগতকে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করার এই কৌশল কবিতা ও গীতবাণীর বক্তব্য ও চিত্রকল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ নির্মাণে তাই শিল্পপ্রকৌশল যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সামসময়িক জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ-অভিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রার সংযোজন ঘটায়। ব্যক্তি–অভিজ্ঞতা পুরাণ-অভিজ্ঞানের সংযোজন-সমন্বয়ে সাহিত্য পায় শাশ্বত কালমাত্রা (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৯৫)।

একজন শিল্পস্রষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই শিল্পের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেন। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্বকালের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। সমকালীন জীবন-বাস্তবতার রূপায়নে কবির অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিই তাঁকে মিথকলার পরিচর্যায় উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পী কেবল নিজের কালের মানুষের মধ্যেই তাঁর শিল্পচেতনাকে সীমাবদ্ধ করতে চান না। স্বকালের সংঘাত ও সম্ভাবনাকে দেশকাল-অতিক্রান্ত সর্বজনীনতায় অভিষিক্ত করার অভিনব কৌশল হিসেবে ঐতিহ্যের উজ্জ্বল আধার মিথের জগতে তাঁর আনাগোনা। মিথ শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্বয় ঘটিয়ে সাহিত্যকে সার্থকতায় উন্নীত করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ মিলতে না পারছে, তত ক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেই জন্যে প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই' (১৯৯৫ : ২০)

পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন কবি যতটা স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকারের পক্ষে তা নানা কারণে সম্ভব হয় না। গীতিকারকে বক্তব্যের সরলতা ও সুরের সীমাবদ্ধতা মেনেই শব্দকে সাজাতে হয়। গভীর ও তাত্ত্বিক বিষয়কে শব্দবন্ধ করার ক্ষেত্রে গীতিকার বোধগম্য ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তাই পুরাণ কিংবা পৌরাণিক অনুষঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল উল্লেখেই সীমিত হয়ে পড়ে। কোন কোন গীতিকার পৌরাণিক চরিত্রকে ঘিরেই পুরো গানের বাণী সাজানোর চেষ্টা করেন। গান যেহেতু একটি যৌথ শিল্পকর্ম এবং এতে গীতিকার-সুরকার-শিল্পীর মেধা ও সৃজনশীলতার সার্থক সমন্বয় না ঘটলে তা গান হয়ে ওঠে না, তাই গীতিকারের ভাব ও চৈতন্যের প্রকাশকে অন্যের বিবেচনার মুখাপেক্ষী হতে হয়। তবু একজন সার্থক গীতিকার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে স্বীকার ও স্বীকরণ করেই গীতবাণীতে পুরাণ–প্রসঙ্গের শরণ নিয়ে থাকেন।

গীতবাণীতে প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ বিধৃত হলেও প্রেমই মুখ্য উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। সেই কারণে প্রেম-আশ্রয়ী পুরাণ ও পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্রের অধিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতিকে একজন কবি বা গায়ক তাঁর নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। পুরাণ-মতে, মথুরার রাজা কংসকে নিধন করার জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব। কৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব, মাতার নাম দৈবকী। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হয়অ দৈবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহকালে দৈবকীর ভাই কংস এক দৈববাণীতে শোনেন যে তাঁর বোন দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তিনি কংসের নিধনকারী। কংস তাই দৈবকীর সকল পুত্রকে একের পর এক হত্যা করে বিনষ্ট করলেন। অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ ভূমিষ্ট হলে পিতা বসুদেব স্বীয় পুত্রকে ঘোর অন্ধকার রাতে যমুনার পরপারে গোকুলে নন্দের ঘরে তাঁর স্ত্রী যশোদার কোলে রেখে তাঁর সদ্যোজাত শিশুকন্যাটিকে এনে দৈবকীর পাশে রেখে দেন। নতুন শিশুকন্যাটিকেই দৈবকীর গর্ভজাত সন্তান মনে করে কংস তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কংস শিশুকন্যাটিকে বধ করার পূর্বেই সে কংসের বিনাশকারীর কথা ব্যক্ত করে অদৃশ্য হয়ে যায়। কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস তখন নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে কংসকে কৃষ্ণের হাতে পরাজিত ও নিহত হতে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই কৃষ্ণকেই আমরা নানা নামে অভিহিত হতে দেখি। যেমন– কেশব, গদাধর, গোবিন্দ, জগন্নাথ, দামোদর, মধুসূদন, মাধব, হরি ইত্যাদি। রাধা কৃষ্ণের প্রেমিকা গোপবালিকা। পিতা বৃষভানু ও মাতা কলাবতী। নপুংসক আয়ান ঘোষের (আইহন) সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। কিন্তু দেবাভিপ্রায়ে রাধা তাঁর সকল মনপ্রাণ কৃষ্ণে সমর্পণ করেন। কংসাসুর বধের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে মর্ত্যে আবির্ভূত হন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য স্বর্গের দেবগণ লক্ষ্মীকে রাধারূপে প্রেরণ করেন। এই রাধা-কৃষ্ণের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যযুগের সকল কবি তাঁদের ভালোবাসার অভিব্যক্তিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। কেবল মধ্যযুগেই নয়, রাধা-কৃষ্ণ সকল যুগের সকল মানুষের ভালোবাসার প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আধুনিক মানুষও নিজের অন্তর্গত প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণের শরণ নিয়ে থাকেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত-বাণীতে এই রাধা-কৃষ্ণই প্রধান পৌরাণিক চরিত্র। তবে আরো নানা পুরাণ-আশ্রয়ী গীত-বাণী রচনা করেছেন তাঁরা। আমরা ক্রমান্বয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত-বাণীর আশ্রয়ে তাঁদের পৌরাণিক অভিজ্ঞানের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণের প্রয়াস পাবো।

†MŠixcmb gRg‘vi

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর গানের বাণীতে নানা রকম পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গই তাঁর গীতবাণীতে ঘুরে ঘিরে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন গীতবাণীতে কিন্তু প্রেমের প্রগাঢ়তা বোঝাতে রাধা-কৃষ্ণকে প্রতীকী তাৎপর্যে তুলে ধরেছেন। আবার অনেক গান তিনি রচনা করেছেন যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেই উপজীব্য করেছেন। আধুনিক মানুষের প্রেমের স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি বারবার রাধা-কৃষ্ণের দুয়ারে হাত পেতেছেন। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের জন্য গান রচনা করতে গিয়ে তিনি নায়ক-নায়িকার অভিব্যক্তি প্রকাশে তাদের মধ্যে কৃষ্ণ এবং রাধার উপস্থিতি আবিস্কার করেছেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কয়েকটি গীতবাণীর শরণ নিতে চাই যেখানে রাধা

ক. খুলিয়া কুসুম সাজ শ্রীমতি যে কাঁদে
অলখে রহিয়া কানু ফুলরেণু সাধে।
সুরভি ঝরানো মালা
দিল প্রাণে একি জ্বালা
যার লাগি হারাল কুল
কি দিয়ে যে বাধে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩)

খ. বাঁশী শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী ॥
সে যে দিনদুপুরে চুরি করে্
রাত্তিরেতে কথা নাই ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬)

গ. গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু
আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়,
হৃদয় ভরাতে চায়। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২২)

ঘ. কুঞ্জে আসিবে তোর মদনমোহন–
সব দুঃখ দূরে যাবে,
বাঞ্ছা পূরণ হবে
বঁধুয়ার সনে হবে মধুর মিলন।
কুমকুম কস্তুরী চুয়া-ফুল চন্দন–
গন্ধে মদির হবে হৃদি বৃন্দাবন,
বঁধুয়া খেলিবে রাস–
পরাইবে প্রেমের ফাঁস
জড়াইয়া বাহুপাশে ও দেহরতন ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৫)

ঙ. হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে
বিবস রাধার তনু তোমারই বিরহ ভারে ॥॥
অধরে তোমার প্রভু আজ কেন বাঁশী নাই
রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই
শ্যাম সোহাগিনী চির অনুরাগিনী
ভাসে রাধা আঁখি ধারে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩৭)

উপরের দৃষ্টান্তসমূহে আমরা লক্ষ করছি, রাধা এবং কৃষ্ণের কথার আড়ালে কবি মূলত তাঁর সময়ের মানুষের অন্তর্গত প্রেম-সৌন্দর্যেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে কৃষ্ণ যেমন প্রেমিক পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত, তেমনি রাধাও প্রেমিকার রূপকল্পে নির্মিত। তাই কবির নায়িকা যখন বলেন, 'পথ ছাড়ো অগো শ্যাম/কথা রাখ মোর।/এমন করে তুমি আঁচল ধরোনা/এখনই যে শেষ রাত হয়ে যাব ভোর ॥' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৩৪)– তখন এই সময়ের নায়ক-নায়িকার অভিসার-দৃশ্যই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা তিনটি প্রধান চরিত্র পাই– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। যশোদা, বলভদ্র আইহনের মাতা, কিংবা আইহন অপ্রধান চরিত্র হিসেবে এই কাব্যে উপস্থিত। রাধার ষোলোশত গোপীর কথা আমরা জানি। সেই গোপীদের মধ্যে ললিতা ও বিশাখার নাম বিশেষভাবে পরিচিত। এই ললিতা-বিশাখাকেও গৌরীপ্রসন্ন তাঁর গীতবাণীতে আহক্ষান করেছেন। রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য পাগলপ্রায় তখন ললিতা কিংবা বিশাখার সঙ্গেই সে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছে। যে-পথে কৃষ্ণ চলে গেছে সেই পথের দিকে চেয়ে রাধার অপেক্ষা বা চোখের জল ফেলার দৃশ্য বড়ই মনোহর। গৌরীপ্রসন্নের একটি গান থেকে উদ্ধৃত করি : 'ললিতা গো বলে দে/কোন পথে গেল শ্যাম?/বিশাখা গো বলে

দে/কোন পথে গেল শ্যাম?/মুরলীর ধ্বনি তার/আমারে ডাকে আর/আর তো শুনি না রাধা নাম ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৩৯) এই গানে রাধার অন্তরের আকুতি সখিদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার মনে যে ভাব জাগ্রত হয় তার সামান্য অংশই হয়তো সে ললিতা-বিশাখার সঙ্গে আলোচনায় তুলে ধরতে পারে। যে বাঁশি রাধার মনের শান্তি নষ্ট করে, আমরা লক্ষ করছি রাধা সেই বাঁশি শোনার জন্যই ব্যাকুল হয়ে আছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করি 'কঠিন মায়া' চলচ্চিত্রের জন্য লেখা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের একটি গীতবাণীর কথা। এই গানে রাধা-কৃষ্ণের জনপ্রিয় কাহিনিকে লোককথার শুক ও সারি চরিত্রের মুখ দিয়ে তুলে ধরেছেন। শুক এখানে রাধিকার পক্ষ অবলম্বন করছে আর সারি কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। আমরা এখানে পুরো গানটিই উদ্ধৃত করছি :

> শুক বলে সারি
> আমার রাধিকা জল নিতে ঘাটে যায়
> আহা বাম চোখ তার সমানে নাচিতে
> ইতি উতি ফিরে চায় ॥
> সারি বলে শুক
> কেন তোর রাধা চঞ্চল হল আজি?
> তার শ্রবণে যে সুধা
> চলিছে আমার শ্যামের সুরলী বাজি
> সেই পিরীতির সুধা স্বপ্ন জাগায়
> রাধার নয়ন ছায় ॥শুক বলে সারি
> জানিয়ে তোর শ্যামের মুরলী বাজে
> মোর রাধার কপাল লাল হয়ে ওঠে
> কি জানি সে কোন লাজে ॥
> সারি বলে শুক
> যদি না বাজিত আমার শ্যামের বাঁশী
> তোর রাধার অধরে খেলিতো কি তবে
> বিজলী জড়ানো হাসি?
> বাজিত কি তবে মধুর নূপুর
> মানব-বধুর পার ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৪০)

এই গীতবাণীতে কৃষ্ণের প্রেমে রাধার দেহ ও মনের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তারই বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এখানে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার যে কৃষ্ণ ছাড়া যেমন রাধার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি রাধা ব্যতীতও কৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। রাধা এবং কৃষ্ণ মিলেই এই প্রেমের কাহিনি পূর্ণতা পেয়েছে। কৃষ্ণ রাধাকে সৃষ্টি করে নিজের জীবনকেও অর্থবহ করে তুলেছে। জল আনতে যমুনার ঘাটে গিয়ে রাধার বাম চোখ কেঁপে ওঠার সঙ্গে যে লোকবিশ্বাস জড়িত, তা এখানে চমৎকার শিল্পনৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন কবি। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার নয়নে প্রেমের সুধা ও স্বপ্নের শিহরণ জেগে উঠেছে। এই বাঁশির শব্দেই রাধার কপাল রঙিন হয়ে ওঠে। সারি দাবি করছে, শ্যামের বাঁশি না বাজলে রাধার অধরপল্লবে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যেত না, এমনকি তার পায়ের নূপুরও এমন মধুর সুরে বেজে উঠত না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রাধা এবং কৃষ্ণ তাঁদের পৌরাণিক সীমারেখা অতিক্রম করে একালের কিংবা বলা যায় সর্বকালের মানুষের অন্তরের গভীরতর প্রেমানুভূতির প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। 'তাই কানু বিনে প্রেম নাই'–এই প্রাচীন প্রবাদ বিশেষ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবকালের সৃজনশীল মানুষকে শিল্পরচনায় প্রণোদিত করে। এ-পর্যায়ে আমরা আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই, যেখানে রাধা এবং কৃষ্ণ এসে এই সময়ের প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরের অনুভূতিকে মূর্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃজনে অবদান রেখেছে।

ক. তুমি যে আমার ফাগুন বেলার
রঙে রসে ভরা ধরায় হাসি,
তুমি যে আমার পরাণের গোঠে
গোকুল মাতানো শ্যামের বাঁশি।
তুমি যে আমার মানসী রাধার
প্রণয়ের ফুল-বন্ধ ওগো। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৬)

খ. কান্না আছে আছে হাসি–
বুকে আছে শ্যামের বাঁশি,
চোখের মাঝে আছে ওরে,
কাশী বৃন্দাবন। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৯)

গ. মেঘ কালো আঁধার কালো
আর কলঙ্ক যে কালো
যে-কালিতে বিনোদিনী হারাল তার কুল।

তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৮৮)

ঘ. হৃদয় আছে যার
সেই তো ভালোবাসে
প্রতিটি মানুষেরই
জীবনের প্রেম আসে
কেউ কি ভেবেছিল
শ্যামকে ভালোবেসে
রাধার ভালোবাসা
কাহিনী হয়ে যাবে,
হৃদয়ে লেখো নাম
সে নাম রয়ে যাবে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৩)

ঙ. যে বাঁশি শ্যামের মুখে
আড়ালে বাজে,
নীরব সে থাকলে শ্রীমতি রাধা
কি করে অভিসারে সাজে? (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০০)

চ. শাঁখের ধ্বনিতে উলু যেমন মিশে ওগো সই
সেই মতো মোরে মিশাইলে
শ্যাম পিরীতি আমার অন্তরে
রাধার পিরীতি আমার অন্তরে৷ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪৯)

ছ. ময়না বল তুমি কৃষ্ণ রাধে
তাকে মন দিতে যে চাই কেমন বাধে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৫৬)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার kxKòKxZb এবং ˆeòec‘\ejxর রাধা-কৃষ্ণ দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছেন বলে মনে হয়। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার প্রভাবই তাঁর গীতবাণীতে স্পষ্ট। কারণ গৌরীপ্রসন্নের রাধা ও কৃষ্ণকে গ্রামীণ বাঙালি নরনারী হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই প্রভাজাত। 'পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ দেবদেবী। তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সবই দেবতার লীলা। তাই পদাবলীতে রাধা প্রথমাবধিই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তাঁর চরিত্রের কোনো বিবর্তন নেই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে প্রথমে প্রবল কৃষ্ণ-বিরাগ দেখা যায়। পরে চরিত্রটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে পড়ে।পদাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, বড়ু চণ্ডীদাসে প্রাধান্য বাস্তবতার।' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, ১৪০৭ : ২৬)। এই বাস্তববোধদৃপ্ত রাধা-কৃষ্ণই গৌরীপ্রন্নের গীতবাণীতে ঘুরেফিরে এসেছে। পুরাণাদিতে রাধার উপস্থিতি খুব বেশি না হলেও শিল্পসাহিত্যে কৃষ্ণের চেয়ে রাধারই প্রবলরূপে প্রতীয়মান। সাহিত্যের রাধাকে পাঠ

করার সময় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানবীয় অনুভূতির প্রবল প্রতিনিধি হিসেবেই এই চরিত্র সৃজনশীল প্রতিভার একান্ত দোসর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কবিরা রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রেম কবিতার প্রতিভূ হিসেবে। এই দুই চরিত্র কবি-গীতিকারদের কাছে প্রেম কবিতার আলম্বন-বিভাব হিসেবে গৃহীত হয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রাধা-কৃষ্ণ আশ্রয়ী গীতবাণীতেও আমরা এই অভিব্যক্তিরই প্রকাশ লক্ষ করি।

শিব বা মহাদেব যেমন বিচিত্র রূপে আবির্ভূত হন– কখনো সৃষ্টি ও কল্যাণের মূর্তিতে, আবার কখনো ধক্ষংস ও মহাসংহারক রূপে– তেমনি গৌরপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবানীতেও নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এই মহাশক্তিধর পৌরাণিক চরিত্র। তিনি এই চরিত্রের উল্লেখে মানবচিন্তার বহুবর্ণিলতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। তিনি কখনো শাণিত ব্যঙ্গে, আবার কখনো লোকজ প্রবাদ হিসেবে শিবের সাধারণ অবস্থিতি তুলে ধরেছেন। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে–

ক. নেমে ছিল গঙ্গানদী
মহাদেবের জটা থেকে
দুঃখ পেলাম কলের জলে
হেথায় তাকে বন্দী রেখে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৪৭)

খ. সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ হে তুমি
প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো।
বিষের ভাণ্ড যে হাতে
সেই হাতে তোমার প্রভু অমৃত ঢালো।
প্রভু তোমারই এ নিখিলে
আমার আমার বলে
কেন হয় মন পাপে কালো।
প্রভু মেটাও এ জীবন তৃষ্ণা–
তুমি পথ তুমিই যে দিশা,
সম্মুখে আঁধার নিশা–
করুণার কর হে আলো। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০৫)

গ. কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়ি কুড়ায়ে–
হাওয়ায় আঁচল দেব উড়ায়ে,
নীলকণ্ঠের সুরে কণ্ঠ মিলায়ে আজ
সারাবেলা শুধু গান যে গাব। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯২)

শিবের মতোই দুর্গা-প্রসঙ্গও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে লক্ষ করা যায়। এই দুর্গাই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে পরিচিত। এই ভারতীয় দেবী বিভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। তিনি মহিষাসুর বধে চণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, দেবী বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ যগে যুগে বিভিন্ন মূর্তিতে অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে দেবতাদের রক্ষা করেছেন। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতাগণ রাগান্বিত হলেদেবতাদের মুখ থেকে তেজ বা শক্তি নির্গত হতে থাকে। এই শক্তির মিলিত রূপই হচ্ছে দেবী চণ্ডী। জানা যায়, দেবতা শিবের তেজ থেকে দেবীর মুখ, দেবতা বিজুর তেজা থেকে বাহু, ব্রহ্মার তেজ থেকে পায়ের পাতা এবং দেবতা চন্দ্রের তেজ থেকে দেবীর স্তন তৈরি হয়। এই চণ্ডী বা দুর্গার কাছে কবি এই পৃথিবীর মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করা যাক :

আনন্দময়ী মাগো সদানন্দে হাস তুমি
আলোয় কভু দাও না ধরা
আঁধারে মা আস তুমি ॥
বাহিরে তোমায় দেখে
বজ্রপ্রাণা সবাই কহে
নামে তুমি মা ভয়ংকরী
প্রাণে স্নেহের গঙ্গা বহে।
অশিবেরে দমন কর মা
জীবের দুঃখ নাশ তুমি ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৩১)

কোন কোন সমালোচক মিথ ও লোককাহিনীর স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করে জীবনে এর প্রভাবের ভিন্নতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লোককাহিনী জীবনের বহির্বাস্তবতার বর্ণিলতাকে চিহ্নিত করে বলে অনেকে মনে করেন। মিথকে সত্যের খুব নিকটবর্তী বিবেচনা করে জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে এর প্রবল প্রভাবকেও স্বীকার করেছেন কেউ কেউ। সমালোচকের মন্তব্য –

> The difference between myth and folk tale, however, also have their importance. Myths, as compared with folk tales, are usually in a special of seriousness : they are believed to have "really happened" or to have some exceptional significance in explaining certain

features of life, such as ritual. (William J. Handy & Max Westbrook, 1976 : 164)

যে বিচিত্র-বর্ণিল-বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় জীবন ঋদ্ধ হয়ে ওঠে তাকে অনুধাবনের প্রয়োজনে তার যৌথ নির্জ্ঞানে (Collective unconscious)-এ লুকিয়ে থাকা রূপকথা বা পুরাকথার পাঠোদ্ধার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাই পুরাণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা ও লোককাহিনী বিষয়েও কবির দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই আলোচনায় আমরা রূপকথা-লোকবিশ্বাস-লোককাহিনীকে লোকপুরাণ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে লোকপুরাণ নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লোকপুরাণ ও রূপকথার শিল্প-সফল মিথস্ক্রিয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। রূপকথা ও পুরাকথার আয়নায় প্রায়শই বিম্বিত হয় আধুনিক জীবনের চালচিত্র। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন গীতবাণীর ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে, নিছক সেই রূপকথার গল্প শোনানোই উদ্দেশ্য নয় হয়তো; সময়-সচেতন শিল্পীর কাছে রূপকথা, পুরাণ অথবা কিংবদন্তী আসলে সেই দৃশ্যমান মোড়ক – যা নিপুণভাবে ধরে রাখে সময় কিংবা সময়ের ইতিহাসকেই।। নিচের উদাহরণগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক –

ক. আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগর আর তের নদীর পারে,
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে।
সে এক রূপ কথারই দেশ—
ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ,
তারারই ফুল পাপড়ি ঝড়ায়
যেথায় পথের ধারে। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৭)

খ. সে আলোয় ভরা নতুন ধরায়
ডাইনী বুড়ি আসবে না ॥
সেথায় কে বলে গো মানুষেরে
মানুষ ভালো বাসবে না ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০৪)

গ. শুধু পথ দাও আমাকে যে চলবার
প্রদীপ মুখে শব্দ দাও কথা বলবার
যেন স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী বাই ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪৩)

'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছায়াছবির একটি গানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মা-দুর্গার কাছে এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন। মায়ের শরণ নিতে গিয়ে তিনি অযোধ্যার রামকেও এই পৃথিবীতে পুনরায় আহক্ষান করেছেন। তিনি মিথ্যার জয় এবং সত্যের মৃত্যু দেখে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এই পৃথিবীতে যখন মানুষ ও পশুর ব্যবধান শূন্যের কোঠায় তখন মা-দুর্গা ও রামের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন তিনি। অসহায় মানুষের সহায় হিসেবে মা-দুর্গার করুণা প্রার্থনা করেছেন কবি। অন্য একটি গানে আমরা একজন পুতুল বিক্রেতার দেখা পাই যে একটি ছোট্ট ঝুড়ির মধ্যে রাম, রাবণ, হনুমান–সবাইকে ধারণ করেছে। এই গানে বাংলাদেশের বিখ্যাত সব মানুষকে মিথের সম্মান দিয়েছেন কবি। স্বামী বিবেকাননন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শচীমাতার দুলাল নিমাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ–এঁরা সবাই পুতুল বিক্রেতার ঘনিষ্টজন। নানা পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে এই সোনার বাংলা সফল মানুষদের নাম করে কবি এই গানটি 'ভানু পেল লটারী' চলচ্চিত্রের জন্য লিখেছিলেন। পুরো গান দুটিই এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

ক. তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ
একি অভিশাপ, নাই প্রতিকার,
মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই আজ অধিকার।
কোথায় অযোধ্যা কোথা সেই রাম–
কোথায় হারাল গুণধাম।
একি হল, পশু আজ মানুষেরই নাম।
সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে
শেষ করে দাও এই অনাচার।
তোমার কঠিন হাতে বজ্র কি নাই–

খ. হিংসার কর অবসান,
তোমার এ পৃথিবীতে যারা অসহায়–
তুমি মা তাদের কর ত্রাণ।
চরণতীর্থে তব এবার শরণ লব–
দুর্গম এই পথ হব পার। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৬)

গ. পুতুল নেবে গো– পুতুল।
আমারই ছোট্ট ঝুড়ি
এতে রাম রাবণ আছে,
দেখে যা নিজেরই চোখে

হনুমান কেমন নাচে।
এ সুযোগ পাবে না আর
বল ভাই কি দাম দেবে ॥
বাংলা দেশের সে এক ছেলে
বিবেকানন্দ স্বামী,
কাঁপিয়েছিলেন এই দুনিয়াটাকেই
এই তারেও এনেছি আমি।
দেশের বন্ধু চিত্তরঞ্জন
দাতা কে আর তাহার মত,
ধরে তারে নিয়ে গিয়ে
পালন কর তার সে ব্রত।
শচীমাতার দুলাল নিমাই
পাগল যিনি হরির নামে,
নিয়ে যাও তারেও
তুমি শুধু এক আনা দামে।
নেতাজী সুভাষচন্দ্র
জন্মেছিলেন এই দেশেতেই,
এই ঝুড়িতে আছেন তিনি
কে বলে নেই তিনি নেই।
লেখাপড়া শিখিনি হায়
মূর্খ আমায় বলে সবে,
রবি ঠাকুর আছেন মাথায়
ঘ. ধন্য আমি সেই গরবে ॥ (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬২-১৬৩)

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরকেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর গীতবাণীতে ব্যবহার করেছেন। বেহুলার বাসরঘরে সাপের প্রবেশ এবং সর্পাঘাতে লখিন্দরের সাময়িক মৃত্যু–এই ঘটনাপ্রবাহকে তিনি গানে তুলে ধরেছেন। প্রেমিকার কাছে ভালোবাসা প্রত্যাশা করে কেবল অবহেলা পেয়েছেন বলেই প্রতীজ্ঞা করেছেন, তিনি আর প্রেমিকার কাছে ফিওে যাবেন না। প্রেমিকা মরিয়া হয়ে কাছে ডাকলেও আর সারা দেবেন না তিনি। নিজের পোড়া কপালকে সাপে কাটা কপাল হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং প্রওসঙ্গত স্মরণ করেছেন বেহুলার ভেলা। নিচের উদ্ধৃতিটি খেয়াল করা যাক :

পাখির কাছে মিনতি কর গান পাবে

যদি ক্ষেতে তুমি হাল ধর ধান পাবে,

তবু আমাকে আর পাবে না

আমার সাপে কাটা কপাল কে কি

সেই বেহুলার ভেলা করেছ? (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৫২)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নানা পৌরাণিক অনুষঙ্গে একালের মানুষের চৈতন্যের নানা দিকে আলোক নিক্ষেপের প্রয়াস পেয়েছেন। চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখতে গিয়ে স্বভাবতই তিনি প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লক্ষণীয়, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদসমূহেই তিনি সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। সেকালের ঘটনা ও চরিত্র যখন একালের মানুষের ভাব ও ভাবনার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তখনই তা মিথিক আবহ লাভ করে সৃজনশীল মানুষের সচেতন শিল্পদৃষ্টির সঙ্গী হয়ে ওঠে। এ-কারণেই বোধকরি প্রেম-আশ্রয়ী পুরাণের আধিক্য তাঁর গীতবাণীতে লক্ষ করা যায়। তাই তিনি বারবার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমনিকুঞ্জে ফিরে গেছেন। কেবল প্রেমই নয়, মানুষের প্রবৃত্তির ধধ্বংসাত্মক দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন তিনি। তাই শিব ও দুর্গাকে তিনি নানা চেহারায় হাজির করেছেন। লোকপুরাণ এবং সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চরিত্রসমূহকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে গানে ধারণ করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীতে ব্যবহৃত পুরাণ ও লোকঐতিহ্যসমূহ সময়-সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

cjK e‡›'¨vcva¨vq

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীতবাণীতে পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর গীতবাণীতে পুরাণ-প্রসঙ্গে সমকালীন সমাজ-রাজনীতির নানা দিক যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি জীবনের নানা সমস্যা-সংঘাত-সম্ভাবনার স্বরূপ উন্মোচনে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর গানের প্রধান বিষয় প্রেম হলেও জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকে গীতবাণীতে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। রাধা-কৃষ্ণের আড়ালে তাঁর সমকালের মানুষের অনুভব-উপলব্ধিকে গীতবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবেচনা কেবল বিশেষই নয়, ব্যক্তিত্বচিহ্নিতও বটে। তাঁর গীতবাণীর রাধা কিংবা কৃষ্ণকে আমরা অনায়াসে একালের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠ করতে পারি। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন যা পুরোপুরি রাধা-কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বনে আবর্তিত হয়েছে আবার অনেক গীতবাণীতে রাধা কিংবা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বর্তমানের অবস্থা বা অনুভব প্রকাশের সহায়ক অনুষঙ্গ আকারে উদ্ধৃত। 'শুনি সখি মোহনীয়া বাঁশরী বাজায়রে/না-বলে এসেছে শ্যাম কী হবে উপায় রে!'[২] (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৯), কিংবা 'নদীর যেমন ঝর্ণা আছে

ঝর্ণারও নদী আছে/আমার আছো তুমি শুধু তুমি!/বাঁশীর যেমন কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণেরও বাঁশী আছে/আমার আছো তুমি শুধু তুমি!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২১), অথবা 'ও বিনোদিনী রাধারে তুই ঘুমাসনারে আর/দ্যাখ্ রথের চাকা চললো ঘুরে মধুরা রাজার!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২১) প্রভৃতি গীতবাণীর রাধা কিংবা কৃষ্ণ সম্পূর্ণত একালের নরনারীর অন্তরের কথাকে ধারণ করেই বাণীবদ্ধ হয়েছে। আবার 'কোথা যে বাঁশি বাজে/এলো সেকি মন চোর ছায়াঘন মাঝে!/গুরুজন-গঞ্জনা লোক-অপবাদ/মানে নাতো বিনোদিনী কোন পরমাদ/রাধারাণী ফুলবাসে/অভিসারে সাজে!!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৬) কিংবা 'কুঞ্জবিহারী হে গিরিধারী/তোমার-ই চরণ শরণ নিলাম/যা ছিল আমার সবি তোমায় দিলাম!/সেজেছি আমি সেই ব্রজবালা/লাজে সলাজে গেঁথেছি এ মালা/এসো নয়নে এসো সুন্দর ঘনশ্যাম!/নন্দকিশোর থাকো মন জুড়ে/থাকো পরাণে মন-মধুপুরে/আনো মুরলী ভরে তোমার-ই সে সাধা নাম!!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯২) প্রভৃতি গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছেন কবি। কোন কান গীতবাণীতে আমরা লক্ষ করি, কবি রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে আরো অনেক লোককাহিনি জুড়ে দিয়ে প্রেমের প্রবল ও প্রগাঢ় অনুভবের প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা চণ্ডীদাস আর রজকিনীর প্রেমকে প্রতীকী তাৎপর্যে পাঠ করতে অভ্যস্ত। আবার মৈমনসিংহ গীতিকার নদের চাঁদকেও আমরা প্রেমিক পুরুষ হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকি। গানের স্রষ্টা রামপ্রসাদের গানে কেবল দেবতার প্রতিই ভক্তি প্রকাশিত হয় নি, মানুষের ভালোবাসাকেও তিনি নানা উপমা-রূপকল্পে তাঁর গানে তুলে ধরেছেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কৃতিপুরুষদের শরণ নিয়ে একালের মানুষের ভালোবাবাসকে সর্বকালের ভালোবাসার সঙ্গে সন্নিহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন : 'আমি কখনো হই চণ্ডীদাস/কখনো হই নদের চাঁদ/কখনো গাই রামের ব্যথা/কখনো গাই রামপ্রসাদ।/আবার কখনো ওই কৃষ্ণলীলায়/বাজাই মোহন বাঁশি/তবু ঘুরে ঘুরে ঘুরে মাগো/তোমার কাছেই আসি।' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩০) এভাবেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতবাণীকে শিল্পের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক গীতিকবিদের গীতবাণীর সবচেয়ে বড়ো জায়গা দখল করে আছে প্রেম। তাই সঙ্গত কারণেই প্রেমের প্রতিভূ হিসেবে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয়েছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতবাণীর আলোচনায় আমরা যেমনটি বলেছিলাম, আধুনিক গান কিংবা চলচ্চিত্রের গান লিখতে গিয়ে প্রেমের নানা অভিব্যক্তির প্রকাশ রাধা এবং কৃষ্ণের শরণে বিশেষ মাত্রা লাভ করে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি লক্ষ করার যায়। তাই

রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক তাৎপর্য আলোচনা না করে এই পর্যায়ে আমরা আরো কয়েক গীতবাণী কিংবা গীতবাণীর অংশবিশেষের উল্লেখ করতে চাই যেখানে পুলক রাধা এবং কৃষ্ণকে আশ্রয় করে তাঁর অন্তরের গভীরতর অভিব্যক্তিরপ্রকাশ ঘটিয়েছেন :

ক. হে রাধামাধব গাপী জন বল্লভ
বসতি করো হৃদি বৃন্দাবনে
আনন্দময় প্রেমলীলা মাধুরী
নিরখি মানস ভাব লোচনে ॥
অঙ্গে অঙ্গে ভরা অনঙ্গ রঙ্গে
জাগাও চিত্ত মম রস-তরঙ্গে
এম কাব্য চরণে রাখো যুগল চরণ
অপরূপ ছন্দ বন্ধনে ॥
বাজুক মঞ্জরী মুরলী সুরে
মঞ্জুল মম মন-মধুপুরে
তব পদসেবা করি আমি পদাবলী গাঁথি
সঁপিতে দাওহে শ্রীচরণে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭)

খ. বেধোনা ফুল মালা ডোরে
কানু-প্রেম গেঁথে নিও মালা করে!
ও-কালো রূপের ছটা
চোখে আনে আলো
কালো রূপ দেখে দেখে (ওই কৃষ্ণ রূপ দেখে দেখে)
আঁখি হলো কালো
কী হবে নয়নে আর কাজল পরে?
কী রূপে রূপসী রাধা
কেন বোঝেনাকো
নীলাম্বরী শাড়ী তুমি
রাখো সখি রাখো
কৃষ্ণ-নামাবলী শুধু পরাও মোরে!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩)

গ. ও শ্যাম যখন তখন
খেলো না খেলা এমন
ধরলে আজ তোময় ছাড়বো না
দুহাতে মনের সুখে
মাখাবো আবীর মুখে

Dhaka University Institutional Repository

আজকে এই খেলাতে হারবো না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৮)

আমি তার কলঙ্কেতে

হব যে কমল কলি

মরমের রাই কিশোরী

মরণের চন্দ্রাবলী (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫২)

ললিতা গো

ওকে আজ চলে যেতে বল্‌না

ও ঘাটে জল আনিতে যাবোনা যাবোনা

ওখি অন্য ঘাটে চলনা!

দিবালোকে সে আমায়   নাম ধরে ডাকে

আমাকে সবাই দোষে   সে সাধু থাকে

অসময় সময় কিছু   কেন সে বোঝেনা

আমি কি তার হাতের খেল্‌না?

নিশিরাতে বাঁশী তার   সিঁধ কাঠি হয়ে

চুপি চুপি ঘরে এসে বাজে রয়ে রয়ে

যখনি ডাকবে সে তখনি যেতে হবে

আমি কি এমনতর ফেলনা? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬৭)

ঘ. প্রদীপ তুমি তুলসীতলায় জ্বোলো

আমার সয়না ঘরের আলো

এইতো ভালো আঁধার আমার ভালো!

বাঁশী তুমি বৃন্দাবনেই বেজো

রাধারাণীর রাখাল রাজাই সেজো

আর   চন্দ্রাবলীর কুঞ্জকুসুম হোক শুকিয়ে কালো। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৫)

ঙ. হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম

রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীদাম!

যশোদা জননী বলে যাদু বাছাধন

অষ্টোত্তর শত নাম পেলো নারায়ণ!

দেব যদুবর নামে ডাকে যুধিষ্ঠির

দর্পহারী নাম রাখে অর্জুন সুবীর

ব্রজবাসী বলে তুমি ব্রজের জীবন

অষ্টোত্তর শত নাম পেলো নারায়ণ!!

নন্দের নন্দন নাম রাখিল শ্রীনন্দ

বৃন্দাদুতী দিল নাম বৃন্দাবন চন্দ্র

নয়ানিধি নাম রাখে আতুর সুজন
অষ্টোত্তর শত নাম পেলো নারায়ণ!!
মুনি মনোহর নামে বশিষ্ট যে ডাকে
সংসারের সার নাম বিশ্বামিত্র রাখে
ননী চোরা নাম রাখে গোপ বালা-গণ
অষ্টোত্তর শত নাম পেলো নারায়ণ! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৬)

চ. ছন্দে ছন্দে সুর ধরা দিল
সঙ্গীত এলো ভুবনে
আধা ছিল রাধা পূর্ণ হলো যে
আজিকে যুগল মিলনে
আমার-ই প্রেমের মধুর মূরতি
বরিনু আমার-ই এই মালায়!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭৪)

ছ. যে-হাতে তোর খড়্গ রাজে
সে-হাত বাঁশি বাজিয়েছিল
তুই ভুলেছিস ভোলা শঙ্করী
কী সুর যমুনা নাচিয়েছিল!
রক্তজবা মুণ্ডমালা
আজকে যা তোর কণ্ঠে আছে
সেথায় ছিল রাধার মালা
রাইকিশোরী ছিল কাছে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৮৯)

জ. যখন তখন ইচ্ছে মত ডাকে বাঁশি রাধাকে
মানে না সে কোনোই মানা বাধাকে
তবু তার হয় না সাজা এ নিয়ম কে করেছে?
ও বাজে চড়া সুরে সদর দ্বারে দিনের বেলায়
নিশীথে খিড়কি দোরে ধাক্কা দিয়ে ঘুম যে ভাঙায়
তবু ওই মথুরার রাজবাড়িতে হয় গো রাজা?
ও তো বেশ লোকসমাজে খাতির পেয়ে ঘুরে বেড়ায়
লোকেরা রাধার নামেই মন্দ বলে যা তা রটায়
ও শুধু দূরে বসে মুচকি হেসে দ্যাখে মজা!!
এ নিয়ম কে করেছে?? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৪)

ঝ. পিরীতি রসের খেলা ক'জন জানে খেলিতে
রাধার পরাণ করে আনচান বংশীবাজে কদম তলিতে!
নতুন চোখে তাকায় রাধা নতুন লাগে দিন

আপনা থেকে পায়ের নূপুর বাজে রিন্ ঝিন্ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৯)
চরণ না-ছুঁতে যদি দাও
চরণের ছায়াটুকু সরিয়ে নিও না ঘনশ্যাম
ওখানেই রাখবো প্রণাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৯)

ঞ. বলো রাধা হতে পারে ক'জনায়
সকলেই ভালোবাসে
সকলেই ঘর চায়
কেউ তা পায় না কেউ তা পায়! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৩)
কত লোক কত মানুষ
আছে এই বৃন্দাবনে
দেখেছি লক্ষ ঋষি
লক্ষ সাধু জনে
আমার এই শ্যামটি ছাড়া
শূন্যপুরী এই ব্রজধাম!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৭)

ট. আমার রাধা হওয়া আর হলো না
মীরা হতেও আমি পারিনি
তবু শ্যামের ভজনা আমি
জীবনে কখনো ছাড়িনি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৭)

ঠ. গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে
ছেড়ে দে মা জননী
মাখন চুরি করুক গোপাল
চুরি করে খাক ননী!
ও যশোদা মা

ড. র ছেলেবেলা চলে গেলে
আর তো পাবি না
দইয়ের হাঁড়ি ভেঙে এখন
করুক খেলা নীলমণি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৪)

ঢ. গোপাল রে ও গোপাল
পালারে পালা গোপাল
করিস নে আর মাখন চুরি
যশোদা আসছে ছুটে
ধরবে যে তোর জারি জুরি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৮)

ণ. এ'মনের কৃষ্ণ রাধায় কোনো দিনও

হয়না ছাড়াছাড়ি

এ'দেশে নেই মথুরা নেই দ্বারকা

শুধু বৃন্দাবনের ছড়াছড়ি! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩১-৩২)

এসেছে তোমার-ই রাধা

মঞ্জুল মধুবনে!

নিরখি শ্যামল শশী বৃন্দাবনে!

ত. ধুর মুরলী শুনে স্বপ্ন ভরানো মনে

এসেছে এ-মধু ক্ষণে

মিলিতে পরাণ সাথী কৃষ্ণ সনে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩৬)

থ. কে এসে রাধিকাকে ঠকিয়ে গেলো

সমুখে দেখা দিয়ে লুকিয়ে গেলো

কৃষ্ণকালা সে যে কষ্ণকালা

গলার মালা রাধার গলার মালা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫১)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করছি, রাধা কিংবা কৃষ্ণ পরিবেশ-পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বদলে গিয়ে কবির চিন্তা ও কল্পনার উপযোগী অবয়ব ধারণ করেছে, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কিত পৌরাণিক আবহের সঙ্গে তা কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। পুরোনো প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্গত চিন্তা ও কল্পনার মেলবন্ধনে মানুষের চিরন্তন অনভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে। মহৎ শিল্পস্রষ্টা উত্তরাধিকারকে স্বীকরণের মাধ্যমে নিজের সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র চেহারা দিয়ে নির্মাণ করেন বলেই আমরা পূর্বকালের অভিব্যক্তির আড়ালে তাঁর স্বকালের জীবনাভিব্যক্তির প্রকাশ দেখে পুলক বোধ করি এবং পল্লবিত হই।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে তাঁর গীতবাণীতে আবাহন করেছেন। অর্জুন কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসজাত, যিনি দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে তদানীন্তন বীরগণের মধ্যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের ছদ্মনাম হয় বৃহন্নলা। বৃহন্নলা নামধারণের পূর্বে ক্লীবত্বপ্রাপ্তির ঘটনাটি এইরকম :

> একদা উবর্ক্ষশী অনুরক্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে কৌরববংশের জননী বলিয়া স্বীয় মাতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিলে উবর্ক্ষশী কুপিত হইয়া তাঁহাকে ক্লীব হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন। (অশোক, ১৪১১ : ২)

উর্বশীর অভিশাপ ব্যর্থ হতে পারে না। এই সময় অর্জুন বিরাটরাজের ভবনে অজ্ঞাতে বসবাস করেন এবং বিরাটকন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শেখান। এই অর্জুনকে কবি একালের পটপ্রেক্ষায় তাঁর গীতবাণীতে তুলে ধরেছেন। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করি :

অর্জুনবীর বিরাট গৃহে ছিলেন বৃহন্নলা
শিখেছিলেন রমণীদের সকল ছলাকলা
এতো অর্জুন নয় ঘোমটা পরা পুরুষ লজ্জাবতী
এই ঘোর কলিতে তিনিই মহাসতি। (পৃ. ২৬)

স্বরস্বতী-প্রসঙ্গ ব্যবহার করে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গানের বাণীতে ভিন্নমাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। পুরাণে সরস্বতী বিদ্যা ও কলার দেবী হিসেবে স্বীকৃত। এই দেবী কখনো বীণাপাণি, কখনো ভারতী, কখনো সারদা, আবার কখনো-বা বাগ্‌দেবী হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে। মহাশ্বেতা নামটিও এই দেবীর জন্য প্রযোজ্য। পুলকের গানে এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের নানা পরিচয় মুদ্রিত। কবির অন্তরে সরস্বতী দেবীর অধিষ্ঠান সম্পর্কে কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। দৃশ্যমান দেবীকে আড়াল করা বা কেড়ে নেয়া সম্ভব হলেও তাঁর বিশ্বাসের গভীরে যে দেবী আসন রচনা করেছেন তা অমলিন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :

ক. বীণাপাণির চরণ ছুঁয়ে
আমি আছি বিভোর হয়ে
হৃদয় আমার গান বেঁধে যায়
হৃদয় দিয়েই শোনো তা। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭)

খ. আমারও তো গান ছিল   সাধ ছিল মনে
সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে   থাকবো জীবনে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৫)

গ. সরস্বতীর এই
ছবিটা পারবে খুলে নামিয়ে নিতে
শুধু মায়ের আশির্বাদে   আঁকা যে ছবি
সে-ছবি নামাতে পারবে না!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪১)

পুলকের গীতবাণীতে বারববার শিবের মিথকল্প ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই পৌরাণিক চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। কোন কোন গানে শিব সৌন্দর্যে ও পৌরুষে উজ্জ্বল। শিবকে লোকপ্রবাদের অংশ হিসেবেও ব্যবহার করেছেন তিনি। শিবের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হলে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটতে পারে, তারও প্রকাশ ঘটেছে কোন কোন

গানে। কবির ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে শিবের স্মৃতিচারণ গানে যোগ করেছে ভিন্নতর আস্বাদ। রুদ্র বা শিবের কল্যাণময়ী রূপকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। মানুষের নিয়ত মঙ্গলকামনায় রত এই দেবতা নানা কাজের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলেই তিনি শিব। কবি এখানে রুদ্রের শিবত্বকে উচ্চাসন দিয়ে মানুষের ভাগ্যবদলের দৃঢ় প্রত্যয়কেই প্রবল করে তুলেছেন। মহাযোগীর বেশে তাঁর দেহ ভস্মাবৃত এবং জটাজুটধারী। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'। এই নটরাজের নানা চেহারা চারুকৃত হয়েছে পুলকের গীতবাণীতে। একটি গানে আমরা লক্ষ করছি শিবপত্নী উমা বা চণ্ডীর প্রসঙ্গও শিবের সমান্তরালে উচ্চারিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি গান কিংবা গানের চৌম্বক অংশের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই :

ক. শিব
গৌরী এ-মন শিবের
ব্রত উদ্‌যাপনের দিন পেলো
চোখের পাতায় স্বপ্নে দেখা
তোমার চোখের রঙ এলো (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩৭)

খ. শিব ঠাকুরের গলায় দোলে বৈঁচী ফুলের মালিকা
ওর গলায় দড়ি সকে পরালো বল্‌না গৌরী বালিকা!
আকন্দ ফুল বেশতো ছিল কর্ণে মনোহর
ধুত্‌রার ফুল এনে দিল নন্দী অনুচর
তাই তিন নয়নে দ্যাখেন ভোলা সামনে দেবী কালিকা!
দশভূজার কতই খেলা দ্যাখেন বসে শিব
তখন তিনি মুকুট পরেন কখন কাটেন জিভ
তাই নরলোকে তিনিই দেবী গো-পালে গো-পালিকা!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২১)

গ. –বাবা বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে মহাদেব!
শুনো শুনো পুরবাসী শুনগো সবাই হরপার্বতীর কথা সবারে শুনাই!
হিমালয় কন্যা উমা শিবের চরণে জীবন মরণ তার রাখিল কেমনে!
হিমালয় নন্দিনী পার্বতী মোর নাম
জাগো তুমি ভোলানাথ দাও দরশন
নাই মোর আর কিছু অভিলাষ বাসনা
শুধু মোরে ছুঁতে দাও ওই শ্রীচরণ!
–বলো কেমনে পুরিবে বাসনা তোমার?

আমি ছাই ভস্ম গায়ে মাখি শ্মশানে মশানে থাকি
আমার নাই যে প্রাসাদ নাই যে কুটির বলো তোমায় কোথায় রাখি
আমি যে ভিখারী শিব কী আছে আমার?
–হিমালয় নন্দিনী হয়েছি তপস্বিনী
পরিনিতো মনিহার কনক কাঁকন
নয়নে কাজল নাই নাই কোনো সজ্জা
ভুলে গেছি বিলাসে রমোহ আবরণ!
–ভোলা শিবের সঙ্গে তবে রবম্ ববম্ বলো
ভালোবাসার জ্বালায় তুমি জেনে শুনেই জ্বলো!
–পতির কাছে সতী ছাড়া কী আছে আর বলো?
স্বর্গমর্ত যেথায় খুশি আমায় নিয়ে চলো!
–সঙ্গে আমার চলতে হলে অন্ত পাবে না
যুগে যুগে কালে কালে থামা যাবে না!
–পতির কাছে থাকবে সতী অনন্ত কাল ধরে
পাকা চুলে স্বামীর দেওয়া সোহাগ সিঁদুর পরে!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬২-৬৩)

ঘ. নটবর নাগর তুমি কোরো না মস্করা
তুমি দিনে মারো পায়রা ঘুঘু
ঙ. রাতে মারো চরা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৮)

দুর্গা-প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে পুলকের এমন গীতবাণীর সংখ্যা কম নয়। আমরা জানি এই দুর্গা অবস্থা কিংবা গুণ কিংবা কার্যভেদে নানা নামে পরিচিতা। আমরা এখানে দুর্গার কিছু নামে রএকটি তালিকা উপস্থাপন করতে চাই : উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী,শর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অর্পণা, পার্বতী, মৃড়ানী, চণ্ডিকা, অম্বিকা ইত্যাদি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতবাণীতে দুর্গাকে নানা নামে স্মরণ করেছেন। তিনি দুর্গা-পূজার আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে আন্তরিকতার দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন : ‘শঙ্খ ঘণ্টা নেই মা আমার/নেইকো ধুনো নেই ধুনুচি/বল্ মা শ্যামা আমার পূজায়/ তোর কি তবে নেই মা রুচি’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৫)। আবার শ্যামা-মায়ের চরণতলে ঠাঁই পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে পুলকের কোন কোন গানে : ‘শ্যামা মায়ের চরণতলে/সমাধি মোর কহে হবে/রাঙাজবা হয়ে এ’মন/অনুভবে ঝরবে কবে?’ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ :১৫২)। নিজের জীবনের পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির জন্যও তিনি শ্যামা-মায়ের করুণা ভিক্ষা করেছেন : যে ছিল

পাপের দেশে বদলে দিলে যে তাকে/স্নেহ দিয়ে জীবন গড়ে/তুমি দেবী নাকি দুর্গা /কিছুই বুঝি না মা/শুধু করি তোমাকে প্রণাম!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৮)। দুর্গা-পূজার অন্তর্গত ভাবটিই ধরার চেষ্টা করেছেন কবি। তাই বিসর্জনের নিহিতার্থ উপলব্ধি করে তিনি বলেন : 'বিজয়া কি মায়ের ভাসান/শুধুই সেকি বিসর্জন/বিজয়া যে পতির ঘরে/পুণ্যবতী সতী গমন?' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৮৩)।

একটি গীতবাণীতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রাধিকা-সীতা-পার্বতী-লক্ষ্মী-কমলা-সারদা–সবাইকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন : 'গোলকে রাধিকা সীতায় মিথিলা পার্বতী কৈলাস পরে/বৈকুণ্ঠেতে লক্ষ্মী কমলা সারদা দক্ষিণেশ্বরে!/তুমি মা সারদা অজিতা অমিতা আরাধিতা! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৯)। পুলকের গীতবাণীতে শ্যামা-মায়ের পায়ের চিহ্ন বারবার পড়লেও প্রত্যেকবারই আমরা শ্যাম বা দুর্গা বা পার্বতীকে নতুন রূপে আবিষ্কার করতে পারি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গানেরই প্রধান বিষয় শ্যামা বা দুর্গা। শ্যামা-সঙ্গীতের প্রতি অপরিসীম ভক্তিরই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করি এই গানগুলোতে। নিচের গীতবাণীগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. মায়ের কথা গারে পরাণ
মা যে আমার সামান্য নয়
তার জগদ্ধাত্রী রূপের আলোয়
জগৎবাসী আলোকময়!
পতির অপমানের তরে
দশভুজা হয়ে আবার
আশীষ করে স্নেহের তনয়!
অন্ধপরাণ বোঝে না তার
বহুরূপী রূপের মায়া
অন্নপূর্ণা সাজে কেন
দীন ভিখারী শিবের জায়া;
প্রয়োজনে খড়ুগ হাতে
সেই মা আসে শক্তি দিতে
জীবন তখন আপনি জাগে
মরণেরই মরণ হয়!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯০)

খ. এবারে শ্যামা এলে
ফিরে যেতে আর দেবো না

দরজা দেবো কুলুপ এঁটে
ভাবের ঘোরে ঘুমোবো না!
কালীপূজোর এই টুকু রাত এসেই চলে যায়
মায়ের কাছে থাকতে বসে প্রাণ যে আরো চায়
কালো মায়ের আলো রূপের একটু দেখায় মন ভরে না! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৩)

গ. মঙ্গলময়ী তুই মা শ্যামা
অতুলনা অনুপমা

ঘ. তোরই স্নেহের পরশ মাগো
ভুবন ভরে পাই! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৫)

ঙ. নবমী নিশিরে তোর দয়া নাই রে
(দয়া নাই তোর!)

চ. এতো করে সাধিলাম তবু হইলি ভোর!!
ডম্বরু গুরু গুরু ওই শোনা যায়
ভোলানাম এলো বুঝি নিতে গিরিজায়!
কী কহিব মনোব্যথা শুধাই মহেশ্বরে
তিনটি দিনের বেশি কন্যা থাকে না কার ঘরে
উমাশশী উদয় হইয়া অস্ত যেতে চায়!
ডম্বরু গুরু গুরু... গিরিজায়
এমন সোনার প্রতিমা গো ভাসান হইবে জলে
দু-কূলকে মা আকুল করে কৈলাসেতে চলে
হাসি দিয়া কান্না কত ঢাকি বিজয়ায়?
ডম্বরু গুরু গুরু... গিরিজায়
মহামায়ার মহামায়ার লীলা বুঝি না গো
শুধু বলি আর বছরে আবার এসো মাগো
রইবে জগৎ গৌরীমায়ের আসার সে আশায়!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৭)

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গীতবাণীতে শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশকেও পঙ্ক্তিভুক্ত করেছেন। হিন্দুমতে গণেশ সিদ্ধিদাতা হিসেবে স্বীকৃত। গণেশের সঙ্গে লক্ষ্মীরও শরণ নিয়েছেন তিনি : 'গণেশ ঠাকুর শুঁড় নেড়েছেন/লক্ষ্মী স্বয়ং হাত খুলেছেন/রকেট হয়ে মনটা আমার চাঁদের নাগাল পেতে চায়রে!/ (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮৮-৮৯)। এভাবেই পুলকের গানে শিব-গৌরী এবং তাঁদের বংশধররা নানা অবয়বে উপস্থিত হয়ে একালের মানুষের অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গে পুরাকালের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

রামায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সুর্পণখা। রাবণের ভগ্নি সুপর্ণখার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল রামের ভ্রাতা লক্ষণ। তারপরের লঙ্কাকাণ্ড সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। সেই সুপর্ণখার নাক কেটে যে ভয়ানক বিপদ ডেকে এনেছিল লক্ষণ, সেই নাক কাটা প্রসঙ্গই পুলকের গানে একালের খদ্দেরের দুরবস্থা এবং দোকানীর লোভী আচরণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে :

সুর্পণখার নাক কাটা যায় উই কাটে বই চমৎকার

খদ্দেরকে জ্যান্ত ধরে গলা কাটে দোকানদার (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯৯)

একটি গীতবাণীতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একালের রমণীর নানা রকম কৌশল কিংবা ছলাককলার রূপ দিতে গিয়ে রূপসী রম্ভা অর্থাৎ গৌরীর শরণ নিয়েছেন। সেইসঙ্গে একালের নারীকে তিনি পৌরাণিক চরিত্রের রূপকল্পে নির্মাণ করলেও এই গানে রসিকতার সুরটিই প্রধানরূপে প্রতীয়মান :

ওগো রূপসী রম্ভা উর্বশী করো যা খুশি কিছুতে নিভবে না।

নবনীতা-মাথা মোটা-পার্বতী-মেদবতী আলোরীনা ছিরিহীনা-মালবিকা-শুয়োপোকা

অনুরাধা-বোকাহাঁদা ওরে তাল কানা চোখ তুলে চানা-দ্যাখ ভেল্কী-খানা!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৭)

ভীমের গদার শরণ নিয়ে তিনি নায়কের বিপদের ধরন বোঝাতে চেয়েছেন একটি গানে। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীমের দৈহিক গড়ন যেমন বিশাল ছিল তেমনি তাঁর শক্তিও ছিল অপরিসীম। সেই ভীমের নাম উল্লেখ করে তিনি বলছেন :

ভীমের গদার মত মাথার ওপরে যেটা বন্‌বন্ বন্‌বন্ ঘোরে

ঘা খেয়ে তার-ই গোলাটা পাখির মত আকাশে ওড়ে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৩)

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রটি নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। নারীর শক্তি ও সতীত্ব সম্পর্কে চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই নারী চরিত্রটি। পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত এই চরিত্রের ওপর দুর্যোধন-দুঃশাসনদের অত্যাচারের কাহিনী সর্বজনবিদিত। ঘটনাক্রমে এই নারী পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী হয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদী প্রকৃত প্রস্তাবে অর্জুনকেই ভালোবেসেছে। সেই ভালোবাসা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পদধূলিত হয়েছে। এই চরিত্রের উল্লেখের মাধ্যমে কবি বাংলাদেশের মানুষের অসহায় অবস্থা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে নারী জাতির সম্ভ্রমহানির নানা ছবি তুলে ধরেছেন কবি। †gN‘Z কাব্যের যক্ষপুরীর মতোই এখানে বন্দী জীবনযাপন করছে সাধারণ নারীরা। মানুষের মধ্যে প্রকৃত অর্থে মানবিকতার প্রকাশ নেই। দ্রৌপদীর সম্ভবহানির প্রয়াস ব্যর্থ হলেও এই বাংলা দেশে প্রতিনিয়ত সম্ভ্রম

হারাচ্ছে অসংখ্য নারী। তাই কবির অন্তরের রক্তক্ষরণ দ্রৌপদীর রূপকল্পে এই গীতবাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। পুরো গানটিই এখানে তুলে ধরছি :

এখানে যক্ষপুরীর বন্দীশালায় গান গেয়ে যায় স্বর্ণসীতা
ভালোবাসার পণ্য সাজায় কন্যা মাতা মধূ মিতা
যারা মায়ের জাতির মুক্তি নিয়ে সভায় করে আন্দোলন
তারা সব কোথায় এখন?
এখানে নকল হাসির তুফান ওঠে বুকের কান্না পাথর করে
সন্তান রয় অন্ধকারে হাজার আরো মায়ের ঘরে
যারা পরমান্ন সাজিয়ে করো গোপাল ভোগের আয়োজন
তারা সব কোথায় এখন?
এখানে দ্রৌপদীরা লজ্জা হারায় ওই নারায়ণ নীরব থাকে
নারীর দুচোখ মায়ের ছায়া নীল কাজলে লুকিয়ে রাখে
যারা মাতৃনামের দোহাই নিয়ে পার হয়ে যাও তিন ভুবন!
তারা সব কোথায় এখন?? (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫১-৫২)

সর্ব সম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়কর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীর চরিত্র চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে কবি মূলত মানুষের মর্মের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. আজ লক্ষ্মীমায়ের আলতা পায়ের চিহ্ন কোথাও নাই
শূন্য বুকের বিলাপ শুধু যেদিক পানে চাই!! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৪)

খ. মা লক্ষ্মী
এই ঘর করো মাগো তোমার ঝাঁপি

গ. ভরে তোলো কাণায় কাণায়! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩৪)

লোকপুরাণ ব্যবহারে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। নানা লোককথা, লোকগল্প, লোককাহিনি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তাঁর গানের পসরা সাজিয়েছেন। লোক-প্রসঙ্গ ব্যবহারে গীতবাণী জীবনঘনিষ্ট রূপ লাভ করে। লোককথা বা লোককাহিনিতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা স্ফটিকসংহতি লাভ করে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হলে শিল্পসাহিত্য কালোত্তর অভিব্যক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। নিচের

উদাহরণগুলোকে কোন গল্প বা কাহিনিরই বিস্তৃত বর্ণনা নেই, কেবল কোন একটি চরিত্র বা ঘটনার আভাসমাত্র দিয়েই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বহুদূরবিস্তৃত ঘটনা কিংবা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে দেয়ার প্রয়াস পান :

ক. সুখ নামে শুকপাখীটায় ধরতে গিয়ে
কিনেছি সোনার খাঁচা
যা কিছু সব বিকিয়ে
সোনার শিকল কেটে দিয়ে হায়
সে-পাখী আমার যায় উড়ে যায়
ভাবিনি সেই সে-আশার এই পরিণাম! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮)

খ. পরাগের অনুরাগে মাধবীর স্বপ্ন জাগে
বনানী উঠল সেজে
পারুল আর চম্পা বকুল পলাশে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৩)

গ. বৈশালী নগরের কত উপবনে
কাঞ্চী রাজ্যে আর কোশল দেশে
খুঁজেছি তোমায় আমি কত কত বার (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩১)

ঘ. সাত ভাই চম্পা জাগোরে আর ঘুমিও না অমন করে
মায়াজালের ওই বাঁধন ছিঁড়ে বোনের কাছে ভাই এসো ফিরে! (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪৬)

পুরাণ কিংবা পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ কোন বৃন্তে আবদ্ধ থাকে নি। রামায়ণ, মহাভারত ও লোকপুরাণের নানা প্রান্তে দক্ষতার সঙ্গেই পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পৌরাণিক অভিব্যক্তির সম্মিলনে যে শিল্প রচিত হয়েছে, তা স্বকালের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালের পাঠক-শ্রোতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যদৃপ্ত হয়ে উঠেছে। গীতবাণীতে কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা স্বাস্থ্যকর নয় বলেই, বক্তব্যের সারল্যকে অক্ষত রেখেই পৌরাণিক পৃথিবী থেকে আলোকসঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন তিনি। সেই আলোয় তিনি একালের মানুষের জীবনকে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যে-কোন শিল্পস্রষ্টাকেই জীবননিষ্ঠ হতে হয়, নইলের তিনি অন্যের জীবনের সঙ্গে সেতু রচনার কাজটি সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন না। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জীবনেরই প্রতিভাস রচনা করেছে তাঁর গীতবাণীতে। সেই জীবনভাষ্য রচনায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে বলেই তাঁর গীতবাণীর পুরাণ-প্রসঙ্গ পাঠকের চিন্তা ও কল্পনাপ্রতিভাকে পল্লবিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

Z_¨wb‡'k

১. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৮, ms¯‹Z evsjv Awfavb, সদেশ, কলকাতা।

২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, †MŠixcmb iPbv msMn প্রথম খণ্ড (সম্পাদনা-শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৯১, weò †' : Rxeb I mvwnZ¨, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৪. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, Avgvi wcq Mvb,এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯

৫. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, e×‡'e emi KwеZv : welq I cKiY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), ১৪০৭, eo PÐx'v‡mi Kve¨, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৯৫, max›'bv_ '‡Ëi ceÜmsMn, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), ১৪১২, †cŠiwwYK Awfavb, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।

৯. William J. Handy & Max Westbrook [Ed.], 1976, *Twentieth Century Criticism: The Major Statements*, Indian Edition, Light & Life Publishers. New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Q› ‘

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Q১‘

ধ্বনি ও শব্দের নানামাত্রিক সমবায়-সমন্বয় সংঘটিত হয় কবিতা কিংবা গীতবাণীর সৃজনপ্রক্রিয়ায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কবিকল্পনার বাণীরূপ বেগবান কিংবা প্রাণবন্ত হয় ধ্বনির বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত হলেই। শব্দকে গতিশীল করতে পারলেই তা সুগভীর ব্যঞ্জনায় পাঠকের চেতনায় আলোকসঞ্চার করে। ছন্দ সেই আলোকবর্তিকা যার স্পর্শে কবির সুসংযত ও সুপরিমিত শব্দসজ্জা কোমল, পেলব ও বেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, জড়তা-নিস্প্রাণতা-নিস্প্রভতা অতিক্রম করে শব্দ লাভ করে অপরূপ দীপ্তি ও ধ্বনিমাধুর্য। ফলে ছন্দ-ব্যবহারে সচেতন–সতর্ক হলে যে-কোন কবি বা গীতিকারের সৃষ্টিকর্ম সাফল্যের আলোকপ্রাপ্ত হয়। কথাকে ছন্দে গেঁথে নেয়ার নানা কৌশল কবিকে রপ্ত করতে হয়। তা না হলে পাঠকের বা শ্রোতার অন্তরে তা মুক্তির আনন্দ দিতে পারে না। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক –

> আমরা ভাষায় বলে থাকি কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৫০)

কবি বা গীতিকারকে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয় ব্যক্তিগত ভাবনাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার প্রয়োজনেই। শিল্পস্রষ্টার যে আবেগ ও প্রজ্ঞা সৃষ্টিকর্মে বিধৃত হয়, তাতে বেগ সঞ্চারিত না হলে পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে বোঝাপড়ার সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ছন্দ-বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় তাঁকে। যে কোন সৃজনশীল মন স্বভাবতই পরীক্ষা-প্রবণ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীতবাণীর প্রকরণ-প্রকৌশলে অভিনবত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলা গানে পদার্পণ করেছেন। তাঁরা বাংলা ছন্দের নিরূপিত কাঠামোতেই নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সঙ্গীতপিপাসু এবং সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

> ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব – ছাড়া, বাঁধা, আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাঁদ, চাঁদোয়া। ছেঁড়ে বাঁধি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেঁড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের – ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য আনন্দ – কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।

> ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার। (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ৪৬–৪৭)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ করা যায়, তিনি ছন্দের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, নিস্ফল, নিরানন্দ কাজে মানুষ যেমন হাঁপিয়ে ওঠে, তেমনি ছন্দহীন কবিতার রাজ্যেও পাঠকের অবাধ আনাগোনা অসম্ভব। সুভাষের মতে, 'চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম' (১৯৮৪ : ৪৭)। ভাব ও ভাষার সুদৃঢ় বন্ধন ছন্দের পৌরোহিত্বে কতোটা প্রবল এবং প্রাণবান হতে পারে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ-পর্যায়ে আমরা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ছন্দের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

A¶ieË Q›`

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। অক্ষরবৃত্তই তাঁদের গীতবাণীর প্রধান ছন্দই। এই ছন্দে যুক্তবর্ণের বহুল ব্যবহারে বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে সুযোগ রয়েছে তাঁরা তা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কয়েকটি গীতবাণী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁদের গীতবাণীর ছন্দের দোলা অনুভবের চেষ্টা করবো।

†MŠixcmb gRg‘vi

K. বাসরের দীপ আর | আকাশের তারাগুলি — ৮.৮
নিবিড় নিশিথে যবে | জ্বলবে — ৮.৩
মনে হয় কাছে এসে | শরমের বাধা ভুলে
আমায় মনের কিছু | বলবে — ৮.৩ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৩০)

খ. পাখি জানে ফুল কেন | ফোটে গো — ৮.৩
ফুল জানে পাখি কেন | গান গায় — ৮.৪
রাত জানে চাঁদ কেন | ওঠে গো — ৮.১০
চাঁদ জানে রাত কার | পানে চায় — ৮.৪ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৫৭)

গ. পথ থেকে পথে হেঁটে | পাশাপাশি — ৮.৪
নতুন জীবন কোনো | চলে দেখে | আসি — ৮.৪.২
তোমাকে নিজের করে | যেন কাছে | পাই — ৮.৪.২

তুমি আমি চলে চলে | যাই ৮.২ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১২৬)

ঘ. তীর ভাঙা ঢেউ আর | নীড় ভাঙা ঝড় ৮.৬

তারই মাঝে প্রেম যেন | গড়ে খেলাঘর ৮.৬ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১৯৭)

cjK e‡›'¨vcva¨vq

ক. গানে গানে কতবার | এই কথা কয়েছি ৮.৭

আমরা দুজনে শুধু | দুজনার ৮.৪

এই গান শুনে ওরা | দিয়ে গেছে অপবাদ ৮.৮

হাসি মুখে তাই আমি | সয়েছি ৮.৩ (পুলক ১৪০৯ : ৪৮)

খ. সুরের আসর থেকে | মন নিয়ে এসেছি গো ৮.৮

ফুলের বাসর ঘরে | বন্ধু ৮.৪

পারো তো ধরো না মোরে | বাঁধো না মালার ডোরে | বন্ধু ৮.৮.২ (পুলক ১৪০৯ : ৬৬)

গ. পারো যদি ফিরে এসো ৮

তোমারই থাকবো আমি | তখনো ৮.৩

হাজার বদল হোক | পৃথিবীর ৮.৪

পুরোনো হবে না প্রেম | কখনো ৮.৩ (পুলক ১৪০৯ : ৯৪)

ঘ. আবার হবে তো দেখা ৮

এ-দেখাই শেষ দেখা | নয় তো ৮.৩

কী চোখে তোমায় দেখি ৮

বোঝাতে পারিনি আজো | হয়তো ৮.৩ (পুলক ১৪০৯ : ১০৪)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা লক্ষ করার মতো। বাংলা অক্ষরবৃত্তের 'স্বাভাবিক বাচন তৈরি'র ক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ গীতবাণীতে দূরসঞ্চারি প্রভাব ফেলেছে- এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, 'আমার নিজের বিশ্বাস যে আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৯৩)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত দখল তাঁদের গীতবাণীকে কবিতার সহযাত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

gvÎveË Q›'

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতিও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষপাত লক্ষ করার মতো। তাঁদের বিপুলসংখ্যক গীতবাণী মাত্রাবৃত্তে রচিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কথ্যঢঙ-এর প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁরা এই ছন্দে বিশিষ্টতা আরোপের চেষ্টা করেছেন। চলতি ক্রিয়াপদের সফল ব্যবহার তাঁদের গীতবাণীর শরীরকে সচল, সমৃদ্ধ এবং স্বাবলম্বী করে তুলেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের পরিমিত অভিঘাতে তাঁদের গীতবাণীতে সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্ন দোলা, যা তাঁদের ছন্দ-ভাবনার অন্যতম কুললক্ষণ বলে মনে হয়।

মাত্রাবৃত্তের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে পাঠক-শ্রোতার কল্পনাপ্রতিভা যেমন আন্দোলিত হয়েছে, তেমনি মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে অভিনবত্ব। শব্দের শরীরে আপন অনুভবের শক্তি সঞ্চারিত করে তাঁরা নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিচিহ্নিত কাব্যভুবন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী থেকে কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে :

†MŠixcmb gRg‘vi

ক.	আসিবে কি তুমি | এই পথে আর	৬.৬
	শুধায় হৃদয় | শুধু বার বার	৬.৬
	তবে কিগো তুমি | ঠিকানা আমার	৬.৬
	বলো পেলে না	৬ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৭)
খ.	কথা দিয়েছিলে | আসিবে গো ফিরে	৬.৬
	চাঁদ জাগে দূরে | আকাশের তীওে	৬.৬
	তাই তোমারেই | আমি বারে বারে	৬.৬
	পিছু ডাকি	৪ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৮)
গ.	কে তুমি আমারে | ডাকো	৬.২
	অলখে লুকিয়ে | থাকো	৬.২
	ফিরে ফিরে চাই	৬
	দেখিতে না পাই	৬ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ২৩)
ঘ.	আমাদের গান | শুনেছে রাতের | ফুল	৬.৬.২
	মোদের মিলন | দেখেছে সন্ধ্যা | তারা	৬.৬.২
	মোর দেয়া তব | কণ্ঠের মালা | হতে	৬.৬.২
	সৌরভ লুটে | বাতাস আপনর | হারা	৬.৬.২ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২: ৩২)
ঙ.	ভালোবাসা যদি | অপরাধ হয়	৬.৬.
	আমি অপরাধি | তবে	৬.২
	জানি তার মাঝে | আমার হৃদয়	৬.৬.
	সুন্দর তবু | হবে	৬.২ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৬৮)

cjK e‡›`¨vcva¨vq

K.	কোথা যে বাঁশরী | বাজে	৬.২	
	এলো সেকি মন | চোর ছায়াঘন | সাঁঝে	৬.৬.২	(পুলক ১৪০৯ : ১৫৬)
খ.	আঁচল ভরায়ে | নিয়েছো কুড়ায়ে	৬.৬	
	ঝরা শেফালিকা | কলি	৬.২	
গ.	তো নহে ফুল | হোয়োনা বেভুল	৬.৬	
	ওকে আমি 'মন' | বলি	৬.২	(পুলক ১৪০৯ : ১৬০)
ঘ.	ঠিকানা না-রেখে | ভালোই করেছো | বন্ধু	৬.৬.৩	
	না আসার কোনো | কারণ সাজাতে	৬.৬	
	হবে না তোমায় | আমার	৬.৩	(পুলক ১৪০৯ : ১৮০)
ঙ.	হয়তো আমাকে | কারো মনে নেই	৬.৬	
	আমি যে ছিলাম | এই গ্রামেতেই	৬.৬	
	এই মাটিতেই | জন্ম আমার	৬.৬	
	তাই তো ফিরে | এলাম আবার	৬.৬	(পুলক ১৪০৯ : ১৮২)
চ.	সেই দুটি ফুল | ফুটলো আবার	৬.৬.	
	ভরে গেলো ফুল | বীথি	৬.২	
	আবার এলো যে | সাধের মিলন | তিথি	৬.৬.২	
	পৃথিবীর সীমা | যতো বড়ো হোক	৬.৬	(পুলক ১৪০৯ : ২০২)

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর উদ্ধৃতিসমূহে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁদের অধিকাংশ মাত্রাবৃত্তের কবিতায় ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব থাকলেও অপূর্ণ পর্বে মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি করে চমৎকারিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন।

¯^ieË Q›`

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম দিকে এই ছন্দের প্রতি কোন আগ্রহই দেখান নি তাঁরা। ধারণা হয় যে, এই ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা তখনও আশাবাদী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ Q›` গ্রন্থে স্বরবৃত্ত ছন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের প্রথম পর্বে খেয়ালের বশে নয়, প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে ছন্দ যা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ হিসেবে স্বীকৃত। সভ্যতার বিকাশে চাকার গুরুত্বের সঙ্গে ভাষার বিকাশে ছন্দের গুরুত্ব তুলনা করে তিনি বলেছেন –

> মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা-বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে ভাষার দেনা পাওনা। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ১৮৩)

লোকসাহিত্যের নানা কাহিনী বা অনুষঙ্গ তাঁরা সমসাময়িক কোন অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত করে ছড়ার ছন্দে গীতবাণী লিখেছেন। লোকজীবনের স্পন্দনে সমৃদ্ধ এই সব গীতবাণীতে তাঁদের সমাজভাবনার পরিচয় যেমন বিধৃত হয়েছে, তেমনি শিল্পী হিসেবে ঐতিহ্যের দায়বদ্ধতাকেও তাঁরা স্বীকার ও স্বীকরণ করেছেন। কখনো-বা সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তাঁরা স্বরবৃত্ত ছন্দে গ্রথিত করেছেন। স্বরবৃত্তের সুর লঘু হলেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরবৃত্ত ছন্দের গীতবাণী নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে ধারণ করেছে। তাঁদের স্বরবৃত্তে আড়ষ্ঠতা নেই বলেই সকল বিষয়কেই তা গতি দিতে পেরেছে। চলতি ভাষার স্বভাবের অনুগামী এই ছন্দ একদা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তা আধুনিক বাংলা কবিতায় বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলা প্রাকৃত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ চাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা মুখের ভাষায় গতিসঞ্চার করে ভাবের আদানপ্রদানে অভিনবত্ব এনেছে। প্রসঙ্গত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণী থেকে স্বরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক :

†MŠixcmb gRg'vi

ক.	আমার জীবন | যেন একটি |খাতা	৪.৪.২	
	শেষ কটি |যার পাতা |নেই	৪.৩.১	
	হয়তো ছিল| অনেক কিছুই	৪.৪	
	শেষ কটি| সেই পাতা | তেই	৪.৪.১	(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১)
খ.	ফুলের কানে | ভ্রমর আনে	৪.৪	
	স্বপ্নভরা | সম্ভাষণ	৪.৩	
	এই কি তবে | বসন্তেরই | নিমন্ত্রণ	৪.৪.৩	(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১৪)
গ.	আকাশ আমায় | ডাক দিয়েছে	৪.৪	
	নতুন নিমন্ত্র | ণে	৪.১	
	বাতাস আমায় | জড়িয়ে ধরে	৪.৪	
	প্রাণের আলিঙ্গ |ণে	৪.১	(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৩৯)
ঘ.	আমার পায়ে | লাগবে ধুলো	৪.৪	
	তাই বলে কি | বকুলগুলো	৪.৪	

পথের পরে | অমন করে ৪.৪

লুটিয়ে আছে | হায় ৪.১ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৬৬)

ঙ. এক পলকে | একটু দেখা ৪.৪

আরো একটু | বেশি হলে | ক্ষতি কি ৪.৪.৩

যদি কাটেই | প্রহর পাশে | বসে ৪.৪.২

মনের দুটো | কথা বলে | ক্ষতি কি ৪.৪.৩ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ৮৫)

চ. আয়না বসা | চুড়িগুলো | ঝিলিক মারে– ৪.৪.৪

এ যেন আ| মারই মনের| খুশি, ৪.৪.২

একটু চাঁদের | একটু উঁকি– ৪.৪

মেঘের পারে। ৪ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১১৭)

ছ. হাটে যদি | হারিয়ে যেতাম ৪.৪

তোমার হতো | কি? ৪.১

পুরুষ হয়ে | বলতে মুখে ৪.৪

বাঁধে না তো | ছিঃ ৪.১ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১২২)

জ. মালায় বেঁধে | যদি ভাবি | দেব না আর | পালাতে ৪.৪.৩

কাছে পেয়ে | মরি যে তার | দুজনারই | জ্বালাতে ৪.৪.৩ (গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ১৪৩)

cjK e‡›'¨vcva¨vq

ক. গান ফুরালো | জলসাঘরে ৪.৪

অমন করে | আর ডেকো না ৪.৪

নিভলে রঙিন | ঝাড়লণ্ঠন ৪.৪

নেভার পরে | আর দেখো না ৪.৪ (পুলক ১৪০৯ : ৫)

খ. যদি আকাশ | হতো আঁখি ৪.৪

তুমি হতে | রাতের পাখি ৪.৪

উড়ে যেতে | যেতে আবার | কোথাও ৪.৪.২ (পুলক ১৪০৯ : ১৪)

গ. দেখা হতো | নাকি ৪.২ (পুলক ১৪০৯ : ১৫)

শিশমহলে | রোশনি জ্বলে | রংবাহারি | ফুল ফোটে ৪.৪.৪.২

দিলদরদী | দিলরুবাতে | খুশ খোয়াবের | সুর ওঠে ॥ ৪.৪.৪.২ (পুলক ১৪০৯ : ১৯)

ঘ. শুনুন শুনুন | বাবু মশাই ৪.৪

আজকে আমি | গল্প শোনাই ৪.৪

নিজের চোখে | যা দেখেছি | তাই নিয়ে এক | কাহিনী গাই! ৪.৪.৪.৪ (পুলক ১৪০৯ : ৬৬)

ঙ. কথা ছিল | ভালোবাসায় | আসবো আমি | মালা নিতে ৪.৪.৪.৪

তুমি শুধু | ডাকবে আমায় | অবহেলার | জ্বালা দিতে ৪.৪.৪.৪
পথেই শুধু | পথ হারালাম ৪.৪
নিরুদ্দেশে| গেলাম না ৪.৩
ভালোবাসা | অনেক পেলাম ৪.৪
ভালোবাসা | পেলাম না ৪.৩ (পুলক ১৪০৯ : ৫৪)

চ. তোমায় কেন | লাগছে এতো | চেনা ৪.৪.২
এতো আপন | ভাবছি কেন | তোমায় ৪.৪.২
বলতে পারো | প্রথম দেখা | কোথায়? ৪.৪.২

ছ. কবে কখন | শিপ্রানদীর | তীরে ৪.৪.২ (পুলক ১৪০৯ : ৮১)
মনের মানুষ | ফিরলো ঘরে | একটু বেশি | রাতে ৪.৪.৪.২
লাজুক লতার | ফুলের মধু | ঝরলো আঙি | নাতে ৪.৪.৪.২ (পুলক ১৪০৯ : ১০০)

উদ্ধৃতিসমূহে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম প্রকৃতি তথা জীবনভাবনারই নানা প্রান্ত ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। মিল বিন্যাসে বা মিল বর্জনে, মূল পর্ব এবং অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করে তাঁরা এই ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। স্বরবৃত্তের নিরূপিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা গীতবাণীর পঙ্ক্তিকে গভীর ব্যঞ্জনায় আন্দোলিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

একজন কবির ছন্দ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ থাকলেও একজন গীতিকারের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ অবারিত নয়। একজন গীতিকার কখনোই ভোলেন না যে, তাঁর এই বাণীতে সুর আরোপিত হয়ে শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশের প্রয়াস পাবে। তবুও সুর ও ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন তাঁরা। বাংলা ছন্দের নিরূপিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। স্বরবৃত্তের আড়ষ্টতা অতিক্রম করে তাকে তাঁরা অনায়াসে গভীর ও নিগূঢ় ভাবের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অক্ষরবৃত্তই গীতবাণীর প্রধান অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরা স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে মানবজীবনের নানা অনুষঙ্গ এবং বিবিধ সামাজিক অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর তা প্রকাশের জন্য তাঁদের কাছে সবচেয়ে উপযোগী বিবেচিত হয়েছে অক্ষরবৃত্ত। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছন্দের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাঁদের গীতবাণী সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁদের গীতবাণীর পাঠ করতে গিয়ে আমরা কবিতার আস্বাদনেরই আনন্দ লাভ করতে পারি।

Z_¨wb‡‘k

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন রচনা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ১৯৯২।

২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন গীতি সমগ্র প্রথম খণ্ড (সম্পাদনাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার) গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, করকাতা, ২০০৩।

৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯।

৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত,NwY‡mv‡Z, mRbxiv‡M, ১৯৯১,প্রতিভাস, কলকাতা।

৫. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৯, Kv‡ji cZj, নিউ এজ সংস্করণ, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, e×‡‘e emi KweZv : welq I wkíi|c, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২, iex›‘ iPbvejx, অষ্টম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৬, cbð, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬, Q›‘, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক–প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

১০. শঙ্খ ঘোষ, ১৩৭৮, wbtk‡ãi ZRbx, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা।

১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৪, A¶‡i A¶‡i, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

†MŠixcmb gRg‘vi Ges cjK e‡›‘¨vcvav‡qi Mvb-wel‡q gvV chv‡q M‡elYv †_‡K cvß Z_¨ ev mv¶vrKv‡ii ¸iæZcY Ask ms‡hvRb

পঞ্চম অধ্যায়

†MŠixcmb gRg'vi Ges cjK e‡›'¨vcva¨v‡qi Mvb-wel‡q

gvV chv‡q M‡elYv †_‡K cvß Z_¨ ev mv¶vrKv‡ii ¸iæZcY Ask ms‡hvRb

সংযুক্তি ১

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সংস্কৃতি মঞ্চ, কলকাতা ৫ ডিসেম্বর ২০১০ একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করে। সংস্কৃতি মঞ্চের প্রকাশনা থেকে

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সম্পর্কিত

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ এখানে সংযুক্ত করা হলো

m¤úv'‡Ki Kjvg

আমাদের সংগঠনটির বয়স বেশি নয়। ২০০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি প্রধানত অঞ্চলের গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গুনগ্রাহীদের নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। বরণীয় গীতিকার-কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সৃষ্টির সংরক্ষণ ও তাঁর সৃষ্টির চর্চা ও প্রচার করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি আমরা। সময়ের দাবিকে মনে রেখে সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই গান-কবিতা-নাটক-চিত্রাঙ্কনের মত বিষয়গুলির নিয়মিত চর্চা এবং এ বিষয়ে নতুন প্রতিভার উন্মেষে সহায়তা করা আমাদের কর্মসূচি।

২০০৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, যা সুধীজনের সাধুবাদ অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের স্মরণ মননের আয়োজন হয়। তাঁর লেখা গান ও বাংলা গানের জগতে তাঁর অবদান সঙ্গীতসহ আলোচনা করেন শিল্পী শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায়, শ্রী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুদীন সরকার ও অন্যান্য প্রখ্যাত শিল্পীগণ। গৌরীপ্রসন্নে অভিন্নহৃদয় বন্ধু শিল্পী শ্যামল মিত্রের সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সৈকত মিত্র সঙ্গীত পরিবেশন ও স্মৃতিচারণ করেন। সঙ্গীত গবেষক শ্রী শচীদুলাল দাশ ও শ্রী সিদ্ধার্থ গুপ্ত গৌরীপ্রসন্নের গানের উপরে একটি তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থিত করেন। অনুষ্ঠানে ২১ শে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য ও গৌরীপ্রসন্ন বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী নিমাই ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার তদানিন্তন মেয়র শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও অঞ্চলের জননেতা শ্রী বুদ্ধদেব বসু। ভিন্ন স্বাদের ঐ অনুষ্ঠান, অঞ্চলে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে ছিল।

ঐ অনুষ্ঠান মঞ্চে আমরা ঘোষনা করেছিলাম অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের অঞ্চলের গর্বের মানুষ বাংলা গানের সোনালি যুগের অমর গীতিকার কবি গৌরীপ্রসন্নের একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব। আমরা খুশী,

মাত্রা একবছর কালের মধ্যে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারি বরণীয় এই গীতিকার কবি গৌরীপ্রসন্নের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

আমাদের প্রত্যাশা ও দাবী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ ভাস্কর শ্রী গৌতম পালকে দিয়ে মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সরকার রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন। এইকাজে বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী। এই অবকাশে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১০ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি এক সঙ্গীত ও আলোচনা সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে গৌরীপ্রসন্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিল্পী শ্রীমতী হৈমন্তী শুক্লা ও শ্রীমতী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গানে গৌরীপ্রসন্নের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রী তরুণ মজুমদার। ভাবগম্ভীর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রী বুদ্ধদেব বসু, শ্রীমতী দীপা রায়, শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ দস্তিদারসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। যাঁরা বাংলা গান ভালবাসেন, যারা বাংলা সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ও সর্বপোরি যাঁরা অমর গীতিকার গৌরীপ্রসন্নের অনুরাগী, দেশ-বিদেশের এমন অসংখ্য মানুষ আমাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ধন্য করেছেন।

প্রতিশ্রুতি মত আমরা গৌরীপ্রসন্নের একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করছি। সাধ্যমত এর গুণমান উন্নত করার চেষ্টা করেছি। এ কাজে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দাতা ও প্রতিষ্ঠান। বিশেষভাবে 'চরণ' প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীগণ যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে গৌরীপ্রসন্ন সংস্কৃতি মঞ্চ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

৫ ডিসেম্বর, ২০১০ — ধন্যবাদান্তে

কলকাতা — কমল চক্রবর্তী

সম্পাদক, গৌরীপ্রসন্ন সংস্কৃতি মঞ্চ

সংযুক্তি ২

ÒAvMvgx cw_ex Kvb †c‡Z Zvwg †kv‡bvÓ

kPx‘jvj ‘vk

যদি ধরে নেওয়া যায় ১৯৪৫/৪৬ সাল থেকে বাঙলা গানকে মোটামুটি সচেতন ভাবে শুনছি, তাহলে আমার শ্রোতাজীবনে বহু গীতিকার-সুরকারের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। আজ জীবনের পড়ন্তবেলায় গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে নিয়ে দু-চারটি কথা লিখতে বসেছি। প্রথমেই বলি ওই বিশাল সময়টার প্রায় সব গীতিকারই কম বেশি কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। গৌরীপ্রসন্নর কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে 'শিশু-সাথী' পত্রিকায় ছোটবেলার তাঁর কবিতা পড়েছি। পড়েছি কবিতা হিসেবেই সুনির্মল বসু, প্রভাত দেবসরকার, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দত্ত বা হাসিরাশি দেবীর পাশাপাশি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কবিতা পড়েছি, যেগুলোর দুয়েকটি পরে গান হয়েছে। সলিল চৌধুরীর কয়েকটা লাইন মনে পড়ে-কবিতা হিসেবে পড়েছিলাম। ওই লাইনগুলো পরে একটি গানেও পেয়েছি। কবি গৌরীপ্রসন্ন কখন থেকে গান লিখতে লিখতে একজন সফল গীতিকাররূপে পরিগণিত হলেন, সে খবর তখন আমরা রাখতাম না। যে কারণে পরবর্তী সময়ে বিস্তর তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। তাঁর রচিত আমার শোন প্রথম গানটি সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে গেয়েছিলেন অপরেশ লাহিড়ি। গানের প্রথম কটি কথা- ' ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় আমি অপরাধী তবে।' গানটি রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছিল ১৯৪৭ সালে। গড়পড়তা লিরিকের এই গানে সুরকারের সূক্ষ্ম অলঙ্করণ প্রয়োগের কিছুটা জায়গা অবশ্যই ছিল এবং সেটুকু লাগাতে সুধীরলাল কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি। গায়ক অপরেশও যথাসাধ্য গানের সাথে মিশে গিয়ে গাইতে পেরেছিলেন, যার ফলে গানটি শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে-গানটি পূজোয় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বছরেই সত্য চৌধুরীর পূজোর গান ছিল নিজের সুরে গাওয়া গৌরীপ্রসন্নর গান- 'পথে পথে ঐ বকুল পড়িছে ঝরিয়া'।

গৌরীপ্রসন্নর সৃজনশীলতা প্রতিভা যে সময়ে বিকাশলাভ করছিল, সেটা ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়। সারা দেশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন টগবগ করে ফুটেছে। একদিকে রবীন্দ্রনাথের বহু সংখ্যক গণচেতনা উদ্দীপক ও দেশাত্মবোধক গান জনহৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, রয়েছে নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গণজাগরণের গান, এরই মধ্যে ১৯৪৬ সালে মানুষ অবাক হয়ে শুনল শ্যামল গুপ্ত রচিত জগন্ময় মিত্রের পূজোর গান- 'অন্তবিহীন নহে তো অন্ধকার' এবং 'প্রণাম তোমায় হে নির্ভয় প্রাণ' মোহিনী চৌধুরী রচিত 'জেগে আছি একা কারাগারে' গাইলেন সত্য চৌধুরী। ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পূজোর গান লিখলেন মোহিনী চৌধুরী 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' এবং কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী'। এই মোহিনী চৌধুরী-ই ১৯৪৫ সালে সত্য চৌধুরীর গাওয়া পূজোর গানে লিখেছিলেন 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়'। বাণীর উপাসক গৌরীপ্রসন্ন কিন্তু তৎক্ষণাৎ জোর করে ওই জোয়ারে গা ভাসালেন না। করলে

সেটা গান কতটা হত বলা শক্ত, কিন্তু কাজটা হঠকারিতাই হত। গৌরীপ্রসন্নও সময়ের ডাকে দেশ ও জাতির জন্য গান লিখেছেন। কিন্তু সেটা অনেক পরে। স্বাধীনতার আগে ও পরে সেই সময়টাতে গৌরীপ্রসন্ন কি করলেন সেটা দেখা যাক। তিনি যেটা করলেন সেটা প্রকৃত সৃজনশীল প্রতিভারই কাজ তিনি খুব মনোনিবেশ সহকারে ধীরে ধীরে তাঁর সৃষ্টবস্তুতে অভিনবত্ব আরোপ করতে শুরু করলেন। যার অনিবার্য ফল হিসেবে তাঁর রূপকর্ম কিছু না কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হতে লাগল। সঙ্গীতের মত গতিময় শিল্পে এ ধরণের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্রকে শ্রোতারা বিশেষ ধরণের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আধারে উপলদ্ধি করেন। গৌরীপ্রসন্নকেও শ্রোতারা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে চিনতে শুরু করলেন এবং অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন যে সুরকারের সুরের অভিমুখ এবং তাঁর কথার অভিমুখ পরম আত্মীয়তায় বাঁধা পড়ছে। এমন বহু গান আছে যা শুনে মনে হয় সুরকারের যে সাঙ্গীতিক শিক্ষা বা সঙ্গীতানুরাগী মন আছে, গীতিকার গৌরীপ্রসন্নর রচনায় তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। আবার মনের সঙ্গে সংলগ্ন নয় এমন কোনো সাহিত্যই হতে পারে না, তা সে রোমান্টিক সাহিত্যই হোক বা বাস্তববাদী সাহিত্যই হোক। রচনাকে মনের সংলগ্ন রাখার ব্যাপারে গৌরীপ্রসন্ন সব সময়েই একটা তাগিত অনুভব করতেন।

গৌরীপ্রসন্নর গীতিকার-সত্তা উন্মোচিত হয়েছিল বেসিক গান এবং ছায়াছবির গানের মধ্যে একই সময়ে, পাশাপাশি। প্রথম যে ছায়াছবিতে গীতিকার হিসেবে তিনি কাজ করেন সেটি ছিল পূর্বরাগ (১৯৪৭)। সুরকার ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। লক্ষ করবার মত বিষয় হল এই যে প্রথম সাতটি ছবির মধ্যে পাঁচটিতেই তাঁর সুরকার ছিলেন হেমন্ত। মাঝে দুটি ছিল জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং শচীনদেব বর্মণের সুরারোপে। এই পাঁচটি ছবিতে মাত্র চার বছরের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার সময়ে শুধু যে সুরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া তৈরি হল, তাই নয়। সুরকারের সুরের অভিমুখ এবং তাঁর শিল্পীমনের ভাষাকে সযত্নে অনুধান করবার সুযোগও তাঁর ঘটল। এই বোঝাপড়ারই ছিল গৌরীপ্রসন্নর গীতরচনার প্রাণস্বরূপ। উত্তরকালে অন্য অনেক সুরকারের মত হেমন্ত মুখেঅপাধ্যায়েরও প্রথম পছন্দের গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। ১৯৪৯ সালে অনুপম ঘটকের সুরে 'আকাশ মাটি ওই ঘুমালো' কিংবা '১৯৪৭ সালে শচীন দেববর্মণের সুরে 'বঁধু গো এই মধুমাস' তাঁর দ্রুত পরিণত হবার সাক্ষ্য বহন করে। শচীনদেব বর্মণের সুরে তাঁর আরো কিছু রচনা সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে 'মালাখানি ছিল', 'আজো আকাশের পথ বাহি', ও জানি ভ্রমরা কেন', দূর কোন পরবাসে', 'ঘুম ভুলেছি', 'বাঁশি শুনে আর,' 'আঁখি দুটি মরে হায়' প্রভৃতি উল্লেখ দাবী রাখে। এ সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছি। চল্লিশের দশকে রাসবিহারী মোড়ের 'মেলোডি' ছিল সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বদের প্রিয় আড্ডা কেন্দ্র। 'মেলোডি'র মালিক সুধীর চক্রবর্তী নিজে ছিলেন সঙ্গীত রসিক মানুষ। তখনকার কলকাতার অনেক শিল্পী গীতকিার-সুরকার সেখানে আড্ডা জমাতেন। শচীন দেববর্মণ কলকাতায় এলে সেখানে নিয়মিত হাজির থাকতেন। আসতেন সুধীরলাল চক্রবর্তীও। তরুণ গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন তখন ছাত্র। কিছু গান লিখে সঙ্গীত মহলে প্রতিশ্রুতিবান বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছ শচীনকর্তার গলায় তাঁর দুয়েকটা গান হোক। চল্লিশের দশক তখন

দ্বিতীয়ার্ধে। সে সময় এক তরুণ গীতিকারের এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কি হতে পারত? শচীন দেববর্মণের সঙ্গে সুধীরবাবুর বন্ধুত্বের কথা বিলক্ষণ জানা ছিল গৌরীপ্রসন্নর। সুধীরবাবুকে উনি বললেন শচীনদে বর্মণকে ওর হয়ে বলার জন্য। সুধীরবাবুও শচীনদেব বর্মণকে তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ জানালেন গৌরীপ্রসন্নর হয়ে। দশটা গান নিয়ে যাবার ফরমাশ পেয়ে সেরা দশখানা গান বেছে নিয়ে গেলেন গৌরীপ্রসন্ন। হুকুম হল পরদিন যাবার। পরদিন দুরুদুরুবক্ষে গিয়ে শুনলেন, একখানা গানও পছন্দ হয়নি। 'কাইল আরো দশখানা গান বাইচ্ছ্যা আনো, দেখ যদি মনে ধরে'। মন ভেঙে গেছে, তবু পরদিন দ্বিতীয় সেরা দশখানা গান বেছে নিয়ে গেলেন গৌরীপ্রসন্ন। ওপরে যাবার ডাক পেয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হবার পালা। ওপরের ঘরে বসে তাঁরই গান গাইছেন শচীনদেব বর্মণ। গান থামিয়ে বললেন 'কাইল তুমি যাওনের পরে মীরা কইলা তোমার এই গানখান মন্দ হয় নাই। আইজ সকালেই সুর করছি।' এরকম একটা মুহূর্তে গীতিকার গৌরীপ্রসন্নর জীবনে আর এসেছিল কিনা সন্দেহ।

গৌরীপ্রসন্নর রচনায় বিশেষ কয়েকটি লক্ষণীয় বস্তু হল শব্দচয়নের বিশিষ্টতা, লিরিক কাঠামোর বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি অধিকাংশ গানেই সুরের বাইরেও একটা সুখপাঠ্য ছন্দ আছে। তাঁর রচিত অসংখ্য বেসিক গানের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কয়েকটি উল্লেখ না করলেই নয়। এর মধ্যে আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'তোমার আমার কার মুখে কথা নেই,; 'আমার গানের স্বরলিপি', অলির কথা শুনে,' 'মেঘ কালো আঁধার কালো,' সাবিত্রী ঘোষের 'কাঙালের অশ্রুতে যে', 'শচিতন গুপ্তর 'সারারাত জ্বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ', ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'বাসরের দীপ', 'দোলো শাল পিয়ালের বন', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ' ও ঝরা পাতা এখনি তুমি', আজ কেন ও চোখে লাজ কেন', সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'এখনো আকাশে চাঁদ', 'বালুকা বেলায় ঝিনুক কুড়াই', মান্না দের 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল', 'তুমি আর ডেকো না', অখিলবন্ধু ঘোষের 'মায়ামৃগ সম;, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়ের 'একটি দুটি তারা করে উঠি উঠি', উৎপলা সেনের 'ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়', শ্যাল মিত্রর 'মহুল ফুলে জমেছে মৌ,' 'ওই ঝিরিঝিরি পিয়ালের', 'সেদিনের সোনা ঝরা', 'তোমার এই ধূপছায়া রঙ', প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' এ শুধু ভুলের বোঝা', তালাত মাহমুদের 'আলোতে ছায়াতে', লতা মঙ্গেশকরের 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে', দূরে আকাশ সামিয়ানা', গায়ত্রী বসুর 'ওই বাজে কিনিকিনি রিনিঝিনি, দীপক মৈত্রের ' এ তো শুধু নয় গান', শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের ' এ মন আমার যেন, সুধীর সেনের 'রাত হল নিঝুম' মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের 'ওগো শুনি তব বাঁশি', সুপ্রীতি ঘোষের 'যাই যে চলে,' আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আকাশ আর এই মাটি ঐ'- এমন অ রো কত যে গান "প্রত্যেক শিল্পীর একটা করে গানের কথা বলতে গেলেও এই নিবন্ধে জায়গায় অকুলান হবে। তবুও উল্লেখ করলাম এই কয়েকটির কথা- তাঁর রচনার যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলছিলাম তা একটু প্রাঞ্জল করে নিতে। একটা গানের সৃজন-প্রক্রিয়ায় ওঠানামা, স্বরস্থাপন, ছন্দপ্রকরণ, বাণীর বিন্যাস, বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ এরকম অনকে কিছু প্রয়োজন হয়। যেগুলোর আত্মীকরণের মাধ্যমে এবং যেগুলোর আধারে প্রকাশনক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এখানে একটা কথা মানতেই হয় যে, সুরের প্রবাহ শ্রোতার মনে ভাবের প্রতিরূপ বিকশিত করে, যার আধারে রস আহরণ, অর্থাৎ ভাবের উপলব্ধি

কল্পনাস্বাদিত। এখানে বাণীর চর্চাবিষয়টি যাঁর হাতে রয়েছে তাঁর কাজটি অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে পড়ে। ভাবের অংশীদার হতে গেলে গীতিকারের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত সুরকারের ভাষায় এবং ছন্দে যত বেশি সাবলীলতা থাকবে তত বেশি সুরের সঙ্গে তাঁর সহজ মেলবন্ধন ঘটবে। গৌরীপ্রসন্নর রচনা প্রকৃতপক্ষে তাই ছিল। একজন সঙ্গীতব্যক্তিত্ব একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন- 'বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে গাছেরা যেমন বৃষ্টিধারার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, গৌরীপ্রসন্নর রচনাও যেন ঠিক সেরকমই সুরে অভিষিক্ত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।' কথাটা যে কতটা সত্যি, সেটা বুঝতে গেলে গৌরীপ্রসন্নর গানের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে হয়। যে অল্প কয়েকটা বেসিক গান উপরে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলোর কথাই ধরা যাক। 'দুজনেই কাছে তবু যেন কত দূর/মুকুলের কানে মৌমাছি আনে সুর', 'ঝরাপাতাদের মর্মরধ্বনি মাঝে/কান পেতে শোনে অশ্রুত সুরে মোর এই গান বাজে, ' এত যে জেনেছি আমি মনে হয় আরো যেন কত যে নিবিড় করে জানব/তোমায় আপন বলে মানব', 'যদি দুচোখ থেকে যার কখনো মুক্তো ঝরে/স্মৃতিরই ঝিনুকে নয় রেখো তুমি তাদের ধরে, মুক্তো করে', এত কাছে কাছে রই/তবু কি তোমার নই/পিয়াসী এহিয়া কাঁদিয়া শুধায় বল ওগো মনোময়', 'কাঁদে সুর বাঁশিতে হায়/কান্না আমার কেন হাসিতে চায়', 'জানি না কে দিল সাড়া/সুরে সুরে ভরে ওঠে প্রাণ', 'নাই যেন সুর আর বাঁশিতে/মেঘছায়া নামে হাসিতে/চলে যাই আমি ব্যথা নিয়ে/মোর পথ চেয়ে মিছে থেকো না', 'কুহু আর কূজনে/সেথা ওগো দুজনে/আলাপন হবে/আঁখির পলকে/স্বপন ঝলকে/জানি গো তুমি কাছে রবে'। এই লিরিকগুলো সুরের সঙ্গে কতটা একাত্ম হয়ে আছে তা শ্রেতামাত্রেই জানেন।

বেসিক গানের স্বাধীনতা ছায়াছবির ক্ষেত্রে নেই। সেখানেও কিন্তু নয় নয় করে হাজারের উপর গান রয়েছে তাঁর। দুস্তর মতো সফল গান। সুরকার হিসেবে রয়েছেন নচিকেতা ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র,কালীপদ সেন, নীতা সেন, রাহুল দেববর্মণ, অজয় দাশ এবং আরো অনেকে। বেছে পঞ্চাশখানা গানকে পৃথক করা রীতিমত দুঃসাধ্য কাজ। তিনশোর বেশি ছায়াছবিতে গীতিকার হিসেবে কাজ করেছেন গৌরীপ্রসন্ন, যার মধ্যে বেশির ভাগ ছবিতে তিনি একাই গীতরচনা করেছেন।

গৌরীপ্রসন্নর মত বিশাল মাপের সঙ্গীত প্রতিভাকে দু-চার পাতার নিবন্ধে ধরে রাখার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবু তার সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব, না বললে অতৃপ্তি থেকে যায়।

আগেই বলেছিলাম, দেশ ও জাতিকে উদ্দেশ্য করে গৌরীপ্রসন্ন পরবর্তী সময়ে গীতরচনা করেছেন। সেটা ১৯৬২ সাল, ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তখন গোটা দেশজুড়ে অস্থিরতা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আকাশবাণীর লাইট মিউজিক ইউনিটের প্রয়োজনায় তিনি লিখলেন দুটো গান। গানদুটি হল

১) মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে এবং
২) এদেশের মাটির পরে

সুরকার এবং শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান দুটি পরে ১৯৭২ সালে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আরো একটি জনপ্রিয় গানের তিনি স্রষ্টা, যেটা ওই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল আকাশবাণীর স্টুডিও রেকর্ডে। সেই গানেরও সুরকার এবং শিল্পী ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গানটির প্রথম অংশটুকু এরকম ছিল- "বুদ্ধ-গান্ধী-বিবেকানন্দ বিশ্বকবির মহা দেশে/আজ শান্তির মহান পতাকা কেড়ে নিতে চায় শত্রুট্ট এসে/আর ঘুমায়ো না শিবাজী-প্রতাপ, ঝাঁসির লক্ষ্মী জাগো এবার/অসুরদলনে দুর্গার হাতে এই তো লগ্ন অস্ত্র দেবার/শান্তির দূত আজ যেন তাই এগিয়ে চলেছে সৈন্যবেশে/নবপ্রেরণায় জাগায় মন্ত্র তাই তো জাতির মর্মে মেশে'। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় আপামর জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরত যে গান, সেই 'শোনো একটি মুজিববের থেকে/লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ/স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি/আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/বাংলাদে আমার বাংলাদেশ' গানটিও তারই রচিত।

গৌরীপ্রসন্নর রচিত কয়েকটি ইংরেজি গানও আছে, যেগুলি তিনি লিখেছিলেন চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে। এর মধ্যে দুটি গান উল্লেখ করছি। প্রথমটি 'সপ্তপদী' ছায়াছবিতে সুজি মিলারের গাওয়া 'অন দ্য মেরি-গো-রাউন্ড লেট আস রাউড্ এ্যান্ড রোল/অন দ্য মেরি-গো-রাউন্ড লেট আপ রক্ আওয়ার সোল'। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়টি 'ফরিয়াদ' ছায়াছবিতে আশা ভোঁসলের গাওয়া 'আই এ্যাম দ্য সিন্'। সুর দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষ।

গীতিকার পরিচয়ের পাশাপাশি গৌরীপ্রসন্নর একজন সফল চিত্রনাট্যকারও ছিলেন এবং কিছু কিছু চলচ্চিত্রের কাহিনি বিন্যাসেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকত। তাঁর রচিত নয়টি চিত্রনাট্যের ছায়াছবিগুলো যথাক্রমে ছায়াসঙ্গিনী (১৯৫৬), সূর্যতোরণ (১৯৫৮), বিপাশা (১৯৬২), সূর্যতপা (১৯৬৫), শুধু একটি বছর (১৯৬৬), চিরদিনের (১৯৬৯), প্রক্সি (১৯৭৭), নন্দন (১৯৭৯) এবং সূর্যসাক্ষী (১৯৮১)। 'দেয়া-নেয়া' ছায়াছবির কাহিনী-বিন্যাসে গৌরীপ্রসন্নর সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। সুরের ধাঁচ শুনে গৌরীপ্রসন্নর চটজলদি কথা বুঝে যাওয়া, আর মনের মত কথা পেলেই শ্যামল মিত্র এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্রুত সুরারোপ করা এক সময় সর্বজনবিদিত ঘটনা ছিল। ১৯৬০ সাল নাগাদ প্রথমবার গৌরীপ্রসন্নর গানের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। একই সময়ে শ্যামগুপ্তর গানের সঙ্কলনও বেরিয়েছিল। দুটি সঙ্কলনেরই উদ্যোক্তা ছিলেন উল্টোরথ-খাত গিরীন্দ্র সিংহ মহাশয়। গৌরীপ্রসন্নর সঙ্কলনটিতে উৎসর্গ অংশটি ছিল বেশ মজার। সা-রে-গা-মা-পা-ধা- পর্যন্ত ছ-জনের মান লিখেছিলেন, যার মধ্যে শচীন দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ এবং আরোকজনের নাম ছিল, যেটা এখন মনে পড়ছে না। নি-র জায়গাটা ফাঁকা রেখে তলায় টীকা লিখেছিলেন-'এখানটাতে কোনো নাম দিলাম না। ইদানীং সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল মিত্রের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। এই জায়গাটা এঁদের জন্যেই থাকুক।'

কে জানে কোন সূত্রে এক সময় আমার ধারণা হয়েছিল গৌরীপ্রসন্নর প্রথাগত সঙ্গীতশিক্ষা ছিল। এই ধারণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাঁর গানের খুঁটি নাটি অংশগুলোর বারবার দেখে এবং সেগুলোর মধ্যে সুরের অনুরণন অনুভব করে। আমার ধারণার কথা তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই তো সেদিন। দ্বিজেনদা বললেন, 'আমি নচি আর গৌরী অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম। আমি কিন্তু কখনো ওর গান শেখার বিষয়ে কিছু শুনিনি'। তা হোক। গৌরীপ্রসন্ন আপাদমস্তক গান দিয়ে মোড়া। ওঁর নাম উচ্চারণ করলেই মনের মধ্যে গান গুনগুনিয়ে ওঠে।

লেখা শেষ করতে গিয়েই স্পষ্ট বুঝতে পারছি-কিছুই লেখা হল না এই গানের রাজাকে নিয়ে। আগামী পৃথিবী নিশ্চয়ই লিখবে!

সংযুক্তি ৩

Mv‡b feb fwi‡q †'‡e

'xcK †mb¸ß

যে মানুষটিকে নিয়ে লিখতে বসেছি তিনি আর কেউ নয় আমাদের বাচ্চুদা। গৌরীদা ঐ নামেই আমাদের আপনজন। বাংলা গানের জগতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সর্বত্র শ্রদ্ধার আসনে। মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরেও বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভাধর এই গীতিকারের রচনায় আপ্লুত আপামর বাঙ্গালি।

আমি গানের জগতের লোক নই। দু এক কলি গানের সাধনা সেটা স্নানঘরেই সীমাবদ্ধ। অল্প বয়েসে রেডিওতে অনুরোধের আসর শোনা জন্য বরাদ্দ থাকতো দুপুরটা। এছাড়াও বেতার নাটক বা গল্পদাদুর আসর শোনার জন্য অধীর হয়ে থাকতো মনটা। শৈশবের সেই দিনগুলি আর ফিরে আসবে না জানি; কিন্তু পিছটান অনুভব করি। কথা হচ্ছিল বাংলা গানকে নিয়ে, এখনতো "ঢাকের তালে কোমর দোলে" মনকে দোলায় কি? ভালো গান খুঁজে পাওয়া বা মনের মধ্যে বাসাবাধা গানের সংখ্যা দু-একটা।

লিখতে বসেছি গৌরীদাকে নিয়ে যাকে নিয়ে; আমাদের গর্বের শেষ নেই। বালীগঞ্জের পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে রামগড়ে বাচ্চুদার বসবাস শুরু ষাটের দশকে । উদ্বাস্তু অধ্যুসিত অঞ্চল। বালীগঞ্জের বৈভব ছেড়ে কলোনীতে মানিয়ে নেওয়া, মনের জোর ছাড়া প্রায় অসম্ভব। অথচ কি অনায়াসে তিন আপন করে নিয়েছিলেন আমাদের। হয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই একজন। শুনেছি নিজের মতো গড়ে ওঠার তাগিদেই বাবার সাথে মত বিরোধ। বাবার ইচ্ছা ছেলে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হোক ও বিলেত যাক কিন্তু সেদিকে বাচ্চুদার আকর্ষণ কম। মাথার মধ্যে গল্প উপন্যাস ও গান লেখার ঘুনপোকা বাসা বেঁধেছে। এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। নিজের মতে স্থির থাকার জন্যই বাবার বিরাগভাজন হন তিনি। অবশেষে গৃহত্যাগ। এতে গৌরীদার কতটা ক্ষতি হয়েছিল জানি না। তবে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম একজন গর্ব করার মতো মানুষকে। ৬৩ সালের একটি সিনেমা সুপার-ডুপার হিট। নাম 'দেয়া-নেয়া'। নায়ক উত্তম, নায়িকা সাথে পিতার বিরোধের বিষয় ছেলে গান-গাইতে চায় ব্যাপারটা বাবার পছন্দ নয়। অবশেষে গৃহত্যাগ। গৌরীদার জীবনে তেমনটি ঘটেনি। আসলে "গানের ভুবন ভরিয়ে দেবে" এই বাসনা যার মনে, তাকে খাঁচা বন্দি করে রাখা অসাধ্য কাজ। কোন মায়া-মমতাই আটকে রাখতে পারে না, এরা জীবনপুরের পথিক। লেখার শুরুতেই আমি অকপটে স্বীকার করেছি যে আমি গানের লোক নই। তবুও কানের ভিতর দিয়া মরমে যা প্রবেশ করে আজ তাকে কেমন করে ভুলি। ৫ হাজারের বেশী গানের গীতাকার গৌরীদা। ৩০৯টা ছায়াছবিতে অসামান্য গানের বাণীকার তিনি। বাংলা গানের প্রথিতযশা প্রায় সমস্ত শিল্পীর কণ্ঠে তিনি চির ভাস্বর হয়ে আছেন এবং থাকবেনও আরও বহু দশক ধরে। গানের জগতে আজকাল 'বাণীর' খুব আকাল। সুর নিয়ে নিত্য নতুন যন্ত্রের দাপাদাপি আসল গানটাকেই মেরে ফেলছে। দেখে শুনে "পরান

যায় জ্বলিয়া রে” কিন্তু বলবো কাকে? সকলেই “ঢাকের তালে কোমর দোলে” কিন্তু মনকে দোলাতে পারছে না। ভালো সুরকার আছেন, আছেন অনেক পারদর্শী যন্ত্রশিল্পী। সা-রে-গা-মা’র জনপ্রিয়তা বহু নতুন নতুন শিল্পীর জোয়ার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ভালো বাণীর অভাবে সব প্রচেষ্টারই গঙ্গাযাত্রা ঘটছে অকালে। “আমাকে আমার মতো থাকতে দাও” বলে নিরাপদ অবস্থান নিচ্ছেন নব্য গীতিকার। তাৎক্ষণিক ভালো লাগলেও স্থায়ী থাকছে না গানের রেশ। তাই গানের জগতে “রিমেকের” নামে পুরানো সুধার পসরাই এখন জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। আগে পুরানো দিনের গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন, পরে নিজেদের বেসিক গান। কিন্তু বাজারে চলছে সেই রিমেক গানের এ্যালবাম।

গৌরীদার গান লেখা শুরু ১৯৪৭-এ। প্রথম ছবি “পূর্বরাগ” সুরকার শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৪ তে উত্তম-সুচিত্রা জুটির অগ্নিপরীক্ষা। গল্পে গানে বাজার মাত। গীতিকার-গৌরীপ্রসন্ন, সুরকার শ্রী অনুপম ঘটক। ৫৫ বছর পরেও শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখার্জির কণ্ঠে “গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু অথবা “ কে তুমি আমারে ডাকে অলখে লুকায়ে থাকো” আজও জনপ্রিয়। সুর-বাণী আর গায়িকার ত্রিবেণী সঙ্গম। “ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিলো গান, জাগায়ে তুলিলো মোর আকুল পরান”। “ঢুলি” ছবির এই গানের গীতিকার কে সেটা মনে পরছে না। তবে গানটা সম্ভবত এটি কাননের। আসলে গানটি প্রাণকে স্পর্শ করতে না পারলে ঠিকগান হয়ে ওঠে না। এই সত্যটা মানতেই হবে।

একটা পরিসংখ্যানে দেখছি গৌরীদা ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ মোট ৫ ছবিতে গান লিখেছেন। আর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এ মোট ছবির সংখ্যা ১০৭ টা। গীতিকার হিসাবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জনপ্রিয়তা এই সময়ে গগনচুম্বি। কয়েকটি ছবির নাম বলছি- ১৯৫৪ তে “অগ্নিপরীক্ষা” ১৯৫৫ তে “ সবার উপরে” ১৯৫৬ “সাগরিকা” “ত্রিযামা” ১৯৫৭ “হারানো সুর/পথে হলো দেরী” ১৯৫৮ “লুকোচুরী/সূর্য্যতোরণ/ইন্দ্রাণী/১৯৫৯-এর “মরুতীর্থ হিংলাজ/নীল আকাশের নীচে/দীপ জ্বেলে যাই ১৯৬০-এ কুহক/হসপিটাল/শেষ পর্যন্ত।

লিখে শেষ করা যাবে না। শুধুমাত্র কয়েকটি উল্লেখ করলাম। ছবিগুলি স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল। দীর্ঘ ৫০ বছর পেরিয়েও প্রায় প্রতিটি ছবির গানের দু-এক কলি গুনগুন করে গেয়ে ওঠে বাঙ্গালি। ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল ৭৮টি ছবিতে গৌরীদার গান ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ মোট ছবির সংখ্যা ৬৮টি। একজন গীতিকারের পক্ষে এতগুলি ছায়াছবিতে গান রচনার রেকর্ড বেশ ঈর্ষণীয় ব্যাপার।

আমি শুধু সিনেমা বা ছায়াছবিতে গানের কথাই লিখলাম। কিন্তু বেসিক গান; যে গান রচনার ক্ষেত্রে গীতিকার নিজের ভাবনাকে বা আবেগকে উজার করে দিতে পারে সেই গানের সংখ্যাও অগুনতি। আগে পূজোর সময় নতুন গানের রেকর্ড প্রকাশিত হতো। নামী দামী শিল্পীর পূজোর গানের রেকর্ডের জন্য মুখিয়ে থাকতো বাঙালি শ্রোতা। এমনটা আজ আর হয় না। সিনেমার গান তৈরী হয় সিচুয়েশন নির্ভর।

ছবির চাহিদা অনুযায়ী গান। কোন নায়ক বা নায়িকার লিপে গানটা হয়ে সেটাকে মাথার মধ্যে রেখেই গল্পের চাহিদা অনুযায়ী গান লিখতে হয় গীতিকারকে। কাজটা খুবই কঠিন। গৌরীদার গানের ক্ষেত্রে দেখেছি এই গান রচনার ক্ষেত্রে তার সাহিত্যবোধ ও আবেগের কি অসামান্য মিশ্রণ। দু-একটি গানের কথা মনে পড়ে ৬০ এর দশকের ছবি "শেষ পর্যন্ত" নায়ক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়-

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু

একটি সে গান আমি লিখেছিনু

আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে

তারে যেন মুছিয়া ছিলাম।

শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানটি-এই গান আজও মনটাকে উদাস করে দেয়। একই ভাবে ১৯৬৭ তে "এ্যান্টনি ফিরিঙ্গী" তে-

আমি যে জলসা ঘরে

বেলোয়ারী ঝাড়

নিশি ফুরালে কেহ

চায় না আমায়।

কি সুন্দর শব্দবন্ধ, কি অসামান্য গায়কি এই সব গান চির অমলিন বাংলা চলচ্চিত্রের অসামান্য সম্পদ এই সব সৃষ্টির অসামান্য স্রষ্টা বাচ্চুদা অর্থাৎ আমাদের গৌরীদা শ্রী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

সংযুক্তি ৪

Mv‡bi †'k, cv‡Yi †'k, av‡bi †'k evsjv‡'k

iwei †'k, Qwei †'k, Kwei †'k evsjv‡'k|

.... MxwZKvi kx †MŠixcmb gRg'vi

বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রালাল-অতুল প্রসাদ ও রজনীকান্তের যোগ্য উত্তরসুরি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলায় ১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত গীরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, তিনি ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্যাবিদ। তিনি ছিলেন ডঃস্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ডঃ সি.ভি রমন-এর মত বিখ্যাত মানুষের ঘনিষ্ঠ জন। বালক বয়স থেকেই গৌরীপ্রসন্ন বড় হয়েছেন এক সারস্বত পরিমণ্ডলে; অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্যচর্চার শুরু। লন্ডনের বিখ্যাত ‘Milkway’ পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। রবি ঠাকুরকে নিজের কবিতা শুনিয়ে তিনি তাঁর সপ্রশংস আশীর্বাদ লাভ করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হ’ন। বাংলা ও ইংরাজীতে এম.এ পাশ করেন। পিতার ইচ্ছামত লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে অস্বীকার করে পিতার বিরাগভাজন হ’ন। মা সুধাদেবী তখনকার পরিবেশে বি.এ. পাশকরেন। তিনি ভাল গান করতেন। মায়ের অনুপ্রেরণায় গৌরীপ্রসন্নের গানের জগতে প্রবেশ। ১৫/১৬ বছর বয়স থেকে গান লেখার শুরু। শচীনদেব বর্মণের গীতিকার হয়ে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

১৯৪০ সালে হেমন্ত মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ; ‘প্রিয়তমা’ ছবিতে তাঁর লেখা গান হেমন্ত মুখার্জীর সুরে- “স্মরণের বালুকা বেলায় চরণ চিহ্ন আঁকি” ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। হেমন্ত মুখার্জীর সুর ও স্বর্ণকণ্ঠো গাওয়া গৌরীপ্রসন্নের গান পরবর্তীকালে বাংলায় অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হেমন্ত মুখার্জী নিজেই বলেছেন, আমার গাওয়া যদি দুটো গান বাচই করা হয় তবে তার একটি অবশ্যই হবে গৌরীপ্রসন্নের লেখা-‘ আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে-’। সুকার নচিকেতা ঘোষ ও বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গৌরীপ্রসন্নের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। মান্না দে-কে এইচ.এম.ভি তে প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করান গৌরীপ্রসন্ন। চলচিত্র ও তার বাইরে অসংখ্য বাংলা জনপ্রিয় গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন। মঞ্চের নাটক ও যাত্রার জন্যই তিনি গান লিখেছেন। উদয়শঙ্করের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য ‘কল্পনা’র জন্য ও তিনি গান লিখেছেন। দুর্ঘটনার পরে জীবন ফিরে পেয়ে শ্যামল মিত্রের সেই বিখ্যাত গান- ‘তোমাদের ভালবাসা মরণের পার হ’তে। ” লিখেছে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। বোম্বাইতে লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার সহ অসংখ্য শিল্পী তাঁর লেখা গান গেয়েছেন। বাংলায় এমন কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন না যিনি তাঁর লেখা গান করেননি। ৫০-এর দশক থেকে ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন বাংলার শিল্পীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে

গৌরীপ্রসন্নের গান। বাংলা আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে ছিলেন এই অসামান্য গীতিকার।

ছায়াছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায়ও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। " দেয়া-নেয়া,; শুধু একটি বছর' সূর্যতোরণ' তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাঁর স্বদেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৬২ সালের "মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে...।" অথবা ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে "শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ..." গানটিতে। যে গান সম্পর্কে ঢাকার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "এই একটি গান বাংলাদেশের পঞ্চাশ ভাগ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।"

তিনিই প্রথম বাঙালি যার গান বিখ্যাত ইংরেজী ছবি "সিদ্ধার্থ'- এ ব্যবহার করেছেন পরিচালক কনরাড রুক্স। গীতিকার হিসাবে সবচেয়ে বেশিবার বি.এফ.জি.এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য গুনগ্রাহী বন্ধু ছিলেন যেমন শক্তি সামন্ত, বহুলদেব বর্মন, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ি, ইন্দবর, সায়ের লুধিয়ানভি প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র কেবল বাংলা গানের জগতেই নয়; ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁর বুৎপত্তি উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি ভাব ও ছন্দ বজায় রেখে জয়দেবের 'গীতবোগিম' এর ইংরাজী অনুবাদ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র তিনি ইংরেজী অনুবাদ করেন। গল্প, কবিতা, ছড়া ও লোকগীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আর বাংলা গানে পুরাতনী থেকে আধুনিক মিলিয়ে তিনি প্রায় ৫ হাজার গান লিখেছেন। যার একটা বড় অংশ আজও শিল্পীদের কণ্ঠে ফেরে। মানুষের আনন্দ বিষাদ-বিস্ময়ে বারে বারে সাড়া জাগায়।

বিদ্বান সজ্জন, নিরহংকার বিনয়ী এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটি কাছের মানুষ ছিলেন একথা ভাবলে মনটা গর্বে ভরে ওঠে। ১৯৮৬ সালের ২০ শে আগস্ট বোম্বাই শহরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তাঁর প্রয়াণে বস্তুত বাংলা গানের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হয়। বাংলা গানের সোনালীযুগের স্বর্ণকার তাঁর প্রিয় জনের চেয়ে অনেক দূরে আরব সাগরেরা তীরে এমন ক'রে চলে গেছেন। আমাদের দায়িত্ব হ'ল তাঁর সৃষ্টির সংরক্ষণ ও তাঁর সৃজনশীল জীবনের আলোকবর্তিকা বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া।

[বি: দ্রঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মৃতি মঞ্চ থেকে প্রকাশিত স্মরণিকায় এই প্রবন্ধটির লেখকের নাম নেই। আধুনিক বাংলা গানে গৌরীর অবদান প্রসঙ্গে লেখাটি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আমরা এই লেখাটি এখানে সংযুক্ত করলাম।]

সংযুক্তি ৫

‡MŠixcm‡bi Mv‡b ¯‡'k fvebv

nx‡ib fÆvPvh

গৌরীপ্রসন্নর চিন্তা রাজ্যের মানচিত্রে, বাস্তববাদী রাজনীতির কঠিন বন্দর মাটির চেয়ে রোমান্টিকতার নদ-নদী ও শ্যামল তৃনভূমিরই ছিল একাধিপত্য। কাজেই রাজনৈতিক দুর্দিনে কেউ ত্রাণের জন্য গৌরীপ্রসন্নকে স্মরণ করবেন এমনটি আশা করা যায় না। তবু আজ অন্তর থেকে বলতে ইচ্ছে করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দুর্দৈবের দিনে গৌরীপ্রসন্নর বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

স্বভাবত প্রশ্ন জাগবে কেন এই কামনা?

‰KwdiZ GB

সাতচল্লিশে ভারতের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়ল। ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় শেষ হল। তার রক্তেভেজা অগ্নিবর্ণ পশ্চাৎপটের স্মৃতি কখনো আমাদের মনে জীবন্ত। অনেক ক্ষদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রাণদানে, অনেক বাপুজীর ত্যাগে, নেতাজীর আত্মদানে, অনেক মাতঙ্গিনী হাজরার, অনেক সিধো কানুর বিরত্বে-দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্তাক্ত, দ্বিখন্ডিত, শোষিত, এক উচ্ছিষ্ট হতভাগ্য ভারতবর্ষকে পেছনে ফেলে ফিরে গেল তার স্বদেশ ভূমিতে। তাদের ফেলে যাওয়া এই শ্মশানের ধুমায়িত চিতাভস্মের ওপর দাঁড়িয়েও সেদিন মানুষ আশা করেছিল দুর্যোগের অমারাত্রির পরে একটি সুন্দর মুক্ত সকাল দেখা দেবে।....

তারপর আজ চার দশক পরে আমরা এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে আমাদের রাজনৈতিক সভা আজ ঘরে বাইরে বিপন্ন, কম্পমান ভারতের সার্বভৌমত্ব। আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে আবার একটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ভেরী বাজাতে শুরু করেছে। দেশের মধ্যে অন্ধগুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে অশুভ শক্তিরা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মৌলবাদ, অপসংস্কৃতি। বিচ্ছিন্নতাবাদীর স্টেনগান প্রতিদিনই নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, দাঙ্গা রক্ত ঝরাচ্ছে, ভূস্মামীর বন্দুকের নল ঘুরেছে হরিজন পল্লীর দিকে, কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতা হচ্ছে। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানী, বেড়েই চলেছে। কালোবাজার, চোরা চালান দেশের অর্থনীতিকে পদাঘাত করছে। অন্য দিকে অনেক স্বদেশসেবীর সততায় ধরেছে ঘুন। জাতীয় সংহতি ঐক্য, সাম্য, মৈত্রী ত্যাগ যেন আজ কতকগুলি বিস্মৃতি অর্থহীন শব্দমাত্র।

একচল্লিশ বছর পর আজ যেন আরেক শ্মাশান-দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছি। গৌরীপ্রসন্ন রাজনৈতিক জগতের মানুষ না হলেও বেঁচে থাকলে এই অবস্থায় তাঁর গানের মধ্যে স্বদেশের মানুষকে কিছু বলতে পারতেন বলেই বিশ্বাস করি।

বলতে পারতেন কেননা তাঁর রোমান্টিক চিত্তে সুন্দর স্বদেশ ভালবাসা জাগিয়েছিল:

এমন মাকে ভালবেসে

যেন কাটে জনম শুধুই হেসে

মা যে স্বর্গাদপী গরিয়সী

এই বুঝেছি সার।

তিনি মনে করতেন :

এ দেশের একটি গানও কবিতা

এ মাটির একটি ধানও কবিতা

আকাশে তুলির টানও কবিতা

বাংলাদেশ আর ভারতর্ষের রূপের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না তাঁর গান :

গানের দেশ, প্রাণের দেশ, ধানের দেশ বাংলাদেশ

রবির দেশ ছবির দেশ কবির দেশ বাংলাদেশ

স্বদেশকে ভালোবাসার এই ধারণাটা রোমান্টিক। কবির বাবপ্রবণ মনের মধ্যে ভাবে রূপে রসে রঙে যে দেশটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা গীতি কবিতারই মত Subjective -এর মধ্যে কোন Objective বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই, ভালোবাসার এই ধরণটা হয়তো বা কিছু সেকেলেও, যদিও প্রকাশের ভাষাটা আধুনিক। দেশকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন আনন্দমঠের ভবানন্দ, দেশেকে 'সুজলাং সুফলং মলয়যশীতলাম, শষ্য শ্যামলাং" রূপে দেখেছিলেন এই ভবানন্দ, তথা সন্তান-সম্প্রদায়। গৌরীপ্রসন্নর দেখার ধরণও ঐ একই। ধরণটা ভাবপ্রবণ এবং খানিকটা পুরাতন ধর্মী, কিন্তু এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিলনা। গানের মধ্যে খাঁটি ভালোবাসার উত্তাপ। কাজেই এ হেন সুন্দর দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম ও আত্মদান করেছেন তাঁরাও গৌরীপ্রসন্নর কাছে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন। স্বাধীনতা লাভটা তার কাছে রোমাঞ্চকর।

ক্ষুদিরাম থেকে সুভাষচন্দ্র বীরদের ইতিহাসে

রক্ত-অক্ষরে লেখা নামগুলো বারবার মনে আসে।

জালিয়ানওযালাতে নিহত যারা

স্মরণীয় নিয়ত তারা

বিশ্ব কবির নাইট হুড ত্যাগ ঘৃণা আর উপহাসে।

কিংবা-

মৌলানা আজাদ, প্যাটেল, সরোজিনী, লালবাহাদুর

এ যেন ঐক্যতানে বেজে ওঠে সাম্য মৈত্রী প্রেমেরই সুর।

এর মধ্যে যে ভাবালুতার কুয়াশা আছে সেই কুয়াশার জন্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে প্যাটেল পর্যন্ত সকলকে একাকার করে ঐক্যতানে মিলিত করা সম্ভব হয়েছিল। ঐ কুয়াশার প্রচ্ছদটুকু না থাকলে কবি দেখতে পেতেন, যে-কালে তিনি এঁদের অভেদ কল্পনা করেছিলেন, সেই কালেই অন্যেরা Objective ভিত্তিতে সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামও তার নেতৃত্বের বিচার শুরু করে দিয়েছিলেন। কবি দেখতে পেতেন সেই বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের অন্যদিকে গান্ধীজীর মত-পার্থক্য, গান্ধীজীর সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালের মত-পার্থক্য, ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কবি বুঝতে পারতেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ থেকে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের লৌহমানবিক দূরত্ব এতটাই বেড়িছিল যে কোনভাবেই এঁদের সমন্বয়ে 'ঐক্যতান' বেজে ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। গৌরীপ্রসন্ন রাজনৈতিক মনস্ক কবি ছিলেন না বলেই তাঁর কাছে এই ভেদ ধরা পড়েনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর শুভবুদ্ধি ও বিশ্বাস ছিল প্রশ্নাতীত এবং বিশ্বাসের এই গভীরতার জন্যই পরে তাঁকে ধাক্কাও খেতে হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। কঠোর বাস্তবের পাথুরে মাটিতে কবির রোমান্টিকতা যে হোঁচট খেয়েছিল, তার রক্তক্ষরণে তাঁর পরবর্তী গানগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে। একদিন যে কবির কাছে দেশের মাটির প্রতিটি ধান ও একেকটি কবিতা ছিল, আর একদিন সেই কবিকেই লিখতে হল-

তোমার ভাগে বেশী জমি

ফসল ভরা তোমার গোলায়

আর দশজন কাটায় যে দিন

পান্তাভাত আর আদা ছোলায়।

তোমার জবাব নেই, জবাব নেই।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এককালের সেই রোমান্টিক কবি শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতের জন্য শুধু চোখের জল ফেলেই তার কর্তব্য শেষ করেন নি। শিল্পীর বহু বিতর্কিত সীমা রেখা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম ঘোষণা করলেন-

তোমার যে জমিটা বেশী আছে

ভালয় ভালয় বিলিয়ে দাও

এক চাকাতে রথ চলে না

প্রবাদটাকে মিলিয়ে নাও

কবির দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত নিবদ্ধ হয়েছে বাস্তব অবস্থার দিকে। ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে বলতে হয়েছে-

বাঃ, ভাই বেশ, বাঃ ভাই বেশ

দিব্যি ভুলে গেছ দেখছি, এটা হল তোমার দেশ।

দেশের দ্রব্য বিদেশে ঐ দিব্যি পাচার করছ যে;

আর বিদেশেরই পণ্য এনে টাকার পাহাড় গড়ছ যে

চোরা চালান চালাচ্ছ খুব, ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছ খুব... ইত্যাদি।

এক যুগে দেশসেবীদের সম্পর্কে কবি উচ্ছ্বসিত ছিলেন, আরেক যুগে তাঁদেরি উত্তর সাধকদের লক্ষ্য করে তির্যক ধিক্কার-

চায়নি ওরা ওদের নামে রাস্তা হোক

চায়নি ওরা জমক করে মুর্ত্তি গড়ে

পূজো করুক দেশের লোক।

খেয়ে তবু লাথি গুঁতো

চাইনি হতে প্রভুর জুতো,

পারেনি তো মচকাতে ভাই

শাসক শ্রেণীর রক্ত চোখ।

জাত রোমান্টিক গৌরীপ্রসন্নর এই দিক পরিবর্তন তার মনকে কষ্ট দিয়েছিল সন্দেহ নেই। স্বপ্নভঙ্গ পর্বে-তাই তিনি তাঁর পূর্বের প্রত্যয়ের সঙ্গে পরের প্রত্যয়ের একটা যৌক্তিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, যার চিহ্ন পাওয়া যায় তার সিদ্ধান্তে-

ফুল দিয়ে শুধু শান্তির মালা

গাঁথা যে জাতির কাজ

দধিচীর মত হাড়ে হাড়ে আজ

তারাই গড়িবে বাজ।

কেন-না-

একই ভগবান কখনও শান্ত

অপমানে কভু ক্রুদ্ধ।

শুধু জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শেষ দিকে তাঁর বক্তব্যে এসেছিল বাস্তবের ঋজুতা।

এমন একটা পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই

যেখানে যুদ্ধ নেই যেখানে দ্বন্দ্ব নেই

কামানের গোলা বারুদের কোন গন্ধ নেই...

এই স্বপ্নের পৃথিবীকে বাস্তবায়িত করার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে বলেছেন-

আমরা থাকতে চাই যে শান্তিতে

তবু যদি কেউ শত্রুতা করে

পিছোবোনা মোরা প্রাণ-দিতে।

উন্মেষ পর্বের ভাবালুতার প্রচ্ছদ ত্যাগ করে শেষ পর্বে কবির শুভবুদ্ধি যে যৌক্তিক বাস্তবতার মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল-ভারতের আজকের রাজনৈতিক দুর্দিনে সেই বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, তাই বলছি-উচিত ছিল গৌরীপ্রসন্নের আজো বেঁচে থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি ৬

m½xZ-mgv‡jvPK W. Abc †Nvlvj Mv‡bi fe‡b M‡ši ÔAvawbK h‡Mi

K‡qKRb Kwe I MxwZKviÕ kxIK ce‡Ü †MŠixcmb gRg'vi

m¤ú‡K Av‡jvPbv K‡ib| GB ce‡Üi cvmw½K Ask

GLv‡b msh³ Kiv n‡jv

†MŠixcmb gRg'vi

W. Abc †Nvlvj

'এই সুন্দর পৃথিবীতে মন যেতে নাহি চায়'- পৃথিবীর এত নিসর্গ সুন্দরকে ছেড়ে কারও কোনদিন অজানা জগতে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তবু যেতে হবে একদিন সবাইকেই এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে। তবে কোথায় মানুষ যায় মৃত্যুর পর সে কথা সবারই অজানা। এ মহা সত্য সবার মত কবি গীতিকার গৌরীদারও অবশ্যই জানা ছিল কিন্তু তাঁর মত উচ্চ শিক্ষিত সুকবির কলম থেকেও উপযুক্ত গানটি আমরা পেয়েছিলাম। আজ গৌরীদা নেই। কিন্তু তাঁর গান আছে। থাকবে চিরদিন। বাঙালির হৃদয়ে, মননে। হাজার হাজার বাঙালির মনের মুকুরে থাকবে তাঁর গানের স্বরলিপি। শুধু আক্ষেপ এখানেই তাঁর অন্তর্ধান হল কলকাতা থেকে বহু যোজন দূরে। সুদূর মুম্বাই শহরে। তাই তাঁর অগণিত ভক্ত, বন্ধু ও শিল্পীরা অনেকেই তাঁকে অন্তিম যাত্রায় শেষ বিনম্র শ্রদ্ধাটুকু জানাতে পারলেন না। সবার অগোচরে তিনি চলে গেলেন তাঁর অপরিচিত ধামে। সেদিন মনে পড়েছিল তাঁর অপূর্ব লিরিক :

> সেই দিন মুছে দিয়ে আসে রাত,
>
> পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে;
>
> তুমি দেখছ কি?

গৌরীপ্রসন্নর গানের বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের অবাক করে দেয়। অগণিত ডিস্ক, ক্যাসেট এবং ফিল্মে তিনি নানা ধরনের গান লিখেছেন। যখন যে গান লিখেছেন তখনই তা হয়েছে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যে কবি লিখলেন:

> 'আমি যে জলসাঘরের বেলয়ারী ঝাড়'
>
> বা 'আমি যামিনী তুমি শশী হে'.......
>
> বা 'যা খুশি ওরা বলে বলুক'........ এর মত অনিন্দ্যসুন্দর গান তিনিই লিখলেন।
>
> 'হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা

রাতটাকে যে দিন করেছে'

বা 'নানা আজ রাতে আর যাত্রা শুনেত যাব না'

বা 'সিং নেই তবু নাম তার সিংহ'-র মত ননসেন্স লিরিক।

কিন্তু কাব্যিক উপমায় এতই মনোহারীত্ব যে সেই গানে আমাদের সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত সৃষ্টি হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। লোক অংগের রচনায় তাঁর মুন্সিয়ানা স্মরণযোগ্য:

বাঁশী শুনে আর কাজ নাই

সে যে ডাকতিয়া বাঁশী।

শচীনদেব বর্মণের কণ্ঠে গানটি সব সময় যেন চিরতুনকে ডেকে আনে।

ভারতবিখ্যাত কলকাতা-মুম্বাই-এর সব শিল্পীরাই প্রায় তাঁর গান গেয়ে পেয়েছেন অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। কিশোরকুমার, লতা, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র প্রমুখ শিল্পীবৃন্দের কথা এ প্রসঙ্গে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে দুখানি গানের কথা মনে হয়।

'জীবন খাতার প্রতি পাতায়' এবং 'গানে ভূবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি'। গৌরীদা ছিলেন একজন সত্যিকারের শিল্পী। তাই খাঁটি শিল্পীর মনের আশা কি কখনও পূর্ণ হয়? বাউলের মত অতৃপ্তির বেদনা নিয়েই তাঁকে চলে যেতে হয় একদিন নীরবে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি গৌরীদা তাঁর বিচিত্র রূপ ও রসের গান দিয়ে বাংলা গানের জগতকে দিয়েছেন অভিনব গৌরব এবং সৌরভ।

গৌরীদার প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিসভায় (গ্রামোফোন কোম্পানী আয়োজিত। ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ এর রিহার্সাল রুমে) আমি উপস্থিত ছিলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি/গীতিকার মোহিনী চৌধুরী। ঐ সভায় শ্যামল গুপ্তে'র মন্তব্যটি স্মরণীয়:

> কোন গীতিকারের গান কালজয়ী হয়েছে কিনা সে কথা তাঁর প্রায়াণের ৫০ বছর পর বলা যায়। যদিও তখনও তাঁর গান মানুষের স্মরণে থাকে তবেই। তবে বর্তমান দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুধু এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় গৌরীর লেখা বেশ কিছু গান কালজয়ী সৃষ্টি হিসেবে বাংলা আধুনিক গানের জগতে বেঁচে থাকবে।

১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর গৌরীপ্রসন্ন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক। গৌরীপ্রসন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন। ইংরেজি, বাংলা এবং আরও অনকেগুলি বিষয়ে এম.এ পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতেন বাংলা এবং ইংরেজিতে বিদেশেও এঁর রচিত ইংরেজি কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

সমাদৃত হয়েছে। প্রণব রায়ের প্রেরণায় গানের জগতে আসেন। শাতাধিক ছবিতে সহস্রাধিক গান লিখেছেন। শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে বহুবার পুরস্কৃত হন। ইংরেজি ভাষায় তৈরি ‘সিদ্ধার্থ’ ছবিতে তিনি গান লিখেছিলেন।

পরিশেষে বলি, গৌরীদার আকাঙ্খা ছিল তাঁর গানের স্মৃতিসুধা যেন মানুষের মনে থাকে চিরদিন আহ্লান হয়ে। তাইতো তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।’ তাঁর গানের সপ্তসুরের ইন্দ্রধনু বাঙালির মনে আছে এবং থাকবে চিরদিন। সার্থক হয়েছে তাঁর জীবনবাণী:

> গানে মোর-
>
> কোন ইন্দ্রধনু আরজ স্বপ্ন ছাড়াতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়
>
> প্রাণে মোর।

বিদগ্ধ সুরকার ‘অনুপম ঘটকের অসামান্য সুরে এবং হার্মনির সৃজনে গানটি এক অবিস্মরনীয় সৃষ্টি হিসেবে সঙ্গীত রসিকদের কাছ থেকে আজও অবিশ্বাস্য মর্যাদা পেয়ে থাকে। এই শ্রুতিনন্দন সুরারোপ সার্বিকভাবে সফল হয়েছিল গৌরীদার অনাস্বাদিত লিরিকের জন্য। একই সঙ্গে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠসম্পদ এবং অপূর্ব উপস্থাপনার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গৌরীদার লেখা ‘আমার গানের স্বরলিপি রবে’- গানটি প্রসঙ্গে ‘নচিকো ঘোষের অসাধারণ সুরসৃষ্টি এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বর্ণকণ্ঠের গায়নশৈলীর কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আধুনিক গানের জগতে।

১৯৮৬-র ২০ আগস্ট গৌরিদা এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পৃথিবীর ওপারের নীলাকাশে। তাঁর মত একজন সুযোগ্য কবি ও গীতিকার আকস্মিক অন্তর্ধানে বাংলা গানের জগতের যে নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেল তা সহজে পুরণ হবে না। গৌরীদা বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

[উৎস : ড. অনুপ ঘোষাল, ‘ আধুনিক যুগের কয়েকজন কবি ও গীতিকার প্রসঙ্গে’, গানের ভুবনে, কলকাতা ১৪০৮]

সংযুক্তি ৭

†MŠixcmb gRg‘vi Ges cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi A‡bK Rbwcq Mv‡bi mi

K‡i‡Qb mcYKwš Í †Nvl| eZgvb M‡elK M‡elYvi Rb¨ Z_¨

msM‡ni c‡qvR‡b KjKvZv mdiKv‡j mcYKwš Í †Nv‡li

mv¶vrKvi MnYKv‡j wZwb GB †jLwU eZgvb

M‡elK‡K c‘vb K‡ib| cm½Z †jLwU

GB Awfm›‘‡f msh³ Kiv n‡jv|

Avgvi gvbvKvK

mcYKwš Í †Nvl

যে সময়টা আমি জন্মেছিলাম, সেটা নিশ্চিতভাবেই অন্যরকম ছিল। তখনো সবকিছুর বুনিয়াদ ছিল অনেক গভীরে। ঘর বাড়ির যেমন ছিল পাকা ভিত, মোটা দেওয়াল, চওড়া খিলা, পেল্লাই পাল্লার জানালা দরজা আর উঁচু সিলিং, তেমনই প্রস্থে-উচ্চতায়, ঘাড়ে-পাঞ্জায়, কৌলিন্যে-কেতায়, মর্জি-মেজাজে আর মাঞ্জায় দূর থেকেই চেনা যেত বনেদি বঙ্গজদের। আভিজাত্যের ওজন ছিল, এখনকার মতো কিনে গায়ে চাপিয়ে বেড়াবার বস্তু ছিল না সেটা। আভিজাত্যের মাপ হত রতি-ভরিতে, আট আনা চার আনায় নয়। সব ক্ষেত্রেই ছিল সেরাদের রাজ্যপাট, রাজায় রাজায় ওঠা বসার দিন। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে তখন ভোটাধিকার ছিল কেবলমাত্র আয়করদাতা এবং স্নাতক স্তরের নাগরিকদেরই। মুড়ি ও মিছরি নিজের নিজের দামে আলাদাই বিকোত। ওঠা বসায় উঁচু নিচু ছিল। সবকিছু তোখনো সবার নাগালে আসেনি। যাকে তাকে যেখানে সেখানে দেখতে হত না। কৌলিন্য কথাটা তখনো কৌলিন্য হারায়নি, ওটা পরম্পরাই ছিল। বিষয়টা হঠাৎ গরম পড়ার মতো কিছু ছিল না।

চোখ কান মাথা নিজেদের মতো কাজ করতেই বুঝলাম, আমার চারপাশে জ্যোতিষ্কারা। সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-নাট্য-সাহিত্য-কাব্যে। ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সমস্ত অঙ্গণেরই মহাকাশ জুড়ে। ঘরানা বাহিরানায় শতকরা নিরানব্বই-ই এই বঙ্গকুলের। আমার পরম সৌভাগ্য এমন এক নক্ষত্রের আমি আত্মজ, যাঁর সূত্রে গুণে গরিমায় ভূবনজোড়া আসন পাতা শ্রুতিকীর্ত সেইসব মানুষেরা আমার কাকা পিসি হয়ে গিয়েছিল জন্মসূত্রেই। আদরে আবদারে প্রশ্রয়ে প্রত্যয়ে জীবনে একদিনও টের পাইনি যে বাবার সঙ্গে এঁদের পেশাগত সম্পর্কের সূত্রে এঁরা আমার কেউ (টের পাবই বা কী করে, বাবার তৈরি একখানা গানও

কি আমি বা আমার দুই বোনের চেয়ে স্নেহ আপত্য যত্ন কম পেয়েছে? বরং অনেক বেশিই পেয়েছে)। এটাও তো ওই সময়েরই আবীর-চন্দন।

অনকেবারই জীবনের কোনো বাঁকে নির্জনে নিজের কাছে দু'দণ্ড বসলে ঈশ্বরের ওপর অভিমান করেছি জীবনে অনেককে হারিয়েছি বলে। বারো বছর বয়সে মাকে, সতেরোয় বাবা। জীবনের মহার্ঘ এত কিছু হারিয়ে আমার যৌবনকেও হারিয়ে ফেলেছি দৈন্যে অনটনে। ছোটো ছোটো দুই বোনকে নিয়ে আমার অনাথ সংসারের চাকা যাতে গড়ায়, তার তেল জল জ্বালানির বন্দোবস্ত করতে গিয়ে যৌবনের মৌবন বলে যে কিছু আছে তা টেরই পাইনি আর পাঁচজনের মতো। আড্ডা কাকে বলে জানতামই না। অথচ কী আশ্চর্য, গৌরীকাকাকে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার) চেপে ধরে আড্ডা নিয়ে একটা যুগান্তকারী গান গড়িয়ে তাতে সুরও বসিয়ে ফেললাম আড্ডা না মেরেই। তাও ইতিহাস হয়ে গেল।

এই মাস দুয়েক আগে পঞ্চাশে পৌছে আজ মনে হচ্ছে, পরম প্রভুর কাছে আমার সেই অভিমান অত্যন্ত অমূলক। রবীন্দ্রনাথের 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে....' গানটির সঞ্চারির প্রথম লাইন বড়ই সত্য বলে অনুভূত হচ্ছেঃ ' হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে...।' আজ অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝে পেয়েছি অন্তরময়ের এই পরমবার্তা যে পূর্ণের সংস্পর্শে না এল জীবন পূর্ণ হয় না। কারণ ইহজগতে যে পূর্ণ সুন্দর হয়ে উঠেছে, তা সেই পরম পূর্ণময় ঠাকুরেরই অশেষ কৃপার দানে।

আমার এই জীবন পূর্ণ হয়েছে মানাকাকুর (শ্রদ্ধেয় মান্না দে) কাছেই। আমি পরম বিশ্বাস থেকেই স্বীকার করি মানাকাকুকে (আমার বাবার চাইতে উনি বয়সে বড় হলেও আবাল্য আমি ওঁকে মানাকাকুই বলি, আর উনি আমায় খোকা নামেই ডাকেন) না পেলে এই সুপর্ণ সম্পূর্ণই হত না। আজ বেশ বুঝি, আমি আদতে কিছুই হারাইনি। আমার মা, আমার বাবা, আমার 'সারা জীবনের গান', আমার না-মারতেপারা 'কফি হাউসের আড্ডা', মাঠে না নেমেও আমার 'ফুটবল খেলা'- সব ওই একজনের মধ্যে আমি পেয়ে গিয়েছি। এমনকি রাধাকান্ত নন্দী, টোপদা, গৌরীকাকা, পুলককাকা-আমার জীবনের যা কিছু, সব। হি ইজ অল ইন ওয়ান ফর মি। মানাকাকুকে প্রথম কবে দেখেছি তার সাল মাস মনে পড়ছে না, তবে এটুকু মনে আছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি হবে। ছোটা সা সওয়াল' নামে একটা হিন্দি ছবির রেকর্ডিং-এ। অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই ছবির প্রযোজনে, আর আমার বাবা নচিকেতা ঘোষ সঙ্গীত পরিচালক। মানাকাকু এলেন। আমি তখন হাফপ্যান্ট পরি। মানাকাকুর মাথা তখনও এতটা ফাঁকা হয়নি। মানাকাকুর পূজোর গান 'তীর ভাঙ্গা ঢেউ' রেকর্ডটায় সাবেক মোটা সেল ফ্রেমের চশমা পড়া যে ছবিটা আছে, ঠিক ওইরকম।

মানাকাকু বান্দ্রায় থাকতেন। বান্দ্রার বাড়ির অনেক গল্প আমি শুনেছি, কিন্তু সে বাড়িতে কোনোদিন যাইনি। এরপর মানাকাকু বাড়ি করেন ভিলে পার্লেতে। বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'আনন্দন'। আমি

ওটাকে বাড়ি বলি না, বলি স্বপ্নপুরী। মানাকাকু মানুষটার অনপুম সৌন্দর্যচেতনার একটা রূপ যেন ‘আনন্দন’। ওর স্থাপত্য শৈলীর কাছাকাছি একটা বসতবাড়ি আমার আজও চোখে পড়েনি। মর্মরের আমর্ম খচিত ‘নন্দন’-এর (স্বর্গ) আলোছায়া, মাধুর্য ও লাবণ্য জড়ানো ওই আনন্দন। সে বাড়িতে বেশ ক’বার গিয়েছি বাবার সঙ্গে। বোনেরাও গিয়েছে। শুধু গিয়েছে বললে সবটা বলা হবে না। গিয়েছি এবং থেকেওছি। সেই সূত্রে আজও স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে রসনার কিছু অনাঘ্রাত স্বাদ। আন্টির (মানাকাকুর স্ত্রী) হাতে কলাপাতা দিয়ে মুড়ে রাধা ভাপা পমফ্রেট মাছ। আমি পেটুক মানুষ। ভোঁদরের চেয়েও মাছ খেতে বেশি ভালবাসি। এতদিন পরেও আন্টির রাধা আরো নানারকম ফাটাফাটি মেনু খাবার পরেও ওই পমফ্রেটের স্বাদ আমার স্মৃতিতে কোনো এক অসামান্য গানের মতোই রয়ে গিয়েছে-রয়ে যাবেও, যতদিন স্মৃতি থাকবে।

মানাকাকু তখন মুম্বইতে থাকেন। আমরাও তখন সেখানেই। এরপর কলকাতায় ফিরে বাবা প্রথম বাংলা ছবিতে সুর করেন ‘শেষ থেকে শুরু’। আমার মনে হয়, ওই প্রথম ছবি থেকেই বাবা একান্ত নিজস্ব একটা টিম ছকে নিয়েছিলেন মানাকাকু, গৌরীকাকাদের (এবং পরে পুলককাকা) নিয়ে। পোটেনশিয়াল ক্রিয়েটিভ মানুষদের তো নিজের একটা ‘ষড়জ’ থাকে, ওটা কারোর জন্যই আপোষ করে পৌনে সোয়া করে নিতে তাঁদের (কোন মূল্যেই) সয় না। কেউ করেনও না। করলে তাঁদের পঁচাত্তর ভাগই খরচা হয়ে যায় গু-গোবর বাবদ। ‘মেজাজটাই আসল রাজা’ যাঁদের, তাঁর বিক্রি হন না নয়া আধুলি সিক আনায়। সৃষ্টির রতিতে মগ্ন থাকতে তাই তাঁরা সর্বাদাই বেছে নেন ষড়জ মিলিয়ে মনের মানুষ। বারবার মেলানোর ঝক্কি পোষানো সতত সৃষ্টিশীলদের সয় না। মানাকাকু, গৌরীকাকা বাবার সেই ষড়জ মেলানো মানুষ। চিরদিনই। কী আশ্চর্য দেখুন, এরপরের ছবি হল ‘চিরদিনে’। সেই মানাকাকু, সেই গৌরীকাকাকে নিয়ে বাবার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। বাকিটা নিশ্চই আমার চেয়ে আপনারাও কিছু কম জানেন না। আমি তখন বাইরে যেতে ফুলপ্যান্ট ধরেছি।

আসলে কী জানেন, এভাবে পর পর ধারাবাহিক ভাবে বলতে গেলে গোটা একটা বইয়েও কুলোবে না। যদিও বাংলা ছায়াছবির আর নন্‌-ফিল্মি (যাকে বেসিক গান ধরা হয়) গানের অকথিক ইতিহাসে এই ধারাবাহিকের প্রতিপদেই জড়িয়ে আছে পূর্ণিমার অনন্য বিচ্ছুরণ আর গায়নের (মানাকাকু) গহন থেকে উঠে আসা এক অবিস্মরণীয় অলেখ্য, যার লিপে অনির্বাযভাবেই উত্তমকাকু। এই ষড়জ মেলানো অভূতপূর্ব টিমের অতুলনীয় সৃষ্টিশীলতায় কখনো লম্পট জমিদার, কখনো মাতাল উকিল, কখনো কাজ পাগল সদাশয় ডাক্তার, আবার কখনো বা অন্তর্মুখী প্রেমিকের নানা মুখের নানা রঙের নানা শেডের নানা বাংলা গান গড়ে উঠেছে। এমন দ্বিতীয় নমুনা ভারতে কেন, বিশ্বেও বিরল। ‘অগ্নিভ্রমর’ ছবিতে বাবা মানাকাকুককে দিয়ে গাওয়ালেন একটিই গান, চার চারটি আপাত বিরোধী চরিত্রে। এর আজও কোনো তুলনা আছে কি? খুঁজে দেখুন তো!

প্রতিটি গানের নেপথ্যে মিশে আছে এক একটি রত্নময় আখ্যান। শুধু তাই নয়, আজকের এই অক্ষমের বিক্রমের বেপথূ দিনের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে ওই সব রাজার মত মানুষদের রুচি, শিক্ষা, চেতনা। প্রদর্শিত নয়, সহজাত। ওই যে গোড়ায় বলেছিলাম, পূর্ণের সংস্পর্শে না এলে পূর্ণতা আসে না, প্রকৃত শিক্ষাও লাভ করা যায় না। কথাটা সর্বাংশে সত্যি। ছেলেবেলা থেকে সবদিক থেকেই বিরাট মাপের সেই সব মানুষদের নিয়তহ নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ করে আজ টের পাই ছেলেবেলায় বহুবার শোনা 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ' আপ্তবাক্যটি নিছক কথার কথা নয়। 'দু' কাল গিয়ে তিন' কালে পা দিতেই যে তার 'ফল' ফলতে শুরু করেছে। এখন টের পাচ্ছি, চন্দনের বনে বাস করেছি বলেই আজ শ্যাওড়ার বন থেকে শত হস্ত দূরে থাকি। এ শিক্ষাও তো পেয়েছি সেই সঙ্গ করেই। আমার শৈশবের প্রতিটি দিনই উৎসরের হয়ে উঠত এই চন্দন সঙ্গে। বিশেষ করে মানাকাকু যেদিন আসতেন। এত চেনা, এতবার ঘরোয়াভাবে সঙ্গ পাওয়া মানাকাকুর প্রতিবারই সামনে আসাটা আমার কাছে অনিবার্যভাবেই আনন্দময় হয়ে ওঠে। সে তিনি সাফারি পরেই আসুন, বা শার্ট-ট্রাউজার পরে অথবা আটপৌরে বাঙালির পাজামা-ফতুয়াতে। ওঁর উপস্থিতিটাই রাজার। ওই মাপের সর্বভারতীয় গানবাজনার আন্তর্জাতিক এই মানুষটির মধ্যে উত্তর কলকাতার সাবেক বাঙালিয়ানার শিকড় আজও অটুট, অক্ষয়।

ভারতবর্ষে বহু শিল্পী জন্মেছেন, কিন্তু আমার জীবন পরিধিতে দেখা ও শোনা মানাকাকুর মাপের শিল্পী কোনো দিক থেকেই আর একজনও নেই। শিল্পী হিসেবে তো বটেই, মানুষ হিসেবেও ওঁর জুড়ি নেই। ভাবতে পারেন, কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জীবন্ত কিংবদন্তী এই মানুষটিকে তাঁর গানের সুরকারকে চিরদিন বলে আসতে শুনেছি-গানটা কবে শেখাতে আসবেন? অথবা, অমুক দিন ঠিক করুন, গানটা আমি গিয়ে শিখে আসবো। একদিনও তাঁর মুখে শুনিনি 'গান তুলে নেব' বা 'গানটা তুলিয়ে দিন ধরণের বাক্যবন্ধ। আমার বাবার গানঘরে এসও শুনেছি তাঁকে বলতে, 'নচিবাবু, গানটা শিখিয়ে দিন' বা মজা করে ' গানটা আমারে শিখাইয়া দেন'। আমার পুত্রবৎ এই আমার সুরে পঞ্চাশটিরও বেশি গান গাইবার আগে বলেছেন, 'অমুক দিন এসে খোকা গানটা ভালো করে আমাকে শিখিয়ে দাও'।

আর, যারা তার নখেরও যোগ্য নয়, সেইসব চুনোপুঁটিরা সকলেই বলে থাকে, গানটা তুলিয়ে দিন। এবং সুরকারের কাছ থেকে ক্ষমাঘেন্না করে গান 'তুলে নেওয়া'ই এখনকার স্বঘোষিত শিল্পীদের দস্তুর। আগে সহ্য হত না। পরে নিজেকে সহ্য করতে শিখিয়েছি এমনটাই ভেবে নিয়ে যে, যে যেমন, যার ভেতরে যেমন, তেমনই তো বের হবে তার মুখ দিয়ে। গান যিনি প্রথাগত বিধি মেনে, অনুপুঙ্খ তালিম নিয়ে শিখেছেন, তাঁর কাছে গান বিষয়টা তো জীবনভর শিখে নেবারই। কারণ যারা এদিক সেদিক থেকে খুঁটে খুঁটে গান তুলে এসে শিঁকে ছিঁড়ে মাচা পেয়ে গেছে, তাদের কাছে গান তো তুলে নেবারই বিষয়। সবকিছুই যে আদতে শিকড়ের। ভেতরের। নইলে, যাই পরুন না কেন রাজা, আসাটা কেন তাঁর সব সময়ই রাজকীয় হয়ে যায়?

Dhaka University Institutional Repository

তো, তখন আমি বাবার গানে রিহার্সাল থেকে ফ্লোরে বাজাই রিদম্। আমি আশৈশব আর এক অসামান্য মানুষের ভক্ত। তিনি পঞ্চমদা (রাহুল দেববর্মণ)। মানাকাকু আমাদের ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাসায় আসতেন আর কাজকর্মের ফাঁকে যখন বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, আমি তখন ওঁদের মধ্যে বসে চুপ করে সব কথাগুলো গিলতাম মুম্বাইয়ের নানা গল্প। কে কেমন কাজ করছেন, কে কী গাইছেন। আজও মনে আছে, 'সীতা অউর গীতা' ছবি 'অভি তো হাথ মে জাম হ্যায়' মানাকাকু তাঁর মুগ্ধতার কথা বলেছিলেন। শচীন দেববর্ণের সুরে লতাজির গাওয়া 'খায়ি হ্যায় রে হমনে কসম' গানটাও মানাকাকুর দারুণ ভালো লেগেছিল। সবে স্কোরিং হয়েছে, ছবি তখনো মুক্তি পায়নি। এখনো মনে আছে, লতাজির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন মানাকাকু। পঞ্চমদার কাজ যা চলছিল, তারও নানা সুখ্যাতি। আমি হাঁ করে শুনতাম। কী যে মুগ্ধতায় মাখা সেই সব রঙিন স্মৃতি। আমার তখন পড়াশুনো চলছে, সেই সঙ্গে চলছে বাজানো। আস্তে আস্তে বাবার রিদম্ অ্যারেঞ্জ করছি। মাথার মধ্যে পঞ্চমদা সদা জাগ্রত। ওঁর রিদম পার্টগুলো ইনকর্পোরেট করতে চেষ্টা করছি বাবার গানে। তখন বাবার কাজ চলছে 'ছুটির ফাঁদে', সেই চোখ' ছবিগুলোর। 'মুশকিল আসান' গানটার রিদমটা করছি বাবার বকুনি শুনেও। মনে আছে, গৌরীকাকার লেখা 'ফলা পাকলে মিঠে, মানুষ পাকলে তেতো' গানটার কথা। বাড়িতে রিহার্সালের সময় বাবা কিছু বলতেন না। ফ্লোরে কিন্তু বাবার অন্যরূপ। কিছুতেই স্কোরিং এ আমার রাত জেগে মাথাটাথা খাটিয়ে তৈরি করা রিদম প্যাটার্নটা বাবা মানছেন না, বলছেন, 'ছাড় ওইসব পিডিং-পুরুং করা। রাধু (রাধাকান্ত নন্দী), তুই নিজের মতো বাজাতো। আমার গান আমার করা সুরেই দিব্যি দাঁড়িয়ে যায়।' রাধুবাবু খশি, হাত খুলে বাজাবার সুযোগ পেয়ে; আমার দারুণ মন খারাপ। বাবার ওপরে কথা বলার সাহস কারোরই ছিল না, সেখানে আমি তো নস্যি। মানাকাকু দূর থেকে ব্যাপারটা বুঝে এগিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'দিন না বাচ্চা ছেলেটাকে ওর কাজটা করতে। ভালোই তো লাগছিল, শুনলাম'। মানাকাকুর কথা বাবা ফেলতে পারতেন না। এখানেও আমার জীবনে মানাকাকু জড়িয়ে গেলেন। আমরা যে কী ভালো লেগেছিল সেদিন, ওইরকম রোল্ড পার্সোনালিটির মধ্যে একটা ছোটোছেলের জন্য এরকম মিহি স্নেহের প্রশ্রয়টুকুর জন্য। সেই বোধ হয় রাজার মতো ওই মানুষটাকে আমার ভীষণ কাছের মনে হওয়া। মনের একান্তে।

'স্ত্রী' ছবির কাজে এক আকাশে দুটি সূর্যের মতো কাজ করলেন মানাকাকু আর হেমন্তকাকু, বাবারই অনন্য সাধারণ সুরে। এই ছবিতে বাবার গানে বাঁধা পড়েছিল তিন জোড়া নক্ষত্র। মানাকাকু ও হেমন্তকাকুর কণ্ঠে গীতিকার হিসেবে গৌরীকাকা ও পুলককাকা, আর অতুলনীয় সেইসব গানগুলির লিপে উত্তমকাকু এবং সৌমিত্রবাবু। এমন বিরল ঘটনাও বোধহয় অতীতে ঘটেনি। তারপরেও ঘটেছে বলে জানা নেই। এরপর 'আনন্দমেলা' ছবিটা। 'সন্যাসী রাজা' তো তারও আগে। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভাবুন তো, মানাকাকুর কণ্ঠে বাবার সুরে 'সন্যাসী রাজা' ছবিতে গৌরীকাকার লেখা চার লাইন করে সেই গোটা পাঁচেক গানের কথা। সেও তো সর্বকালের ইতিহাস।

বাবার শেষ ছবি ‘ব্রজবুলি’ তে উত্তমকাকুর একটা গান ছিল। গানটা তোতলামের করে গাওয়া। কী শক্তিশালী মানুষ এঁরা ভাবুন। যেমন গৌরীকাকা, তেমন বাবা, তেমনই মানাকাকু। পুরো গানটা তোলামো কিন্তু হালকা চটুলতর বেসাতি হয়নি। ‘মৌচাক’ আর ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ ছবিদুটোর কাজ চলছিল একসেঙ্গ। এখানেও আমার মতে, বাংলাগানের চিরদিনের সেই কম্বিনেশন। গৌরীকাকার আর আমার বাবা। ছবি দুটোর গান রেকর্ডিং হয়েছিল মুম্বাইতে। মনে আছে, মানাকাকুর তখন একটাফিয়াট গাড়ি ছিল। নিজেই চালিয়ে আসতেন। তখন থেকে আজও, এই কদিন আগে আমার সুরে ‘ছড়ার গান’- এর রেকডিঙেও দেখলাম, আদ্যপান্ত অকৃত্রিম এই মানুষটা তাঁর গাইবার গানটি শিখে নিতে থাকেন নিজে হাতে গোটা গোটা করে নোটেশন করে নিতে নিতে। সুরকারের একান্ত নিজস্ব অনুভবের ‘কড়ি ও কোমল’কে সমান শ্রদ্ধা দিয়ে নোটেশনে অনুপুঙ্খ এঁকে নিয়ে তবে মানাকাকু গাইতে বসেন রেকর্ডে।

প্রযোজকদের প্রবল ইচ্ছে ছিল ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ ছবির ‘কিচিরমিচির’ গানটা কিশোরকুমারকে দিয়ে করানোর। বাবা ঠিক করেছিলেন গানটা মানাকাকুই গান। শেষ পর্যন্ত ‘ঘটনাচক্রে’ মানাকাকুকে দিয়েই রেকর্ড করান বাবা। বেশ মনে আছে, রেকির্ডিং শেষ হলে মানাকাকু নিজেই তাঁর ফিয়েট চালিয়ে বাবাকে আর আমাকে লাঞ্চ করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইতে তখন সদ্য সদস্য খোলা ‘কপার্স চিমনি’ রেস্তঁরায়।

১৯৭৬। আমি সে বছর সিনিয়র কেম্ব্রিজ দেব (Indian School Leaving Certificate)। বাবা চলে গেলেন। সবচেয়ে ছোটো বোনটা তখন ক্লাস সিক্সে। খবর পেয়ে মানাকাকু বাড়িতে এলেন। ঘরে উত্তমকাকু, হেমন্তকাকু সহ অনেকে বসে আছেন। মানাকাকু ঘরে ঢুকে বাবার সামনেটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দু’গাল বেয়ে চোখের জলের ঢল। চুপ করে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো বোনটাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েই রইলেন। অনেকক্ষণ। অঝোরে কেঁদেই চলেছেন।

মাথার ওপর থেকে বটবৃক্ষের ছায়াটা সরে যেতেই আমি হঠাৎ কঠিন এক সময়ের মুখোমুখি হলাম। টিউশন করে কোনেমতো সংসারের হাল ধরছি। বাইরেটা যতই শতচ্ছিন্ন হোক, ভিতরে তো বইছে নীল রক্তের উত্তরাধিকার। চাঁদের অলখ টানের মতো সেখানে যে নিরন্তর জোয়ার ঢেউ তুলছেই। ওই টানাটানির মধ্যেও সুরের সেই অলখ টান দু’দণ্ড জিরোতে দেয়। শ্বাস নিই সুরের সেই আশ্বাসে। বাবার দেরাজ খুলে একদিন পেলাম গুপ্তধনের সন্ধান। বাবার বাতিল করে দেওয়া অজস্র গানের ভাণ্ডার। সামান্য কোনো শব্দবন্ধে, অসামান্য কোনো দ্যোতনার তাড়নায় বা একেবারে চাকতি চাকতি না মেলা অন্তমিলনের লঘু অপরাধে গানগুলি নির্মম ঔদাসিন্যে বাতিল করে দিয়েছেন আমার চিরমেজাজি বাবা। মোদ্দা কথা, তাঁর সুরকন্যার রূপ, গুণ আর বংশকৌলিন্যের সঙ্গে সেসব গানের বাণীর মিলন সম্ভব হয়নি। এরমধ্যে অধিকাংশই পুলক কাকার রচনা। বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার গৌরীকাকার বেশ কিছু অসামান্য গানও রয়েছে তার মধ্যে। বেশ বুঝতে পারি, এ গানগুলির সুর না পাওয়ার পিছনে

অনাভিজাত্যের এতটুকু কালি নেই, বরং কৌলিন্য রয়েছে মহার্ঘ পিতৃত্বের। এমন রত্নময় সম্পদে রাশি ক'জন বাবা রেখে যেতে পারেন তার সন্ততির জন্য। কৃতজ্ঞতায় আমি আপ্লুত হতে হতে আর মনে হয়, ফ্লাট, গাড়ি, অর্থের চেয়েও ঢের ঢের মহর্ঘ উত্তরাধিকার বাবদ পাওয়া রোজভরা ওই গানগুলি, আর তাঁর মেজাজি কৌলিন্য। আজীবন যা ভাঙিয়ে খাব। চুরি যাওয়ার ভয় নেই, ভয় নেই আয়করের, সিবিআই হানার। ধন্য, ধন্যমহার্ঘ এই ধন। সারাদিন কাজের কম্মে বিকিয়ে রাতে এসে একান্তে বসি সুরের সঙ্গে সহবাসে। সেই গানগুলি থেকে বেছে নিয়ে সুরের আদর জড়াই সদ্য যৌবনের রাজশ্যী উষ্ণতায়।

সাংবাদিক অজয় বিশ্বাস মারফৎ মানাকাকু খবর পেয়েছিলেন, আমিও সুর করছি। একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁর মদন ঘোষ লেনের বিখ্যাত বাড়িতে। আমার তৈরি গান শোনাতে বললেন। দু'একটা গান শোনালাম, ভালো লাগলো। তারপর আমার হাতে একটা লেখা দিয়ে বললেন, শোনো তোমায় একটা লেখা দিচ্ছি। আরো দু'একজনকে দিয়েছি, তারাও সুর করেছে। খোকা, যদি তোমার সুর আমার ভালো লাগে তবেই গানটা গাইবো, নচেৎ নয়। তুমি মন খারাপ কোরোনা তখন। গত বছর পুজোয় কাকার (কৃষ্ণচন্দ্র দে) গানগুলো করেছি। এ বছর নতুন কিছু করতে চাইছে। সুর করো'।

বেলা বারোটা নাগাদ মানাকাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা টু-বি বাসে এসে উঠলাম। ভিতরে একটা উত্তেজনা। ফাঁকা আড়াইতলার একেবারে সামনের সিটটায় গিয়ে বসলাম। হাতে মানাকাকুর দেওয়া গানের পাতাটা। হু হু করে হাওয়া এসে লাগছে চোখেমুখে। আমি মধ্য দিনে বাসের বিজন বাতায়ণে বসে ক্লান্তিহরা এক বিলাসখানি ভোরের আলো মাখছি যেন ভেতরে মনে। জীবনে প্রথম সুর করার দায়িত্ব পেয়ে গুণগুণ করতে করতে চলেছি, 'মার স্নেহ কাকে বলে জানি না/বাবার মমতা কি বুঝতে বুঝতে/এ বিরাট পৃথিবীতে দেখলাম/ সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই..... মুখরার সুরটা হেদুয়া ছেড়ে বাসটা ভবানীপুরে পৌঁছানের আগেই এসে গেল। বাকি সুর এসে গেল তারপর দিন দুই-দিনের মধ্যেই, সব কাজ ফেলে ওই গানটাকে সময় দিতে। তখন সবে বি.কম অনার্সে নাম লিখিয়েছি; ক'খানা টিউশনি করি তিন ভাইবোনের সংসারটা কোনরকমে চালাতে।

মাসখানেক বাদে মানাকাকু কলকাতায় এলেন এবং একদিন ফোন করে বললেন গানটা শোনাতে যেতে। আমি গিয়ে গানটা শোনালাম। মানাকাকু চুপ করে বসে গানটা মন দিয়ে শুনলেন। গান শেষ হতে দেখি মানাকাকুর চোখে জল। বললেন, 'অপূর্ব। খোকা, তুমি অনেক দূরে যাবে। আমি এবার পুজোয় এট রেকর্ড করব'। সেই শুরু সুপর্ণকান্তির পথে হাঁটতে শেখা। এবং হয়তো বাংলা আধুনিক গানে ' ব্যালাড'-এর সঙ্গে আমার নামটা জানাজানি হতেই বাধা এল। কথার ঝড়ও উঠল। আজ বলতে দ্বিধা নেইম বাধা দিয়েছিলেন মুলত দু'জন। একজন গ্রামোফোন কোম্পানির তৎকালীন কর্তাব্যক্তি স্বনামধন্য বিমান ঘোষ। অন্যজন গানটির গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের আপত্তির মোদ্দা বয়নাটা ছিল: 'আপনার মতো

কেজন শিল্পীর পুজোর গানের সুর করা পোলাপানের কাজ’ মানাকাকু পাত্তা দিলেন না কারো কথায়। সোজা বলে দিলেন, ‘আমি এবার খোকার সুরেই গাইবেন।’ আমার না বললেও চলবে গানটার জনপ্রিয়তা নিয়ে। সকলেই সাক্ষী সেই ইতিহাসের।

গানটা রেকর্ড করেছিলেন প্রখ্যাত শব্দমুদ্রণ শিল্পী সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে ফোন পেলাম ভূপেন হাজারিকার। সুশান্তদার কাছে আমার ওই গানটা শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ওঁরও একটা পুজোর গানে আমায় সুর করে দিতে হবে বলে জানালেন। বাবা সেই বাতিল গানের ভাণ্ডার থেকে গৌরীকাকার লেখা ‘ও মালিক’ গানটায় সুর দিলাম। তার জনপ্রিয়তাও সর্বজনবিদিত। এখনেও আবার উল্লেখ না করে পারছি না সেই অনুভূত সত্য কথাটি- ‘পূর্ণের কাছে না পৌঁছালে পূর্ণতা আসে না জীবনে। আমার জীবন সবদিক থেকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রকৃত অর্থেই মানাকাকুর জন্য। নচিকেতা ঘোষ আমার জন্মদাতা পিতা। আর মানাকাকু আমার জীবনে পিতাস্বরূপ। প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে... শ্লোকে পিতা- পুত্রের যে সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তা আমি অনুপুঙ্খ বুঝে পেয়েছি মানাকাকুর মাধ্যমে। ষোলোয় জন্মদাতা পিতাকে হারিয়ে ষোলাআনা সম্পূর্ণ হতে পেরেছি মানাকাকুকে পিতার ভূমিকায় পেয়ে।

১৯৭৯ সালে কোনে বাঙালি শিল্পী ডাকেননি সুর করে দিতে। তখনো সেকালে শিল্পীরা সকলেই বেঁচে। আমিও নিজের ষড়জে মজে। কোনোদিন সুর করে দোরে দোরে গান শুনিয়ে ফেরি করতে যাইনি। যাওয়ার তাগিদই পাইনি ভিতর থেকে, কেননা যে বাবার ছেলে, তাতে যাওয়া যায় না। আর মানাকাকুর কাছ থেকে ওই আত্মমর্যাদার ভাইরাসটাও যে ঢুকে গিয়েছে ভিতরে। অন্যদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, মানাকাকুর কাছেও কোনোদিন গানের ভিক্ষে চাইনি। উনি কলকাতায় এলেই ডেকে পাঠিয়েছেন। গেছি। গান শুনেত চেয়েছেন। যে গানই শুনিয়েছি,তাই গেয়েছেন সাগ্রহে। ১৯৮০ তে গ্র্যাজুয়েশন দেব। ১৯৮৯ তে মানাকাকু করলেন ‘সারা বছরের গান’। ১৯৮০ তে পুলককাকা লিখলেন ‘সারা জীবনের গান’। মানাকাকুকে দেখাতেই তিনি বললেন, ‘খোকাকে দিন, ও গানগুলো সুর করবো, আমি এবার পুজোয় গাইবো গানগুলো’। সুর করলাম। মানাকাকু শুনলেন। একটা নোটও পাল্টালেন না সাতটা গানের কোথাও। এমনকি মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কোথাও এতটুকু প্রশ্ন তোলেননি। হে আমার সহৃদয় পাঠক, টের পাচ্ছেন কি, সন্তানের জন্য একজন পিতা কতখানি স্নেহময় হয়। নাকি মানাকাকু নিজেই বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁর খোকা তার সুরের গহনে বুনোনে বয়ানে যে নিজস্ব ভাস্কর্য গড়ে, তা চেতনে অবচেতনে তাঁরই জন্য শরণাগত নিবেদনে। মানাকাকু দারুণ প্রশংসা করলেন আমরা কুড়ি ছোঁড়া বয়সের সুর করা ‘মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়’ গানটার সুরেরা বিতত বিন্যাসে, ‘আমায় চিনতে কেন পারছ না মা’ গানটায় কীর্তন না শিখেই বাংলার কীর্তনের মেজাজ গেঁথে ফেলায়।

আমি মানাকাকুর মুখে আমার একের পর এক গানের প্রশংসা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, অমন মানুষের কাছ থেকে যে সুরের জন্য প্রশংসা পাচ্ছি, আর জীবনে (তথাকথিত) গ্যামি পুরস্কারের চেয়েও সহস্রগুণ মহার্ঘ স্বীকৃতি পাচ্ছি, সেই সুরগুলো কী করে এলো আমার মতো' পোলাপানের' নাগালে। অনুভব করলাম, জগতের কোনে মহার্ঘই তৈরি করা যায় না। সেটা আসে, আর তা অর্জন করতে হয় শরণাগত হয়ে তাঁর সঙ্গে ষড়জটা মিলিয়ে। মেলানও তিনি, গুরু মারফৎ। মানাকাকু আমার সেই গুরু।

আজ এই অমার্জিত অসংস্কৃতির দিনে 'গুরু' শব্দটাও অযোগ্য ব্যবহারেরই দোষে তার প্রার্থিত ওজন ও সম্মান হারাতে বসেছে। আমি তাই নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত 'গুরু' ব্যবহার না করে শব্দটার আদি, অকৃত্রিম মর্মার্থটা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধরে বলি 'মাস্টার'। মানাকাকু ইজ মাই মাস্টার। আমি একলব্যের মতো তাঁরই শরণাগত।

এরপর মাস্টার ডিগ্রি করেছি, পেয়ে গিয়েছি একটা চাকরিও। চাকরিতে প্রমোশন নিইনি কোনো প্রলোভনেও, মানাকাকু চাননি বলেই। কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে হবে বলে।

মানাকাকু ওঁর উচ্চতায় থেকেও প্রতিবারই আমার সুরে গান রেকর্ড করার আগে স্বভাবমতোই আমাকে বলেছেন, 'খোকা, গানটা শিকিয়ে দিয়ে যেও'। ওঁর কথামতো শেখাতে গিয়ে নিজেই কত শিখেছি। ওঁর মতো মানুষের কাছে শিখে নেওয়াটাও শিক্ষণীয়। একটা গান কী করে শিখে নিতে হয়, কোনখানে তার হৃদয়টা থাকে, যা শিখে নিলে হাত পা আঙ্গুল সহ শরীরের সবটা জানা হয়ে যায়। মানাকাকুকে গান শেখাতে গিয়ে পূর্ণ অবগাহন করেছি সঙ্গীতের অতলান্ত গহনে। এমন ছাত্র পাওয়াও যে কোনো শিক্ষকের সাতপুরুষের ভাগ্য।

'বাবা মেয়ের গান' শিরোনামে একটা অ্যালবামের কাজে মুম্বাই গেলাম মানাকাকু আর সুমিতাকে (মানাকাকুর মেয়ে) গান শেখাতে। সকালে মানাকাকুর বাড়ি গেলাম, ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন ও রয়েছে। পৌঁছাতে দেরি হল খানিকটা। গিয়েই গানে বসে গেলাম।

ওদিনটায় মানাকাকুরা নিরামিষ খান। একসময় বললেন, ' খোকা, তুমি সুমিতাকে গানটা শেখাও, আমি এখুনি আসছি।'। খানিক পরে ফিরেও এলেন। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে আন্টি জানালেন, আমি একেবারেই নিরামিষ খেতে পারি না বলে মানাকাকু তখন বেরিয়ে ক্লাব থেকে আমার জন্য রেশমি কাবাব নিয়ে এসেছেন।

কত কথা, কত অনুষঙ্গ, কত গান। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। 'দশ বছরের বংশী'', মুচির ছেলে' গানটা লিখে পুলককাকা খুব আহ্লাদ করেই মুম্বাই গিয়েছিলেন মানাকাকুকে শোনাতে। মানাকাকু ও লেখা দেখে বিরক্ত হয়ে বল দিয়েছিলেন, 'দূর মশাই, ওইসব মুচি ফুচির গান আমি হই না। আমি প্রেমের গান গাই,

জানেন না? পুলককাকা বিরস মনে ফিরে এসে গানটা আমায় দিলেন। আমার বিষয়টা মন্দ লাগেনি। সুর করে ফেললাম। মানাকাকু ক'দিন পরেই কলকাতায় এসে যেমন ডেকে পাঠান তেমনি ডাকলেন। নতুন কী গান করেছি জানতে চাইলে ওই গানটার কথা বললাম। প্রথমে বিরক্ত হলেও সুরটা শোনাতেই বলে উঠলেন, 'বাঃ বেশ করেছ তো, মন্দ লাগছে না'। গানটা রেকর্ড করলেন। রেস্ট ইজ হিস্ট্রি। এমনই মানুষ মানাকাকু। অসম্ভব জেনুইন।

১৯৮৩ তে গৌরীকাকাকে দিয়ে একরকম গায়ে পড়েই লিখিয়েছিলাম 'কফি হাউস' গানটা। মানাকাকুকে শোনাতেই অসম্ভব খুশি হয়ে নিজেই গৌরীকাকাকে ফেন করে গানটা গাইতে চান জানালেন। বলতে ভুলে গিয়েছি, ১৯৮০-র ষোলোই আগস্ট ইডেনের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অসামান্য গান লিখলেন, 'খেলা ফুটবল খেলা'। তাতে সুর করলাম। মানাকাকুকে শোনাতে উনি দারুণ চার্জড হলেন। রেকর্ড করলেন। কী অসামান্য গাইলেন ওই ব্যালাডটির ইনার ড্রামার সবকটা শেড। মুগ্ধ হয়ে ভাবি, শ্রুতিশুদ্ধ সুরের তাবৎ স্ফূরণের তো কথাই নেই, ভাব ও নাট্যের এমন অভূতপূর্ব প্রকাশেও আমার কাছে মানাকাকু একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এই তো গত মার্চেই বাংলার লোকায়ত ছড়া নিয়ে আমার চলতি প্রোজেক্টায় মানাকাকুকে দিয়ে রেকর্ড করালাম কটা ছড়ার গান। সঙ্গে সংলাপও। ১০/১২ তারিখ নাগাদ ফোন করে মানাকাকুকে বিষয়টা জানাই। উনি কুড়ি তারিখ এলেন। সন্ধ্যেয় যেতে বললেন গানটা শেখাতে। গান শুনে চিরদিনের স্বভাবমতো নিজের হাতে গোটা গোটা করে নোটেশন করে নিলেন। অমন ডিটেলে নোটেশন করতে কাউকে আমি আর দেখিনি।

২২ তারিখ মানাকাকুর গান রেকর্ড করবো ঠিক হয়েছিল। আগেই কথা হয়েছিল উনি বেলা এগারোটায় স্টুডিওতে আসবেন। আমি এবং আমার সহকারীরা প্রাক প্রস্তুতি নিতে সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছি। বকেয়া কাজ কিছু সেরেও নিচ্ছি। ঠিক এগারোটায় স্টুডিওর দরজা ঠেলে মানাকাকু ফ্লোরে ঢুকতে বললেন, 'খোকা, ঘড়িটা মিলিয়ে নাও, এখন এগারোটা বাজে'। ঘড়ি মেলাবো কি-এত বছর ধরে দেখছি, মানুষটা জীবনে কোথাও পৌঁছাতে একদিনও এক মিনিটও এদিক ওদিক করেনি। আমি সবদিক থেকে এমন সম্পূর্ণ মানুষ আর একটাও দেখিনি।

তো, উনি এলন, বসলেন, কানে হেডফোনটা লাগালেন, আর নিজের হাতে তৈরি করা নোটেশনের কাগজটা চোখের সামনে ধরে নিখুঁত অনায়াস নৈপুণ্যে ছড়াগানটা গেয়ে ফেললেন। এরপর, আমার প্রতি ওঁর অকুণ্ঠ স্নেহের সহজ অধিকারে ওঁকে একটি সংলাপও বলতে বলেছিলাম (জানা নেই, মানাকাকুকে অমন বেআদপ আর্জি জানাবার মতো আর কেউ আছেন কিন)। মানাকাকু আমার কথামতো সংলাপটি বলে দিলেন মাইক্রোফোনের সামনে। একটা টেকেই ও কে হল। আমার সেই বেআদপ আর্জিটি কি ছিল,

শুনবেন? আমি ওঁকে সংলাপটা অতীতের স্বনামধন্য কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদারের নকল করে করতে বলেছিলাম!

একঘণ্টার মধ্যে মানাকাকু কাজ সেরে উঠে যাওয়ার আগে আমি একসঙ্গে দুটো কাগজে ওঁর সই চাইলাম নিয়ম মতো। কলমটা চেয়ে নিয়ে প্রথম কাগজটায় কী জন্য তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনার এন ও সি ফর রিলিজিং দি অ্যালবাম'। এটা শিল্পীদের দিতে হয়, জীবনভর দিয়েও এসেছেন। খসখস করে সই করে দিলেন। তারপর অন্য কাগজটা দেখিয়ে বললেন, 'আর ওটা?' আমি ততক্ষনে পকেট থেকে মাত্র পাঁচ হাজারের একটা নতুন নোটের বাণ্ডিল বের করেছি। 'আপনার সম্মান মূল দেওয়ার মুরোদ আমাদের নেই। সামান্য কিছু... ' বলার আগেই মানাকাকু কলমটা রেখে সটান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমাদের এই মহৎ প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়েছি, এর চেয়ে বড়ো পাওনা আর কিছু হয় না। এরপর টাকা নেওয়ার কথা ভাবতেই পারি না'। এই বলে সকলকে বিদায় জানিয়ে রাজারা মতোই ফ্লোর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন মানাকাকু। সেই ছেলেবেলা থেকেই মানুষটা সামনে এসে দাঁড়াইলে আমার চারপাশটা ভরে যেত উৎসবের বর্ণময়তায়। আর যে মুহূর্তে উনি চলে যেতেন, যত ভীড়ের মধ্যেই থাকি না কেন, খাঁ খাঁ শূন্য হয়ে যেতাম। সেদিনও নব্বই ছুঁই ছুঁই মানাকাকু চলে যেতেই ফাঁকা হয়ে গেল ফ্লোরটা। নাকি, আসলে আমরা ভিতরটাই দুচোখ ভরে জল আসছিল, বারবার। এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আমার চাওয়াগুলো তাঁর দেওয়া অকৃপণ প্রাচুর্যের কাছে কেমন হার মেনে যায়। ভাবছিলাম, আমার পঞ্চাশ বছরের জীবনে শুধু মানাকাকুর জন্য সুর বেঁধেছি পঞ্চশটার মতো গানে। পরক্ষণেই ভালো একটা সুরের মুখরা পাওয়ার মতো খুশি হলাম এই যোগাযোগটুকুর জন্য- তাহলে, আমার এ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বছরই যেন এক একটি গানের অর্ঘ্য হয়ে গিয়েছে আমার 'মাস্টার' মানাকাকুর জন্য।

আমি প্রতিদিন সন্ধ্যেয় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্নান করে এসে ঢুকি আমার গানের ঘরে। প্রতিদিন আমার হারমোনিয়ামটাকে টেনে নিই কোলের খুব কাছে। বেলোটা খুলে এক বুক শ্বাস নিয়ে আমার আঙুলগুলো প্রথম যে রীডেই পড়ুক, এই 'পূরবী জীবনে পৌঁছে বেশ টের পাই, হাতটা আমার আসলে তাঁরই চরণেই পড়ে। পড়ে এসেছে আজীবন, আমার এই জীবনের সন্ধ্যাহ্নিকে।

না পড়ে যাবেই বা কোথায়। সুপর্ণকান্তি যদি একটা নদী হয়, তার উৎস যে মহাদেবের জটা থেকে, তার নাম মান্না দে। আমার মানাকাকু।

জানুয়ারি ২০১০

সংযুক্তি ৮

i|cvqY fÆvPvh ü'‡q †j‡Lv bvg gvbv M‡šÍi ÔKwd nvDmUvB ïa †_‡K hvqÕ

kxlK iPbvq †MŠixcmb gRg'vi m¤úv‡K †h Av‡jvPbv K‡ib

Zv GLv‡b msh³ Kiv n‡jv

Kwd nvDmUvB ïa †_‡K hvq

i|cvqY fÆvPvh

পায়ে পায়ে সন্ধ্যার ক্লান্তি নিয়ে
যারা যায় ফিরে শহরে নগরে
পায় কি মনে সূর্যের গতিবেদ
অস্তরাগের ছোঁয়া অন্তরে
রাত্রি যেন এক রাজকন্যে
বন্দিনী হয়ে ওই অরণ্যে
তার কান্না ভেজা নীল চোখে
কবে আসবে নেমে সেই রাজপুত্তুর।

প্রথম যে দিন এ গান শুনলাম, মনে হয়েছিল ভাষাটা কী। এ কি বাংলা? না অন্য কিছু? পরে বারবার গানটা শোনার পরে প্রতিবার মনে হয়, এই উচ্চারণ কি কবির? না গায়কের?

সেই গানের কথা বলছি- 'এক ঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর, বাধা ভেঙে জানলার শার্সি সমুদ্দুর'।

'রোদ্দুর' নিয়ে দিয়ে প্রথম লাইনটা শেষ হয়েছিল। শেষ লাইনের শেষে এল 'রাজপুত্তুর'। এ রকম মিল বাংলা গানে নেই।

আর কী নেই?

গানটা বারবার শুনলে একটা জিনিস মনে হয়। একটা সময় কবিতার মতো গানটা আবৃত্তি হচ্ছে। আবৃত্তি হতে হতে গানটা একেবারে গান হয়ে যাচ্ছে। গান এবং কবিতা মিশে গিয়েছে সেখানে।

সালতামামির বিচারে এটা মান্না দে'র ১৯৬২ সালের গান। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। এই রেকর্ডের অন্য পিঠে রয়েছে 'চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে'। অজয় চক্রবর্তী একটা সময় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে গাইতেন মান্নার গান। মান্না প্রসঙ্গ এলেই তিনি বলেন 'চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে' গানটার কথা। 'আকাশ করে ছাদটাকে/বাড়াই যদি হাতটাকে' বলার পরে অজয়বাবু বলে. "ছাদটাকের সঙ্গে হাতটাকে বলা খুবই কঠিন। কিন্তু এত স্পষ্ট উচ্চারণ সমস্যা হয়নি মানার গানের ক্ষেত্রে।"

১৯৬১ সালে কোনও পুজোর গান করেননি মান্না। ১৯৬০ সালে করেছিলেন দুটো চূড়ান্ত প্রেমের গান। 'আমার যদি না থাকে সুর'। 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই'। কিংবদন্তি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল দুটো প্রেমের গান। এক বছর বাদে চূড়ান্ত অপ্রেমের গান।

কিন্তু কেন? উত্তর একটাই। সুধনী দাশগুপ্ত। তত দিনে মান্নার সঙ্গে সুধীনের ভালবাসার গ্রন্থি অনেক দৃঢ় হয়েছে। এবং তার ফলস্বরূপ ওই দুটো গান। সুধীন প্রেমের গানের বাইরে কিছু করতে চেয়েছিলেন। সলিল চৌধুরীর মতো তো তিনিও নতুন ধরনের গানের স্বপ্ন দেখতেন।

রোদ্দুর ও রাজপুত্তুরের আগে, ১৯৫৯ সালে মান্নাকে দিয়ে সুধীন গাইয়েছিলেন, 'মেঘলা মেয়ে মেঘেরই সাজ পরেছে/তার ছায়া তার মনেতে আজ ধরেছে'। আধুনিক গানে ওটাই মান্নার প্রথম চূড়ান্ত অপ্রেমের গান। কিন্তু সেখানেও ওই লাইন ছিল, 'এই বেলা তার এই খেলাতে মন দিতে সে চায়/তার তরে সে বিদ্যুতেরই মালা গেঁথে যায়'। কী চমৎকার চিত্রকল্প। বিদ্যুতের মালা গেঁথে যাচ্ছে মেঘ। মন দিতে চায় সে। এটা প্রেমের গান, না, অপ্রেমের গান?

বাংলা গানে তত দিনে 'রানার' হয়ে গিয়েছে এগারো বছর হল। 'গাঁয়ের বঁধু' হয়েছে ১৯৪৯ সালে। 'অবাক পৃথিবী', 'ধিতাং ধিতাং', 'ধান কাটার গান', 'নৌকা বাওয়ার গান' ও বেরিয়ে গিয়েছে, প্রায় দশ বছর হল। এই প্রেক্ষাপটেও মান্নার দুটো নতুন অপ্রেমের গান অন্য মাত্রা দিয়ে গেল বাঙলা গানকে। মান্না-সুধীন জুটির 'চার দেওয়ালের মধ্যে' ও 'এক ঝাঁক পাখিদের মতো' এক অনবদ্য রূপকথা সৃষ্টি করে যায়। দুটো গানেই ছন্দ এক অন্য মাত্রা ছুঁয়েছিল। 'চার দেওয়ালের মধ্যে' গানের সেই জায়গাটা লিখতে লিখতেই গুনগুন করতে হয়। 'কলম ঘিরে ছায়ার মতো সঙ্গিনীরা আসে', গাওয়ার সময় একটা স্কেলে গান মান্না। গাইতে গাইতে অন্য রকম স্টাইলে চলে যান হঠাৎ।

অবাক ব্যাপার হল, এই রকম অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরেও মান্না-সুধীন জুটি বাংলা আধুনিক গানে হেমন্ত-সলিল জুটির মতো অজস্র কিংবদন্তি গান আনতে পারলেন না। 'একই অঙ্গে এত রূপ', 'আমি তার ঠিকানা রাখিনি' বা 'কথায় যে রাত হয়ে যায়' এর মতো বাকি সব গানই অতি জনপ্রিয়। কিন্তু এখানে

প্রেমের বাইরের গান কোথায়? কোথায় 'রোদ্দুর' থেকে 'রাজপুত্তুরের' ছড়াছড়ি 'তুমি আর আমি' কে অতিক্রম করে?

মান্না তার পরে শুধু প্রেমের গানে, প্রেমের গানে, প্রেমের গানে। বহু পরে আবার প্রেমের বাইরে গান এল। এবং সবক'টা হিট। তালিকা বানাই আর ভাবি, এ সব গান আগে গল না কেন? আরও আগে?

ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে

সে আমার ছোট বোন

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই

নীলাম নীলাম

খেলা ফুটবল খেলা

আজও পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী

আমি কি আর ভাল হব না?

ভোরা রে

আমি হারিয়েছি মোর ছোট্টবেলা

তুই কি আমার পুতুল পুতুল

মনে পড়ে সেই দিনটি

দশ বছরের বংশী

সলিল চৌধুরীর সুরে অসামান্য দেশপ্রেমের নন ফিল্ম গানগুলো কোথায় রাখব, এখানেই তো রাখতে হবে।

ধন্য আমি জন্মেছি মা

মানব না বন্ধনে

এই দেশ এই দেশ

আহ্বান শোনো আহ্বান

ও আলোর পথযাত্রী

সাড়ে তিন কোটি মানুষের

ও ভাই ভাই রে

স্লোগান সর্বস্ব এ রকম অনেক গানে সুর থেকে বেরিয়ে এসে মান্না হয়ে পড়েছেন জনগণের প্রাণের। যেন শ্লোগান নিয়েই গান হচ্ছে। আবৃত্তি ও গান মিলে যায় নদীর সাগরে মেশার মতো।

'ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে' কি প্রেমের গান? না অপ্রেমের?

তার সানাইয়ের সুর দিয়ে শুরু হয়েছিল গানটা। শুনলে মনে পড়বে 'মেঘলা মেয়ে মেঘেরই সাজ পড়েছে' গানটা। ও গানে মেঘ প্রেম করত। এখানে চাঁদকে বলা হচ্ছে, মেঘেদের উড়ো চিঠি উড়েও তো আসতে পারে। তাই সামলে রাখো জোছনাকে। মান্নার গানের অন্যতম শক্তি হর, কথা বলার টঙে গান গেয়ে যাওয়া। এই গানটা এক অনবদ্য সৃষ্টিতে পৌঁছে যায়। মেঘ, চাঁদের বাইরে সত্তর দশকের একেবারে শেষ দিকে গাওয়া তাঁর একটা মন-ছোঁয়া গান মাথায় ঘোরে। 'ভোমরা রে, ও ভোমরা/তুই এ ফুলে ও ফুলে কী কথা শুনিয়ে যাস রে/ সে কি না- লেখা কোনও কবিতা, তাই লুকিয়ে কিছু শুনে তা/খুশিতে আবেগে কাঁপে যে ফাগুন মাস রে।'

ব্যক্তিগত পছন্দের কথা তুললে মান্না'র গানের সেরা সিডি বলা যায় 'সারা বছরের গান' ও 'সারা জীবনের গান'। মান্না'র নিজেরও এই দুটো রেকর্ডের উপর দূর্বলতা প্রচণ্ড। প্রেমের সম্রাটের তার মানে দুটো পছন্দের রেকর্ডই অপ্রেমের। 'সারা বছরের গান'- এর রেকর্ড বেরিয়েছিল ১৯৭৮ সালের বসন্তোৎসবে। প্রথম দিকে অত হিট হয়নি। যত সময় যায়, তত অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা পেতে থাকে সব গান। 'সারা বছরের গান' ১৯৮০ সালে বেরোয়। বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হিট। মনে আছে, রেকর্ড কভারে একটা প্রজাপতির ছবি ছিল। জীবনধারায় যেন উড়ে যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে।

'সারা বছরের গান' ও 'সারা জীবনের গান'- এর গানগুলো নিয়ে সারা দিন ধরে লিখে যেতে পারি। এত বৈচিত্রময় গান খুব কম হয়েছে। এক-একটার স্টাইল এক রকম। সারা জীবনের গানে 'আমি রাজি, রাখো বাজি, ওয়েস্টার্ন স্টাইলে গাওয়া। তার পরেই বসন্ত রাগের উপর তৈরি 'এসো যৌবন এসো হে' একেবারে অন্য বাতাস এনে দেয়। 'তুমি আর আমি' গানে দুর্দান্ত তারুণ্যের গন্ধ লাগা সুর। 'মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়' গানে অন্য বিষণ্নতা। স্তব্ধ করে দেয় আমাদের। গানটার আগে ও মাঝখানে টানা একটা গিটার বেজে গিয়েছে পেণ্ডুলামের মতো। যেন আমাদের পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছে। সুরকার সুপর্ণকান্তির কাছে শোনা, গিটারের পিসটা ছিল খোকন মুখার্জির। ঘুম ভেঙে যাওয়ার বেদনা থেকে সুপর্নন সুরেই একটা অন্য রকম গান ছিল অনেক পরে। 'নেই ঘুম নেই চোখে ঘুম'। মান্না ও সুপর্ণ, দু'জনেরই খুব পছন্দের গান।

'সারা জীবনের গান'- এর শেষ গানটাও অসাধারণ। 'আমায় চিনতে কেন পারছ না, মা'। এ গানে আবার লোকসুর। হাহাকার। ব্যাঞ্জো এবং বাঁশি দিয়ে এ গানের প্রিল্যুড তৈরি। বাঁশিটা বাজিয়েছিলেন

অলোকনাথ দে। এমন মর্মভেদী বাঁশি শোনা গিয়েছিল আবার 'সারা বছরের গানে'। শরতের গান 'স্বপনে বাজে গো বাঁশি'র ঠিক আগের প্রিল্যুড। বাঁশিটা বাজিয়েছিলেন মুম্বইয়ের বিখ্যাত রঘুনাথ শেঠ। বর্ষার গান 'গান মেঘের ছায়া' গানের সরোদ ছিল জারিন দারুওয়ালার। মুম্বইয়ের বিখ্যাত গীতিকার প্রদীপ একবার মান্না দে-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রতিটা গানে এক-একটি বাদ্যযন্ত্রকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারই প্রতিফলন যেন এ সব গানে। 'গহন মেঘের ছায়া' গানে যেমন বেজে গিয়েছে সন্তুর।

এ সব কথা থাক। বলছিলাম 'আমায় চিনতে কেন পারছ না'র কথা। এ গানের সঙ্গে সহজেই তুলনা টানা যায় ডাকহরকরা সিনেমার অমর গান 'ওগো তোমার শেষ বিচারের আমায় আমি বসে আছি'। মান্নার কাছে শুনেছি, এই গানটা শুনে তাঁর মা মহামায়া দেবী ছেলেকে বলেছিলেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তুই এ গান গাইলি কী করে?' মান্না পুলক বন্দ্যোপধ্যায়ের কথা বলেছিলেন। 'পুলকবাবু লিখেছে বলেই গেয়ে দিয়েছি।' পুলক আবার তাঁর মায়ের প্রশ্নে উল্টে ব্যাখ্যা দিয়ে জননীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। 'মান্নাদা গাইতে চেয়েছিলেন বলেই আমি লিখেছি'। ঠিক যেমন 'ছোট বোন' গাওয়ার পরে মান্না ও পুলক, দুজনকেই প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, কার বোন ক্যান্সারে মারা গিয়েছে?'

এই সব অপ্রেমের গানের পরেই মান্না এ ধরনের গান গাইতে শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে মারা গিয়েছিলেন মহামায়া দেবী। তার দু'বছর বাদে মান্না দে সুপর্ণকান্তির সুরেই মা'কে নিয়ে অদ্ভুত এক মায়াবী গান উপহার দেন বাঙালিদের। মান্না সুপর্ণ জুটির 'মা', মাগো'র মতো উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা সম্পর্শ করেনি সেই গান। অনেকে জানেন না। কিন্তু যাঁরা একবার শুনেছেন, বারবার শুনতে চাইবেন। বাংলাদেশের লোকের কাছে, তাঁদের ইন্টারনেটে আলোচনার বহরে দেখব, এই গানটাই যেন বেশি জনপ্রিয় সেখানে। 'আমি হারিয়েছি মোর ছোট্টবেলা/হারাইনি তো মাকে/আজও আমায় ঘিরে মা যে আমার সবখানেতেই থাকে/যখন দেখি কারও ঘরে ছোট্ট খুকু হাসে/ আমার মায়ের মুখটি তখন চোখে আমার ভাসে/ইচ্ছে করে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি তাকে/চোখের উপর দেখি আমার করুণাময়ী মাকে।' দু'বছর বাদে পরিচিত কবি বটকৃষ্ণ দে-র কথায় তিনি গেয়েছিলেন ভোরের কুয়াশা নিয়ে। অসাধারণ গান। 'ও কুয়াশা, ভোরের অবুঝ কুয়াশা রে'। কুয়াশার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে গান গাইলে যেমন হয়, তেমন গান। গানের ইন্টারল্যুডগুলো চমৎকার। লিখতে লিখতেই মনে হচ্ছে, ও সব লিখে ফেলি। টুরু রুং টুরু রং। বোঝানো যাবে না কিছুই। তবু লিখে ফেলি।

এ গানটা লিখতে লিখতেই মনে পড়ে গেল অন্য একটা গান। 'মনে পড়ে সেই দিনটি, যেদিন পাখিকে গাইতে দেখে।' নিজের সুর। মান্না যখন গাইছেন, 'আমি ভয়ে ভয়ে মুখ খুললাম, কণ্ঠতে সুর তুললাম।' মনে হবে সত্যি তিনি প্রথম গাইছেন। পাখিকে দেখে গাইতে শুরু করেছেন। এখন ভয়ে ভয়ে মুখ খুলছেন। মনকে এত স্পর্শ করে গানটা যে মনে হয়, আর একবার শুনি, এর একবার শুনি। প্রতিবার।

অপ্রেমের গানের আর একটা সুপারহিট গান 'খেলা ফুটবল খেলা'। ১৯৮০ সালে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখতে গিয়ে মারা গিয়েছিলন ১৬ জন দর্শক। তাঁদের স্মরণে মান্না গেয়েছিলেন অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান। 'টাকার ফানুস' নামে তখন সিনেমা করছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ কুমার। সুরকার সুপর্ণকান্তি। মান্না গান রেকর্ডিং করে যাবেন সোজা মুম্বাই। রেকর্ডিংয়ের পরে সত্যবাবু মান্না'কে শুনিয়েছিলেন এই কবিতা। মান্নার এত পছন্দ হয় যে সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণকান্তি'কে সুর করতে বলে বেরিয়ে যান বিমান ধরতে। সুপর্ন তার পরে সত্যবাবুর সঙ্গে অনেক দিন বসে বদলাতে থাকেন কবিতাটা। তপন থিয়েটারে সত্যবাবুর কাছে যেতেন নচিকেতা-তনয়। কখনও সত্যবাবু আসতেন সুপর্ণকান্তির নিউ আলিপুরের বাড়ি। এইভাবে অনেক আলোচনার পরে গানটা দাঁড়াল।

উল্টো পিঠের গানটা বরং মান্নার সবচেয়ে অপরিচিত গানের একটা। সেটা আবার প্রেমের। 'এত লোক, এই শহরে তারে কথা ছেড়েছুড়ে যখনই আমার কথা ভাবছ তুমি, তখনই তো হচ্ছে প্রমাণ আমায় মনে করছ তুমি'। এত সিরিয়াস আবেগময় গানের সঙ্গে এমন তরল প্রেমের গান বানানোই ভুল।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এইচ এম ভি-তে যে ক'টা গান করেছিলেন, তার মধ্যে এ গান সবচেয়ে ব্যর্থ বলা যায়। কেন হঠাৎ এই গান? আসলে 'খেলা ফুটবল খেলা'র উল্টো দিকের জন্য সত্যবাবুই আর একটা গান লিখেছিলেন। যার বিয়ষবস্তু 'চোর'। সুর করেছিলেন সুপর্ণই। মান্নার সুর পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু নাধ সাধেব পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের গান ঢোকানোর জন্য দ্বারস্থ হন মান্নার। এবং সেই 'চোর' গানটা বাদ দিয়ে ঢোকে পুলকের গান। বহু বছর বাদে সেই 'চোর' গানটা সুপর্ণর সেই সুরও করেন মান্না'র ভাইপো সুদেব। 'খেলা ফুটবল খেলা'র কথা তুললে গুনগুন করে ইচ্ছে হয় সেই গানের ২৬ বছর পরে ক্রিকেট নিয়ে গাওয়া গান-'জীবনটা ভাই ওয়ান ডে ক্রিকেট'।

এ সবের পাশাপাশি মনে পড়বে প্রেমের বাইরে মান্নার দুটো অন্য রকম গান। দুটোই কী জনপ্রিয়। একটা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে নিয়ে তৈরি তাঁর অনুরাগিণী সুরকার নীতা সেনের সুরের এপিটাফ। গৌরীবাবুর মৃত্যুশয্যায় লেখা গান 'আমি কি আর বাল হব না ডাক্তার রায়'। গৌরীবাবুর জবানবন্দীতে এ গান মান্নার 'কী বলছেন সিস্টার? টেম্পেরেচার নেবেন? ভিজিটিং আওয়ার্সে মমতা এলে প্লিজ ডেকে দেবেন। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে' বলতে বলতে চিরকালের জন্য থেকে যাওয়ার যন্ত্রণা ফুটে ওঠে সেই গানে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পরের গান ঠিক এইখানেই আনা উচিত। 'পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছে বন্ধু আমার'। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই মান্নার ওই দুরন্ত গলা নেই তখন। যা গৌরীবাবুর এপিটাফে ছিল। কিন্তু আবেগ, নাটকীয়তা, অভিনয় দক্ষতা কাড়বে কে? তিনি যখন গলা চড়ায় তুলে গেয়ে ওঠেন 'কোন অভিমান বুকে নিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে', তখন পুলকের আত্মহত্যার কথা মনে

আসবেই। মনে আছে, নেতাজি আন্ডোরে সংগীতজীবনের ষাট বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এই গানটা গেয়ে উঠলে চোখের কোন ভিজে উঠেছিল মান্নার।

গৌরীবাবুর এপিটাফ গাওয়ার সময়ই একটা গান ওপার বাংলায় তোলপাড় করে দেয়। 'সেই ঢাকা মেল নেই তো আর'। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিখ্যাত জিনিস নিয়ে লেখা গান বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বাজে। ওই সময়ের আগে এবং পরে আর একটা গান মনে পড়ে খুব। 'এই জীবনের বেশিটাই দুঃখ/তবু একটু সময়ের জন্য যদি দুঃখ ভোলাতে পারে কোনও গান/জানি এ গান আমার হবে ধন্য'। এ গানের সঙ্গে আর একটা গানের মিল পাই। 'অভিনন্দন নয়, প্রশংসা নয়/নয় কোনও সংবর্ধনা/মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই আমি/এই হোক শুভকামনা'। তবে দ্বিতীয় গানের তুলনায় প্রথম গানের সুরটায় অনেক মনছোঁয়া ব্যাপার রয়েছে। যখন বলছেন, 'এই জীবনের বেশিটাই দুঃখ', তখন হঠাৎ সব উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেয়। ২০০৭ সালেও তিনি যখন কাকা কেনিয়ে গান গেয়ে ওঠেন, 'ঠিক ছবির মতো', তখন আলোমালায় সেজে ওঠে সে গান।

তাঁর মাকে নিয়ে গান জনপ্রিয়তার এভারেস্টে পৌঁছে যায়। মান্নার পিছনে অনেক দিন কোম্পানির কর্তারা লেগেছিলেন শ্যামাসঙ্গীত গাওয়ার জন্য। মান্না কিছুতেই টিপিক্যাল শ্যামাসঙ্গীত গাইতে চাননি। বলে দেন, "ও রকম মা মা বলে চেঁচানো সম্ভব নয়।" শেষ পর্যন্ত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন গন তৈরি করলেন, যার দুটো মানে হয়। জন্মদাত্রী মা-ও হতে পারে, মন্দিরের মা-ও।

সেই গান যে অবিশ্বাস্য সাফল্য পাবে, কে ভেবেছিল? একদিন গড়িয়া-টালিগঞ্জ রুটের অটোর পেছনে দেখলাম লেখা-আমায় একটু জায়গা দাও। তখনই মনে হয়েছিল, এ কী, এ তো সেই গান! তার পরে শুনি, মান্না দে'র ওই গান বাংলার ঘরে ঘরে বাজছে। 'যখন এমন হয়, জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা/ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই, রেলের লাইনে মাথা রাখি/কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়/আমি তো আছি, ভুললি তা কি/ মা গো সে কি তুমি?' এবং তার ক'দিন পরেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁপ দিলেন গঙ্গার জলে। বহু দূরে ভেসে উঠল তাঁর শবদেহ।

মান্না দে'র সমস্ত প্রেমের গানের মাঝখানে এই গানগুলো শুনলে দুটো প্রশ্ন উঁকি মারে। জীবনের সেরা সময়ে ভক্তিগীতির রেকর্ড করার ডাক উপেক্ষা করে কি ভুল করলে মান্না দে? তিনি নিজে মনে করেন, ভুল করেননি।

সেটাই একশো ভাগ ঠিক।

আগে ভক্তিগীতির দিকে চলে গেলে কী করে শুনতে পেতাম প্রেম বনাম অপ্রেমের এই বিশুদ্ধ মন্ত্র? অনন্ত তালিকার এ সব অমর গান?

Dhaka University Institutional Repository

এবং কফি হাউস। ইচ্ছে করেই যা সবার পরে আনা হল।

বিবিসি-র সর্বকালের সেরা গানের তালিকায় এই গান একেবারে প্রথম দিকে।

গানটার গল্প একটু শোনানো উচিত হবে এখানে।

তাঁর 'গৌরীকা'কে বেশ একটু উদ্দীপ্ত করোর জন্য নচিকেতা ঘোষের ছেলে সুপর্ণ বলেছিলেন, 'কী গদগদে প্রেমের গান লিখে যাচ্ছ? একটু অন্য রকম গান লিখে দেখাও না।"

আশা-রাহুলের গানে তখন গৌরীপ্রসন্ন সুপার সুপার হিট। বাংলা গানেক কথা বলার মেজাজে এনে ফেলেছেন। অনেক রাস্তার কথা ঢুকে পড়েছে সেখানে। মনে আছে তো, 'এই এ দিকে এসো, এসো না' বা 'লক্ষ্মীটি দোহাই তোমার, আঁচল টেনে ধরো না'।

সুপর্ণকান্তিবোধহয় নিজের অজান্তেই গৌরীপ্রসন্নের ভিতরের সংবেদনশীল মনটাকে আঘাত করে ফেলেছিলেন। গৌরীপ্রসন্নর ভিতরের যে মনটা নিজের সঙ্গে তুলনা করতে চাইত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু কবির সেই মর্যাদা বুদ্ধিজীবী মহল কোনও দিন দিত না তাঁকে। গৌরীপ্রসন্নর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একবারই। তখন কলেজে পড়ি। বাংলা গানের গীতিকাররা কেন কবির মর্যাদা পাবেন না এখানে? প্রশ্নটা শুনে গৌরীপ্রসন্ন বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন তাঁর রামগড়ের বাড়িতে। বেশ উৎসাহ নিয়ে, লুঙ্গিটাকে ভাঁজ করে বসে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের এটাই হল আশ্চর্য দিক।"

গৌরীপ্রসন্ন যতই রাহুল-আশাকে সুপার হিট গান দিন, তিনি তখন মান্না দে'র গান লিখতে পারছেন না। মান্নার ছায়াছবির গানে গৌরীর লেখা পুলকের থেকে বেশি। কিন্তু পুজোর গানে তখন একচেটিয়া লিখে যাচ্ছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। মান্না তখন বাংলা গানের এক নম্বর পুরুষ কণ্ঠ।

সেই গৌরীপ্রসন্ন যখন নচিকেতা ঘোষের ছেলের কাছে বিদ্রুপের সুরে কথাটা শুনলেন, প্রথম কী কথা বলেছিলেন জানেন?

"লিখে কী হবে? তোমার কাকা কি আর গাইবেন আমার কথায়?"

সুপর্ণ তখন তিনটে বছর কাজ করছেন মান্না দে'র সঙ্গে। তিনটে রেকর্ডই সুপার সুপার হিট। 'ছোট বোন' করার সময় তিনি কলেজে পড়েন। এখনকার দিন থাকলে যে কী প্রচার পেতেন তিনি, কল্পনা করাই যায় না।

'ছোটবোন'- এর পর 'সারাজীবনের গান'। সাতটা গানই কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার মজিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার বাইরে, ভারতের বাইরে। তার পরে ফুটবল নিয়ে গান- সেটাও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

গৌরীকে দিয়ে তিনিই লিখিয়ে নেন 'কফি হাউজ'। এক কথায় মান্না রাজি হয়ে গিয়েছিলেন রেকর্ড করতে। এবং তাঁর মন্তব্য ছিল, " গৌরীবাবুর পক্ষেই সম্ভব এ গান লেখা।"

'সেই সাতজন নেই...' কফি হাউসের শেষ তিনটে লাইন গৌরীপ্রসন্ন লিখেছিলেন গিসারেটের প্যাকেটের পেছনে। হাওড়া স্টেমনে। ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে তিনি যাচ্ছিলেন চেন্নাই। চেনা একজনের হাত দিয়ে শেষ লাইন পাঠিয়ে দেন সুপর্ণকান্তিকে। সুপণকান্তির প্রসঙ্গ মান্নাদে'র গানের আলোচনায় আলাদা পরিচ্ছেদ দাবি করে। মান্না দে'র ছায়াছবির গানে নচিকেতা ঘোষের ভূমিকা যতটা, আধুনিক গানে তাঁর ছেলের ভূমিকা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

১) মান্নার আধুনিক গানে মান্না বাদে সবচেয়ে বেশি সুর দিয়েছেন সুপর্ণ। ৪৩টি গান অবিশ্বাস্য।
২) মান্নার গানে পরের পর্বে যে 'থিম' ক্যাসেটগুলো ট্রেডমার্ক হয়ে ওঠে, তার সূত্রপাত হয়েছিল সুপর্ণর হাতেই। 'সারা জীবনের গান' তো কিংবদন্তি হয়ে ওঠে বাজারে আসার কিছু দিনের ভিতরেই। পাশাপাশি 'পুনোনো কলকাতা' নিয়ে গানগুলো বৈচিত্রের বিচারে অনন্য। 'আমি দেখেছি' গানটাকে জীবনমুখী বলেছিলেন অনেকে।
৩) প্রেমের বাইরের অনেক গান মান্নাকে দিয়ে গাইয়ে মান্নাকে বৈচিত্রের সাম্রাজ্যের অনেকটা জমি উদ্ধার করে দেন সুরের এই জায়গিরদার।
৪) জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু মান্না দে ও তাঁর ছোটমেয়ে সুমিতাকে দিয়ে 'বাবা মেয়ের গান' করিয়েছিলেন সূপর্ণ। মান্নাকে পরে বহুবার আক্ষেপ করতে শুনেছি, "গানগুলো এত ভাল হল, প্রচারের দোষে মার খেয়ে গেল ক্যাসেটটা।" জামাই জ্ঞানরঞ্জন দেবের প্যারামাউন্ট ক্যাসেট কোম্পানি থেকে বেরিয়েছিল গানগুলো। মান্না দে পরে এইচ এম ভি-র সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, ওরা বাণিজ্যের ব্যাপরটা দেখতে পারেন কি না। যে কোনও কারণেই হোক, ব্যাপারটা এগোয়নি।
৫) মান্নার গানের সুরে পশ্চিমী প্রভাব আরও পাকাপোক্তভাবে গেঁথে দেন সুপর্ণ। রাহুল দেবের অন্ধ ভক্ত সুপর্ণ নিজে খুব ছোট বয়স থেকে নচিকেতাবাবুর টিমে কাজ শুরু করেছিলেন।

সুপর্ণ-মান্না জুটির তালিকা এ বার দেওয়া যাক। মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়, এখানে প্রেমের গানের থেকে অপ্রেমের গানই বেশি। প্রেমের গান খুব কম।

মার স্নেহ কাকে বলে জানি না ১৯৭৮

মা, মা গো মা ১৯৮০

আমি রাজি রাখো বাজি ১৯৮০

এসো যৌবন এসো হে ১৯৮০

তুমি আর আমি আরন ১৯৮০

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ১৯৮০

আমায় চিনতে কেন পারছ না মা ১৯৮০

খেলা ফুটবল খেলা ১৯৮১

কফি হাউসের সেই আড্ডা ১৯৮৩

যদি প্রশ্ন করি সবচেয়ে মিষ্টি বলো কী ১৯৮৬

অনেক কথা বলেও তবু ১৯৮৬

আমি সারা রাত শুধু যে কেঁদেছি ১৯৮৬

অনেক কথা বলেও তবু ১৯৮৬

সোনালি রং মেখে ১৯৮৬

আমার চোখে বর্ষা ১৯৮৬

এই আছি বেশ ১৯৮৭

আমি হারিয়েছি মোর ছোট্টবেলা ১৯৮৭

এই তো আকাশ বেশ ছিল ১৯৮৭

এই সেই ঘর ১৯৮৭

দশ বছরের বংশী ১৯৯০

এক দিন গাড়ি চালাতে চালাতে ১৯৯০

বাবা-মেয়ের গান ১৯৯৫

স্বর্গের পারিজাত আকাশে থাকে ১৯৯৫

আমার খুকু ছোট্ট যখন ১৯৯৫

চলো যাই সেখানে ১৯৯৫

চলো বাবা ঘুরে আসি ১৯৯৫

বাবা মনে আছে ১৯৯৫

এই পিয়ানো এ যে আমার ১৯৯৫

কেউ যে শুধু বাবা বলে ১৯৯৫

শুধু আমি কেন বলুক সবাই ১৯৯৫

লাইট ট্রেন ১৯৯৬

চোঙাওয়ালা কলের সে গান ১৯৯৬

প্রথম রেডিও এল বাড়িতে ১৯৯৬

সবুজ রঙের ট্রাম ১৯৯৬

যখন কলেজে এলাম ১৯৯৬

ছোটা হওয়া দাদার জামা ১৯৯৬

দিদির বাড়ি কলকাতার খুব কাছে ১৯৯৬

আমি দেখেছি ১৯৯৬

ঝিম ধরা নিম গাছ ২০০০

নেই ঘুম নেই চোখে ২০০০

ভালবাসা এক বিপন্ন দাবি ২০০০

সাগর গভীর হতে পারে ২০০০

স্বপ্নের কফি হাউজ ২০০২

এত বেশি বয়সে প্রেমের গান না গেয়ে, অন্য রকম গান গাইছেন কেন? এ প্রশ্নটা পরের দিকে বারবার শুনেছেন মান্না। এবং খুব একটা খুশি হননি। পরিচিত গীতিকাররা দু'ধরনের তান তাঁকে দিয়ে দেখেছেন প্রেমের গানের লেখা দেখেই বেশি উচ্ছ্বসিত মান্না। "খুব ভালো লিখেছেন তো। দারুণ"। প্রেমের গানের কথা দেখেই তাঁকে বলে দিয়েছেন মান্না। প্রেমের গানে প্রেমের গানের সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব থাকবেই।

কিন্তু কফি হাউস? ছোট বোন? নীলাম-ঘর? ফুটবল খেলা? মুচির ছেলে বংশী? মায়ের মন্দির? পাখিদের মতো রোদ্দুর? চার দেওয়াল?

যতদিন বাংলা গান শুনবেন বাঙালি, এই গানগুলোও তত দিন থেকে যাবে ভেতরের ঘরের গানের তাকে। সিডিতে। হৃদয়ে।

[উৎস: রূপায়ণ ভট্টাচার্য, হৃদয়ে লেখো নাম মান্না, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০]

সংযুক্তি ৯

evsjv Pjw”P‡Î MxwZKvi †MŠixcmb

Z_¨msMÖnK -kPx‘jvj ‘vk

QvqvQwe	miKvi	mn-MxwZKvi
১. পূর্বরাগ (২০/০৬/৪৭)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল/সুখময়/ভট্টাচার্য/অমিয় বাগচি
২. প্রিয়তমা ২১/৫/৪৮	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	.....
৩. অরক্ষণীয়া (২৫/৬/৪৮)	জ্ঞান প্রকাশ	......
৪. পদ্মা ও প্রমত্তা নদী (৩/১২/৪৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	নারায়ণ, তড়িৎ ঘোষ
৫. স্বামী (২৫/৯/৪৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	......
৬. সমর (৬/১০/৫০)	শচীনদেব বর্মণ	সজনীকান্ত, মোহিনী চৌধুরী, ব্রতীন ঠাকুর
৭. জিঘাংসা (২০/৪/৫১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	......
৮. রাজমোহনের বৌ (১৫/৬/৫১)	দেবেশ	দেবেশ
৯. প্রতিধ্বনি (২১/৯/৫১)	আশুতোষ চ্যাটার্জি	সন্তোষ চ্যাটার্জি. মানব রায়, শান্তি ভট্টাচার্য
১০. নতুন পাঠশাল (২৫,৭,৫২)	বীরেন ভট্টাচার্য/অপরেশ	গোপাল ভৌমিক, সমীর ঘোষ
১১. শুভদা (৫/১২/৫২)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	......
১২. মায়াকানন (১৭/১/৫৩)	অনিল ভট্টাচার্য	....
১৩. বৌদির বোন (৩/৪/৫৩)	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত
১৪. হরিলক্ষ্মী (২৯/৫/৫৩)	শৈলেশ দত্তগুপ্ত	......
১৫. বনহংসী (১২/৭/৫৩)	পঙ্কজ মল্লিক	......
১৬. নিস্কৃতি (২/১০/৫৩)	রামচন্দ্র পাল	....
১৭. শুভযাত্রা (৬/৩/৫৪)	সত্যজিৎ	......

১৮. অগ্নিপরীক্ষা (৩/৯/৫৪)	অনপম	....
১৯. যদুভট্ট (৩/১২/৫৪)	জ্ঞান প্রকাশ	রবীন্দ্রনাথ, যদুভট্ট
২০. বলয় গ্রাস (১৭/১২/৫৪)	রাজেন সরকার	......
২১. নিষিদ্ধ ফল (১৪/১/৫৫)	নচিকেতা ঘোষ	......
২২. অনুপমা (১৮/২/৫৫)	অনপম	.....
২৩. দত্তক (৮/৩/৫৫)	মানবেন্দ্র	......
২৪. সাজঘর (১১/৩/৫৫)	সত্যজিৎ	রবীন্দ্রনাথ
২৫. ছোট বৌ (২৯.৪.৫৫)	কালীপদ সেন	.....
২৬. পথের শেষে (১৭/৬/৫৫)	নচিকেতা ঘোষ	.....
২৭. ঝড়ের পরে (২৪/৬/৫৫)	নচিকেতা ঘোষ	.....
২৮. বিধিলিপি (১/৭/৫৫)	কালীপদ সেন	পুলক, প্রণব বিজয় গুপ্ত
২৯. জয় মা কালী বোর্ডিং(৮/৭/৫৫)	শ্যামল মিত্র	.....
৩০. উপহার (১২/৮/৫৫)	কালীপদ সেন	......
৩১. গোধুলি (২/৯/৫৫)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	......
৩২. দেবী মালনী (১৬/৯/৫৫)	অনুপম	প্রণব
৩৩. ভালোবাসা (৬/১০/৫৫)	নচিকেতা ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ
৩৪. রাতভোর (২১/১০/৫৫)	সলিল	.....
৩৫. পরেশ (২১/১০/৫৫)	অনুপম	শিশির সেন
৩৬. দুজনায় (১১/১১/৫৫)	অনিল বিশ্বাস	.....
৩৭. সবার উপরে(১/১২/৫৫)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	.....
৩৮. কালিন্দী (১৬/১২/৫৫)	রবি রায়চৌধুরি	......
৩৯. অর্ধাঙ্গিনী (২৩/১২/৫৫)	নচিকেতা ঘোষ	......
৪০. ভোলা মাষ্টার (২৬/১/৫৬)	কালীপদ সেন	প্রণব

৪১. সাগরিকা (১/২/৫৬)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	.....
৪২. কীর্তিগড় (১০/২/৫৬)	অনুপম	শান্তি ঋট্টাচার্য, নার্জিস সিকন্দর পুরী
৪৩. একটি রাত (১১/৫/৫৬)	অনুপম	.....
৪৪. অসমাপ্ত	অনুপম, নচিকেতা প্রভৃতি ভজন	শ্যামল, হরিচরণ, হীরেণ, পুলক, বিধায়ক
৪৫. শ্যামলী (১৫/৬/৫৬)	কালীপদ	....
৪৬. ত্রিযামা (২৮/৬/৫৬)	নচিকেতা	.....
৪৭. ছায়াসঙ্গিনী (৭/৯/৫৬)	কালীপদ, বীরেন রায়	.....
৪৮. সূর্যমুখী (৭/৯/৫৬)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	.....
৪৯. পুত্রবধু (৫/১০/৫৬)	রাজেন সরকার	.....
৫০. সিঁথির সিঁদুর (৩০/১১/৫৬)	কালীপদ	.....
৫১. ধুলার ধরণী (৩০.১১.৫৬)	মানবেন্দ্র	......
৫২. আমার বৌ (১৪/১২/৫৬)	সুশান্ত/বিনয়	সন্তোষ সেনগুপ্ত
৫৩. নবজন্ম (২৮/১২/৫৬)	নচিকেতা	.....
৫৪. তাপসী (১৫/৪/৫৭)	নচিকেতা	.....
৫৫. আদর্শ হিন্দু হোটেল (৩/৫/৫৭)	মানবেন্দ্র	.....
৫৬. পৃথিবী আমারে চায় (৩/৫/৫৭)	নচিকেতা	বিধায়ক/বিমল/প্রণব
৫৭. নতুন প্রভাত (৭/৬/৫৭)	নচিকেতা	.....
৫৮. কাঁচামিঠা (১২/৭/৫৭)	রাজেন	.....
৫৯. বসন্ত বাহার (৯/৮/৫৭)	জ্ঞানপ্রকাশ	জ্ঞানপ্রকাশ শ্যামল গুপ্ত, বড়ে গোলাপ
৬০. হারানো সুর (৬/৯/৫৭)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	.....
৬১. মাধবীর জন্য (৮/১১/৫৭)	অনুপম	.....
৬২. চন্দ্রনাথ (১৫/১১/৫৭)	রবীন	

৬৩. দাতা কমর্ণ (২৯/১১/৫৭)	রাজেন	……..
৬৪. পথে হলে দেরী (৫/১২/৫৭) রবীন		…..
৬৫. জীবনতৃজ্ঞা (২৫/১২/৫৭)	ভূপেন	…….
৬৬. যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (২৩/১/৫৮)	শ্যামল	হীরেন/আনন্দ চক্রবর্তী
৬৭. প্রিয় (১৪/২/৫৮)	রাজেন	….
৬৮. বন্ধু (২৮/২/৫৮)	নচিকেতা	……
৬৯. মানময়ী গার্লস স্কুল (১৪/৩/৫৮)	রাজেন	………
৭০. ডেলি প্যাসেঞ্জার (১৬/৫/৫৮)	শ্যামল	…….
৭১. ভানু পেল লটারি (৩০/৫/৫৮)	নচিকেতা	…….
৭২. লুকোচুরি (২৭.৬.৫৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ
৭৩. স্বর্গমত্য (৪/৭/৫৮)	কালীপদ	………
৭৪. জোনাকীর আলো (২৫/৭/৫৮)	ভূপেন/নচিকেতা	পূর্ণদাস
৭৫. শিকার (২৫/৯/৫৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	………
৭৬. পুরীর মন্দির (১০/১০/৫৮)	কালীপদ	………
৭৭. ইন্দ্রানী (১০/১০৮/৫৮)	নচিকেতা	…….
৭৮. যৌতুক (১৪/১১/৫৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	………
৭৯. সূর্যতোরণ (২১/১১/৫৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	…….
৮০. রাজধানী থেকে (১৯/১২/৫৮)	নচিকেতা	…….
৮১. জন্মান্তর (২/১/৫৯)	সরোজ কুশারী	শ্যামল গুপ্ত
৮২. মরুতীর্থ হিংলাজ (১২/২/৫৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	…….
৮৩. নীল আকাশের নীচে (২০/২/৫৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	…….
৮৪. চাওয়া পাওয়া (২৭/২/৫৯)	নচিকেতা	…….
৮৫. শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহপ্রভু(২৭/৩/৫৯)	রথীন ঘোষ	সত্যানন্দ মহারাজ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বেষ্ণব

		পদাবলী
৮৬. দীপ জ্বেলে যাই (১/৫/৫৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
৮৭. গলি থেকে রাজ পথ (১৭/৭/৫৯)	সুধীন	সুবীর হাজরা, নকশ
৮৮. খেলা ঘর (৪/৯/৫৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত
৮৯. সোনার হরিণ (৯/১০/৫৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
৯০. অবাক পৃথিবী (৬/১১/৫৯)	অমল মুখোপাধ্যায়	পুলক
৯১. পার্সোন্যাল এ্যাসিস্টেন্ট (২৭/১১/৫৯)	নচিকেতা	....
৯২. কুইক (২৩/১/৬০)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শৈলেন রায়
৯৩. উত্তর মেঘ (১০৬/৬০)	রবীন	....
৯৪. ক্ষুধা (১০/৬/৬০)	নচিকেতা	বিধায়ক
৯৫. ইন্দধনু (১০/৬/৬০)	রবীন	....
৯৬. চুপিচুপি আসে (২৮/৬/৬০)	নচিকেতা	....
৯৭. কোন একদিন (১২/৮/৬০)	সরোজ কুমারী	....
৯৮. হসপিটাল(১৬/৯/৬০)	অমল মুখোপাধ্যায়	....
৯৯. স্মৃতিটুকু থাক (২৩/৯/৬০)	রবীন	শিবদাস
১০০. শহরের ইতিকথা(২৩/৯/৬০)	রবীন	....
১০১. শেষ পর্যন্ত (১৪/১০/৬০)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১০২. বিয়ের খাতা (২/১২/৬০)	নচিকেতা	....
১০৩. শুন বরনারী (৯/১২/৬০)	রবীন	....
১০৪. অপরাধ (২৩/১২/৬০)	বিভূতিভূষণ	....
১০৫. কেরীসাহেবের মুন্সী (২৭/১/৬১)	রবীন	....
১০৬. সাথীহারা (২/৩/৬১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১০৭. মিঃ এন্ড মিসেস চৌধুরী (২৪/৩/৬১)	রথীন ঘোষ	....

১০৮. অগ্নিসংস্কার (১৪/৪/৬১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১০৯. স্বরলিপি (১৪/৪/৬১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১১০. মধ্যরাতের তারা (২১/৪/৬১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১১১. পঙ্কতিলক (১৬/৬/৬১)	সুধীন	সুধরি, পবিত্র
১১২. কঠিন মায়া (২৭/৭/৬১)	কালীপদ	....
১১৩. আশায় বাঁধিনু ঘর (২৫/৮/৬১)	ভি বালসারা	....
১১৪. সপ্তপদী (২০/১০/৬১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১১৫. দুই ভাই (২০/১০/	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১১৬. বিপাশা (২৬/১/৬১)	রবীন	....
১১৭. সূর্যস্নান (১৬/২/৬১)	ভি বালসারা	....
১১৮. সঞ্চরিনী (২৩/২/৬২)	কালীপদ	....
১১৯. অতল জলের আহক্ষান (২৫/৫/৬২)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১২০. আগুন (১৫/৬/৬২)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১২১. বন্ধন (২০/৭/৬২)	রাজেন	....
১২২. কাজল (১০/৮/৬২)	রবীন	....
১২৩. দাদাঠাকুর (৯/১১/৬২)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	নজরুল/শরৎ পণ্ডিত
১২৪. নবদিগন্ত (২৯/১১/৬২)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১২৫. ধূপছায়া (১৪/১২/৬২)	অমল	....
১২৬. একটুকরো আগুন (১১/১/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১২৭. দুই বাড়ি (৮/২/৬৩)	কালীপদ	....
১২৮. বর্ণচোরা (১৫/২/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১২৯. হাইহিল (৩/৫/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....

১৩০. ভ্রান্তি বিলাস	শ্যামল মিত্র	পুলক, বিধায়ক
১৩১. পলাকত (২১/৬/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
১৩২. ত্রিধারা (৯/৮/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৩৩. হাসি শুধু হাসি নয় (৬/৯/৬৩)	শ্যামল মিত্র	....
১৩৪. দেয়া নেয়া (২৪/১০/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৩৫. বাদশা (২৯/১১/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৩৬. সপ্তর্ষি (৭/২/৬৩)	শ্যামল মিত্র	....
১৩৭. বিভাস (১৪/২/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ
১৩৮. স্বর্গ হতে বিদায় (১৩/৩/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৩৯. প্রভাতের রঙ (৩/৭/৬৩)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৪০. কাঁচাতার (৭/৮/৬৪)	নচিকেতা	....
১৪১. নতুন তীর্থ (১৪/৮/৬৪)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	.....
১৪২. মহাতীর্থ কালীঘাট (৯/১০/৬৪)	রথীন ঘোষ	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৪৩. তৃষ্ণা (৮/১/৬৪)	শ্যামল মিত্র	....
১৪৪. আলোর পিপাসা (১৫/১/৬৫)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কাইফি
১৪৫. মহালগ্ন (২৯/১/৬৫)	কালীপদ	......
১৪৬. অন্তরাল (৫/৩/৬৫)	সুধান	পুলক
১৪৭. রাজকন্যা (২/৪/৬৫)	শ্যামল মিত্র	......
১৪৮. ভারতের সাধক (১৪/৫/৬৫)	অনিল	শ্যামল গুপ্ত
১৪৯. সূর্যতপাস (১/১০/৬৫)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৫০. তাপসী (৩/১২/৬৫)	গোপেন	....
১৫১. সুশান্ত শা (২১/২/৬৬)	সুধীন	....
১৫২. রাজদ্রোহী (২৫/৩/৬৬)	আলি আকবর খা	....

১৫৩. শুধু একটি বছর (১/৪/৬৬)	রবীন	....
১৫৪. হারানো প্রেম (১২/৭/৬৬)	রবীন	....
১৫৫. লবকুশ (২৫/১১/৬৬)	শ্রীকান্ত	গোপাল দাশগুপ্ত
১৫৬. নায়িকা সংবাদ (১৭/২/৬৭)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মোহিনী
১৫৭. বালিকা বধু (১/৬/৬৭)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন, দ্বিজেন্দ্র, মনমোহন, হেমচন্দ্র
১৫৮. খেয়া (২৭-৮/৭/৬৭	শ্যামল মিত্র	....
১৫৯. দুষ্টু প্রজাপতি (২৯/৯/৬৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৬০. এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি (৬/১০/৬৭)	অনিল বাগচি	প্রণব
১৬১. পথে হলো দেখা (২/২/৬৮)	বি বালসারা	মন্টু সরকার
১৬২. ছোট্ট জিজ্ঞাসা (৯/২/৬৮)	নচিকেতা	....
১৬৩. পরিশোধ (২৩/৩/৬৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৬৪. রক্তলেখা (৯/৮/৬৮)	নচিকেতা	....
১৬৫. সবরমতী (১/৬৯)	গোপেন	....
১৬৬. চিরদিনের (২৪/১/৬৯)	নচিকেতা	....
১৬৭. বিবাহ বিভ্রাট (১৪/২/৬৯)	শ্যামল মিত্র	....
১৬৮. দুরন্ত চড়াই (১৪/২/৬৯)	শ্যামল মিত্র	রবীন্দ্রনাথ, বিমল ভৌমিক
১৬৯. শেষ থেকো শুরু (২৮/৩/৬৯)	অনিল, নচিকেতা	শ্যামল গুপ্ত
১৭০. চেনা-অচেনা (১১/৭/৬৯)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
১৭১. সমান্তরাল (৯/১/৭০)	শ্যামল মিত্র	....
১৭২. পদ্মাগোপাল (২/৭/৭০)	শ্যামল মিত্র	....
১৭৩. রাজকুমারী (২/১০/৭০)	রাহুল	....
১৭৪. নিশিপদ্ম (২৩/১০/৭০)	নচিকেতা	অরবিন্দ মুখার্জী, সত্য ব্যানার্জি, চণ্ডীদাস বসু
১৭৫. রূপসী (১০/১২/৭০)	অনিল	সুনীল বরণ

১৭৬. স্বর্ণখের প্রাঙ্গণে (২৫/১২/৭০)	শৈলেশ রায়	শিবদাস
১৭৭. প্রতিবাদ (৪/২/৭১)	শ্যামল মিত্র	....
১৭৮. চৈতালী (১৯/৩/৭১)	শচীনদেব বর্মণ	আনন্দ কুদসী
১৭৯. কুহেলী (১৩/১/৭১)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ
১৮০. অন্য মাটি অন্য রঙ (২৭/৮/৭১)	হৃদয় কশারী	জগদীশ ওঝা, পুলক রাখাল সাহা
১৮১. খুঁজে বেড়াই (২৪/৯/৭২)	রবীন	রবীন্দ্রনাথ
১৮২. জীবন জিজ্ঞাসা (১৫/১০/৭১)	শ্যামল মিত্র	শ্যামলেশ ঘোষ
১৮৩. ফরিয়াদ (৫/১১/৭১)	নিচেকেতা	পুলক/প্রণব
১৮৪. সংসার (২৪/১২/৭১)	হেমন্ত	....
১৮৫. মা ও মাটি (২৫/২/৭২)	অনিল	....
১৮৬. অন্ধ প্রতীত (৭/৭/৭২)	শ্যামল মিত্র	....
১৮৭. ছায়াতীর (১৪/৭/৭২)	অীভজিৎ	....
১৮৮. স্ত্রী (১৮/৮/৭২)	নিচেকেতা	পুলক
১৮৯. নতুন দিনের আলো (৫/১/৭৩)	নিচেকেতা	....
১৯০. নকল কোশ (১৯/১/৭৩)	নিচেকেতা	....
১৯১. বনপলাশীর পদাবলী (৯/২/৭৩)	নিচেকেতা, শ্যামল,সতীনাথ, দ্বিজেন, অধীর	রবীন্দ্রনাথ, রুবি বাগচি
১৯২. শবরী (১৬/২/৭৩)	নচিকেতা	পুলক
১৯৩. কায়াহীনের কাহিনী (১৩/৪/৭৩)	মুকুর রায়	......
১৯৪. চিঠি (১৮/৫/৭৩)	শ্যামল মিত্র	....
১৯৫. আরণ্যক (৭/৬/৭৩)	কালীপদ	....
১৯৬. বিন্দুর ছেলে (২৪/৮/৭৩)	কালীপদ	....
১৯৭. শ্রীমান পৃথীরাজ (২৮/৯/৭৩)	হেমন্ত	রবীন্দ্রনাথ

১৯৮. অগ্নিভ্রমর (২৬/১০/৭৩)	নচিকেতা	....
১৯৯. ননীগোপালের বিয়ে (১৮/১২/৭৩)	নচিকেতা	....
২০০. শ্রবণ সন্ধ্যা (২/১/৭৪)	নচিকেতা	....
২০১. অসতী (১৯/৪/৭৪)	নচিকেতা	....
২০২. অমানুষ (১৮/১০/৭৪)	শ্যামল মিত্র	....
২০৩. সুজাতা (১৮/১০/৭৪)	নচিকেতা	....
২০৪. ঠগিনী (১৩/১২/৭৪)	হেমন্ত	....
২০৫. মৌচাক (১০/১/৭৫)	নচিকেতা	....
২০৬. ফুলু-ঠাকুর মা (৪/৪/৭৫)	শ্যামল মিত্র	....
২০৭. আমি সে ও সখা	শ্যামল মিত্র	....
২০৮. উমনো ঝুমনো (২৫/৭/৭৫)	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	অজিত গাঙ্গুলি
২০৯. নগর দর্পনে (২৭/৬/৭৫)	নচিকেতা	....
২১০. নতুন সূর্য (৩৫/৭/৭৫)	দিলীপ রায়	....
২১১. কাজল লতা (২৯/৮/৭৫)	নচিকেতা	রবীন্দ্রনাথ
২১২. প্রিয় বান্ধবী (৩/১০/৭৫)	নচিকেতা	....
২১৩. সন্ন্যাসী রাজা (৩/১০/৭৫)	নচিকেতা	....
২১৪. শঙ্খবিষ (২৬/৩/৭৬)	হেমন্ত	পুলক
২১৫. হোটেল স্নো-ফকস্ (১৬/৪/৭৬)	নচিকেতা	শ্যামল গুপ্ত ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য
২১৬. আনন্দ মেলা (২৪/৪/৭৬)	নচিকেতা	....
২১৭. মোমবাতি (১৮/৬/৭৬)	নচিকেতা	....
২১৮. সেই চোখ (৩০/৭/৭৬)	নচিকেতা	....
২১৯. নিধিরাম সর্দার (২৪/৯/৭৬)	নচিকেতা	....
২২০. বহ্নিশিখা (২৬/১১/৭৬)	হেমন্ত	....

২২১. চাঁদের কাছাকাছি (৩১/১২/৭৬)	রবীন	....
২২২. রাজবংশ (৭/১১/৭৭)	শ্যামল মিত্র	....
২২৩. নয়ন (১১/২/৭৭)	অজয় দাশ	....
২২৪. অসাধারণ (১৮/২/৭৭)	নচিকেতা	....
২২৫. অজস্র ধন্যবাদ (১/৪/৭৭)	শ্যামল মিত্র	....
২২৬. বাবা তারকনাথ (২৯/৭/৭৭)	নীতা সেন	....
২২৭. জাল সন্ন্যাসী (২৬/৮/৭৭)	শ্যামল মিত্র	....
২২৮. ছোট্ট নায়ক (১৬/৯/৭৭)	নীতা সেন	....
২২৯. মন্ত্রমুগ্ধ (১৪/১০/৭৭)	হেমন্ত	....
২৩০. আনন্দ আশ্রম (১৪/১০/৭৭)	শ্যামল মিত্র	....
২৩১. প্রতিমা (৯/১২/৭৭)	হেমন্ত	দীনবন্ধু মিত্র/তারাশঙ্কর
২৩২. প্রক্সি (১৬/১২/৭৭)	হেমন্ত	....
২৩৩. ময়রা (২৭/১/৭৮)	অনুপম মুখোপাধ্যায় শচীন গাঙ্গুলী	সত্যেন গাঙ্গুলি
২৩৪. বন্দী (১৪/৪/৭৮)	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী
২৩৫. প্রণয় পাশা (৯/৬/৭৮)	হেমন্ত	....
২৩৬. গোলাপ বৌ (২৭/৭/৭৮)	নীতা সেন	....
২৩৭. নিশান (৪/৮/৭৮)	শ্যামল মিত্র	....
২৩৮. ধনরাজ তমাং (২৯/৯/৭৮)	শ্যামল মিত্র	পুলক
২৩৯. ব্রজবুলি (১৯/১/৭৯)	নচিকেতা	....
২৪০. লাট্টু (২/২/৭৯)	হিমাংশু বিশ্বাস	অজিত গাঙ্গুলি
২৪১. কৃষ্ণসুদামা (১০/৮/৭৯)	নীতা সেন	....
২৪২. নন্দন (২/১১/৭৯)	নীতা সেন	....

২৪৩. সমাধান (৩০/১১/৭৯)	অধীর বাগচী	....
২৪৪. প্রিয়তমা (১৬/৫/৮০)	শ্যামল মিত্র	....
২৪৫. পাকাদেখা (১/৮/৮০)	হেমন্ত	....
২৪৬. শেষ বিচার (১/৮/৮০)	হেমন্ত	....
২৪৭. দুই পৃথিবী (২৭/৮/৮০)	আনন্দ শঙ্কক	....
২৪৮. সীতা (৩১/১০/৮০)	নীতা সেন	....
২৪৯. অনুসন্ধান (৩/৪/৮১)	রাহুল	....
২৫০. অবিচার (১৫/৫/৮১)	উষা খান্না	....
২৫১. খনা-বরাহ (২৯/৫/৮১)	শ্যামল মিত্র	....
২৫২. মা বিপত্তারিনী চণ্ডী (২৯/৫/৮১)	সঞ্চয় দাশগুপ্ত	রোহিনী, পুলিন আঢ্য
২৫৩. সূর্য সাক্ষী (৩/৭/৮১)	প্রবীর মজুমদার	দ্বিজেন্দ্র, সুনীলবরণ, হৃদয়েশ পাণ্ডে
২৫৪. সাহেব (২/১০/৮১)	অভিজিৎ	রবীন্দ্রনাথ
২৫৫. কলঙ্কিনী (২/১০/৮১)	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত
২৫৬. পাহাড়ি ফুল (২৫/১২/৮১)	নীতা সেন	....
২৫৭. স্বর্ণ মহল (১৬/১২/৮১)	অজয় দাশ	সমীর ঘোষ
২৫৮. প্রতীক্ষা (৩০/৪/৮২)	হেমন্ত মুখ্যোপাধ্যায়	....
২৫৯. রসময়ীর রসিকতা (৯/৭/৮২)	নীতা সেন	কমল শূর
২৬০. প্রেয়সী (৬/৮/৮২)	মান্না দে	....
২৬১. মমতা (১০/৯/৮২)	অজয় সেন	....
২৬২. সোনার বাঙলা (২২/১০/৮২)	নীতা সেন	....
২৬৩. প্রফুল্ল (২২/১০/৮২)	কালীপদ	পূরক, গিরীশ
২৬৪. অপরূপা (১৭/১২/৮২)	বাহুল	....
২৬৫. সংকল্প (১৭/১২/৮২)	অজয়	....

২৬৬. মাটির স্বর্গ(২২/১০/৮২)	শ্যামল মিত্র	জয়দেব, নজরুল
২৬৭. দুটিপাতা (১৩/৫/৮৩)	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	....
২৬৮. উৎসর্গ (১৭/৬/৮৩)	অমল	প্রবোধ
২৬৯. অগ্রদানী (২৪/৬/৮৩)	কালিপদ	সুবোধ মজুমদার, মধূসূদন
২৭০. সমাপ্তি (৫/৮/৮৩)	অজয়	....
২৭১. অর্পিতা (১৬/৯/৮৩)	রাজেন	দিলীপ সরকার, লক্ষ্মীকান্ত
২৭২. আগামীকাল (১৬/১২/৮৩)	লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল	....
২৭৩. প্রতিদান (২৩/১২/৮৪)	বাপী লাহিড়ি	....
২৭৪. সীমান্তরাগ (২৫/৫/৮৪)	নীতা সেন	....
২৭৫. শিলালিপি (১/৬/৮৪)	সুপর্ণ	পলাশ ব্যানর্জি
২৭৬. লালগোলাপ (১৫/৬/৮৪)	দিলীপ, দিলীপ	....
২৭৭. অভিষেক (৩/৮/৮৪)	নচিকেতা	....
২৭৮. রাশিফল (১৭/৮/৮৪)	মানস মুখোপাধ্যায়	....
২৭৯. তিনমূর্তি (২৮/৯/৮৪)	রাহুল	....
২৮০. সোনার সংসার (১/২/৮৫)	কমল গাঙ্গুলি	দেব সিংহ
২৮১. হুলুস্থুল (১৫/২/৮৫)	দিলীপ, দিলীপ	রবীন্দ্রনাথ
২৮২. অজান্তে (২২/২/৮৫)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অতুল/পদাবলী
২৮৩. ফুলদেবি (৫/৪/৮৫)	রবীন্দ্র জৈন	মুকুল দত্ত
২৮৪. অন্তরালে (২৬/৭/৮৫)	বাপী	অজয়
২৮৫. অনুরাগের ছোঁয়া (২৪/১/৮৬)	অজয়	....
২৮৬. লালমোহন (১৪/৩/৮৬)	অজয়	....
২৮৭. দুই অধ্যায় (১৮/৪/৮৬)	সৌমিত্র ব্যানার্জী	হীরেন বসু, মুকুল, অজয় বিশ্বাস
২৮৮. উত্তর লিপি (১৮/৭/৮৬)	দিলীপ, দিলীপ	....

২৮৯. আশির্বাদ (২২/৮/৮৬)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
২৯০. অভিশাপ (১০/১০/৮৬)	সমীর শীল	পুলক, শিবদাশ, ভবেশ
২৯১. ডাক্তার বৌ (১০/১০/৮৬)	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	....
২৯২. মধুময় (৭/১১/৮৬)	দিলীপ, দিলীপ	....
২৯৩. অমর কন্টক (৫/১২/৮৬)	অজয়	....
২৯৪. প্রেমবন্ধন (১৯/১২/৮৬)	কমল গাঙ্গুলি	শিবদাস
২৯৫. প্রতিকার (১৭/৪/৮৭)	বাপী	....
২৯৬. ন্যায় অধিকার (১০/৭/৮৭)	মৃণাল	....
২৯৭. দাবার চাল (৩০/১০/৮৭)	অসীমা	পুলক
২৯৮. কলঙ্কিনী নায়িকা (৫/২/৮৮)	তরুণ/রঞ্জিত	অতুলপ্রসাদ, বিভূতি, পুলক, সমীর
২৯৯. ছন্নছাড়া(১২/২/৮৮)	মৃণাল ব্যানার্জী	....
৩০০. অন্তরঙ্গ (১৮/৩/৮৮)	বাপী	....
৩০১. সুরের সাথী (৮/৭/৮৮)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	....
৩০২. জ্যোতি (১৪/১০/৮৮)	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত
৩০৩. নিশিবধু (১৯/৫/৮৯)	অজয়	সত্যেন গাঙ্গুলি
৩০৪. কলঙ্ক (১৬/২/৯০)	নীতা সেন	....
৩০৫. একাকী (২/৩/৯০)	শ্যামল মিত্র	....
৩০৬. ছোট্টুর প্রতিশোধ (৩০/১১/৯০)	দীপেন চ্যাটার্জী	স্বপন চক্রবর্তী
৩০৭. জঙ্গল পাহাড়ি (১৬/৮/৯১)	নীতা সেন	....
৩০৮. সাত নম্বর কয়েদি (৭/২/৫৩)	কালিপদ	....
৩০৯. কৃষ্ণার্জুন (২৬/৮/৮২)	কালিপদ	....

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি-১০-ক

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর গানের বাণী ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনে গবেষক গত ২০১১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় আলোচ্য গীতিকারদ্বয়ের পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট গবেষক, সুরকার, শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যা আলোকচিত্রে উপস্থাপন করা হলো :

কলকাতা রামগড়স্থ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের স্মৃতি ফলকের পাশে গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের কর্মকর্তাদের সাথে গবেষক

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বিষয়ক গবেষক শচীদুলাল দাশের সাথে বর্তমান গবেষক

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের চাচাতো ভাই শিলাদিত্য মজুদার ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে গবেষক

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বিখ্যাত "কফি হাউস" গানের সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ এর সাথে গবেষক

কলকাতায় গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যায়ন গ্রহণ

গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের সভাপতি প্রিয়তোষ স্বরস্বতী, সহ-সভাপতি দীপক সেনগুপ্ত ও সম্পাদক কমল চক্রবর্তীর সাথে গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি-১০-খ

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি, ছবিটি তাঁর পিতামহ জমিদার শিব গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বর্তমান গবেষক খান আসাদুজ্জামান

গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য কালজয়ী গানের সুরকার সুপর্ণ কান্তি ঘোষের সাথে গবেষক

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের আবক্ষ মূর্তি

উপরিউক্ত চেয়ার-টেবিলে বসে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তার জীবনের অসংখ্য গান রচনা করেছেন

গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের সম্পাদক কমল চক্রবর্তীর সাথে বর্তমান গবেষক

বর্তমান গবেষণা কর্মসংক্রান্ত অভিমত প্রদান করছেন বিশিষ্ট গৌরীপ্রসন্ন গবেষক শচীদুলাল দাশ

গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আলোচ্য গবেষণা সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে

সংযুক্তি-১১-ক

২০১১ সালে কলকাতায় গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকালে আলোচ্য অভিসন্দর্ভ সম্বন্ধে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষণাকর্ম সম্পর্কে তাঁদের কয়েকজনের মন্তব্য উল্লেখ্য করা হলো :

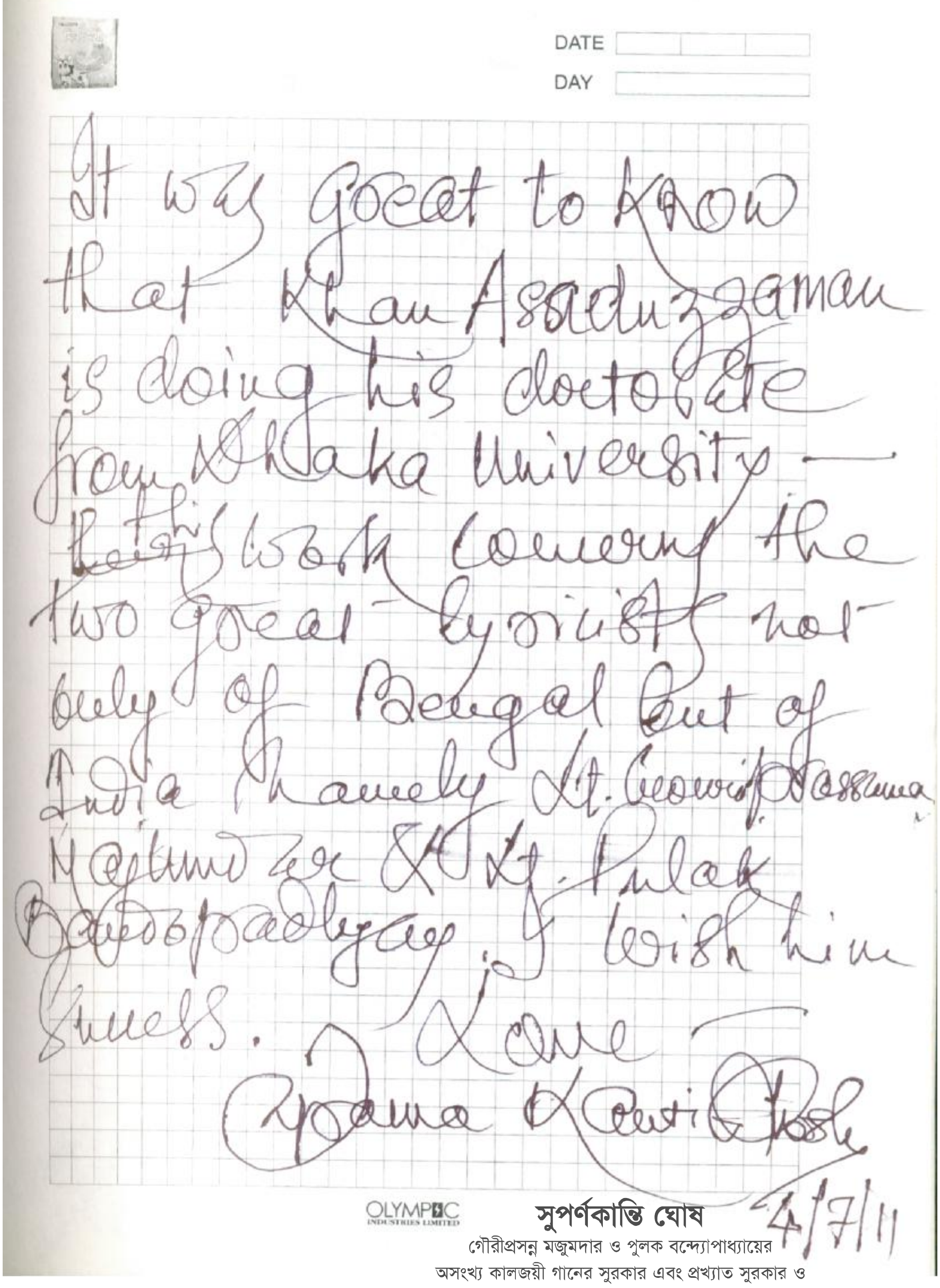
DATE
DAY

It was great to know that Khan Asaduzzaman is doing his doctorate from Dhaka University — his work covering the two great lyricists not only of Bengal but of India namely Lt. Gouriprasanna Majumder & Lt. Pulak Bandopadhyay. I wish him success.

Love
Suparna Kanti Ghosh
4/7/11

OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED

সুপর্ণকান্তি ঘোষ
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অসংখ্য কালজয়ী গানের সুরকার এবং প্রখ্যাত সুরকার ও
সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষের পুত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি-১১-খ

DATE
DAY

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে
নিয়ে অনেক দূরে বসে বাংলাদেশের
কিছু অনুরাগীবৃন্দ যে তথ্যমূলক কাজ
করছেন, তার জন্য [illegible] [illegible]
কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি ভাষা খুঁজে
পাই না।
ওঁরা সুস্থ থেকে, এই
কামনা করি।

শচীদুলাল দাশ
ফ্ল্যাট বি-৬
৮/১ ডা: সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা — ৭০০০১৪

OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED

শচীদুলাল দাশ
বিশিষ্ট সংগীত গবেষক,
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানের বাণী ও
শিল্পকর্ম যার গবেষণার প্রিয় বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি-১১-গ

DATE

DAY

It is a pleasant moment of my life to know that the people of Bangladesh has taken up a scheme through which the great lyricists of Bengali Songs - ~~Sree~~ Gowri Prasanna Majumdar and Sri Pulak Bandopadhay will once again come alive. My heartiest congratulations to Researcher Khan Asaduzzaman and his guides. Proff. Dr. Rafiqueullah Khan - Bengali Deptt and Professor Dr. Mridul Kanti Chakrabroty - ~~Bengali~~ Sangeet Deptt of Dacca University.

Being the youngest brother of Gowri Prasanna Majumdar (Bachuda) I wish them all success and shall be obliged to ~~make~~ any help if required from our family.

(Shiladitya Majumdar)

4/7/11

OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED

শিলাদিত্য মজুমদার

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের চাচাতো ভাই,
যিনি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অন্যতম ছায়া-সঙ্গী ও
বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। উল্লেখ্য যে গৌরীপ্রসন্নের গানের
বাণী সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বর্তমান গবেষককে বিশেষ
সহযোগিতা প্রদান করেন, যা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

†MŠixcmb gRg‘v‡ii wbewPZ Mvb msKjb

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

†MŠixcmb gRg‘v‡ii wbe©vwPZ Mvb msKjb

1

আমার জীবন যেন একটি খাতা
শেষ কটি যার পাতা নেই
হয়তো ছিল অনেক কিছুই
শেষ কটি সেই পাতাতেই।
মনের কলম তবু নাছোড়
আঁকবে কিছু স্মৃতির আঁচড়
মিথ্যে আশায় প্রলোভনে
আমার সে তো মাতাবেই।
সেই ছেঁড়া খাতার পাতাগুলো
ফিরে পেতাম যদি
হয়তো সাগর হত মরুর বুকে
হারানো এক নদী।
আঁধার হ'য়ে দীপের নীচে
ইচ্ছেটাকে বাঁচাই মিছে
ফুল কুড়িয়েও মালাটি মোর
সূঁচ সুতোতে গাঁথা নেই।

সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১)

2

আজো আকাশের পথ বাহি চাঁদ আসে
মোর ব্যথা গোধূলীর ছায়াতীরে।
ঝরা মাধবীর ম্ণঢান মালাখানি
শপথের স্মৃতি লয়ে গেল ছিঁড়ে

Dhaka University Institutional Repository

সুর যেন ভুলে গেছে ভাঙ্গা বাঁশী

প্রেম মোর কাঁদে আর আমি হাসি

নাহি জানি কেন তবু মনে আসে

মিলনের সেই রাতে ছিলে পাশে

প্রদীপের স্বপ্ন হল ঐ ভুল

নিভে যেতে চায় ধীরে ধীরে ॥

ভেঙ্গে কেন দিলে হায় সব খেলা

তুমি যেন রেখে গেছ অবহেলা

যতটুকু তব আজো আছে বাকি

তারি লাগি তোমারে যে কাছে ডাকি

এ হৃদয় কেঁদে কয় ভোল অভিমান

জেগে আছি ওগো তুমি এসো ফিরে ॥

সুর ও শিল্পী: শচীনদেব বর্মণ। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৪)

3

বাঁশী শুনে আর কাজ নাই

সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী ॥

সে যে দিনদুপুরে চুরি করে

রাত্তিরে তো কথা নাই ॥

ও শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু

বাঁশী পোড়ায় প্রাণ গরলে

ঘুচাব তার নষ্টামী আজ

আমি সঁপিব তারে অনলে।

ও বাঁশেতে ঘুণ ধরে যদি

কেন বাঁশীতে ঘুণ ধরে না

কত জনাই মরে তবু

পোড়া বাঁশী কেন মরে না।

সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মণ। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৬)

Dhaka University Institutional Repository

4

ফুলের কানে ভ্রমর আনে

স্বপ্নভরা সম্ভাষণ

এই কি তবে বসন্তেরই নিমন্ত্রণ?

দখিণ হাওয়া এল ঐ বন্ধু হয়ে তাই কি আজ

কণ্ঠ আমার জড়িয়ে ধরে

জানায় শুধু আলিঙ্গন।

ঐ যে বনফুলের বন দোলে

তাই কি আমার এ মন দোলে,

পথিক-পাখী যায় উড়ে যায়

কোন সে দূরে যায় গো যায়,

মুগ্ধ প্রাণে যায় এঁকে

পাখায় ছায়ার আলিম্পন

আজ আমার কণ্ঠ তরে সুর এলো

আর কাছে আরো আপন হয়ে দূর এলো,

নতুন করে তাই যেন গো আজ

নিজেরে পাই গো পাই

প্রাণে আমার পরশ ছোঁয়ায়

কিছু পাওয়ার শুভক্ষণ ॥

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সুর : অনুপম ঘটক। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৪)

5

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু

আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়,

হৃদয় ভরাতে চায়।

মিতা মোর কাকলী কুহু

সুর শুধু যে ঝরাতে চায়,

আবেশ ছড়াতে চায়

প্রাণে মোর।

মৌমাছিদের মিতালি

পাখায় বাজায় গীতালি,

মীড়-দোলানো সুরে আমার

কণ্ঠে মালা পরাতে চায়।

বাতাস হোল খেয়ালী

শোনায় কি গান হেঁয়ালী

কে জানে গো তার বাঁশী আজ

কি সুর প্রাণে ধরাতে চায়।

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্রের গান। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুরঃ অনুপম ঘটক।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২২)

6

আমাদের গান শুনেছে রাতের ফুল

মোদের মিলন দেখেছে সন্ধ্যাতারা

মোর দেয়া তব কণ্ঠের মালা হতে

সৌরভ লুটে বাতাস আপন হারা ॥

আমায় তুমি যে জানালে মনের সাধ

দূর হতে ঐ শুনে গেল আধো চাঁদ

সবাই যেন গো জেনে গেছে মনে মনে

কেহ নাই মোর কিছু নাই তুমি ছাড়া ॥

তোমার আঁকিতে স্বপ্ন কুড়াতে চেয়ে

রাতের পাখীরা উঠেছে যে গান গেয়ে ॥

তোমার আমার এইটুকু পরিচয়

এরই মাঝে যেন কত কিছু জেগে রয়

যেথায় হারায় ভীরু অধরের ভাষা

মনের বাঁশরী সেথায় তোলে যে সাড়া ॥

শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুরঃ অনিল বাগচী। (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৩২)

7

আমি যামিনী তুমি শশী হে

ভাবিতেছ গগণ মাঝে

মম সরসীতে তব উজল প্রবা

বিস্মিত রাঙা লাজে।

তোমায় হেরিগো স্বপনে শয়নে তাম্বুল রাঙা বয়ানে

মরি অপরূপ রূপ মাধুরী বসন্ত সব বিরাজে ॥

তুমি যে শিশির বিন্দু

মম কুমুদির বক্ষে

না হেরিয়ে ওগো তোমারে

তমসা ঘনায়ে চক্ষে

তুমি অগণিত তারা গগনে প্রাণবায়ু মমজীবনে

তব নামে মম প্রেম মুরলী পরানের মাঝে বাজে ॥

ছবিঃ অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী। সুরঃ অনিল বাগচী । শিল্পীঃ মান্না দে

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৩৩)

8

হে মাধব সুন্দর এসো নব অভিসারে

বিবস রাধার তনু তোমারই বিরহ ভারে ॥

অধরে তোমার প্রভু আজ কেন বাঁশী নাই

রাধার অধরে যেন আজ তাই হাসি নাই

শ্যাম সোহাগিনী চির অনুরাগিনী

ভাসে রাধা আঁখি ধারে ॥

বিবস ভুজগ বিষে নীল তার তনুমন

কাঁদিয়ে তোমার প্রভু ডাকে রাধা অনুখন

তব পরশনে জুড়াও সকল জ্বালা

কাঁদায়ো না আর প্রভু তারে ॥

'পুরীর মন্দির' ছায়াচিত্রের গান। শিল্পী: সতীনাথ মুখোপাধ্যায় । সুর: কালিপদ সেন ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৩৭)

9

আকাশ আমায় ডাক দিয়েছে

নতুন নিমন্ত্রণে—

বাতাস আমায় জড়িয়ে ধরে

প্রাণের আলিঙ্গণে।

ঘর ছেড়ে আজ তাই

আমি বাইরে পেলাম ঠাঁই

আমার মুগ্ধ হৃদয় কণ্ঠ মিলায়

অলির গুঞ্জরণে।

আজ প্রাণের খুশি

গানের খেয়ার পাল তোলে—

মোর সপ্ত সুরের সপ্তডিঙ্গা

তাই দোলে।

আমার মুক্তিভরা দিন

আজ তাই যে ভাবনাহীন

Dhaka University Institutional Repository

রাখাল ছেলে মন কেড়ে নেয়

বাঁশীর সম্ভাষণে।

।। শিল্পী: দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ।। সুর: কালিপদ সেন।। 'কঠিন মায়া' কথাচিত্র।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৩৯)

10

শুক বলে সারি

আমার রাধিকা জল নিতে ঘাটে যায়

আহা বাম চোখ তার সমানে নাচিতে

ইতি উতি ফিরে চায় ॥

সারি বলে শুক

কেন তোর রাধা চঞ্চল হল আজি?

তার শ্রবণে যে সুধা

চলিছে আমার শ্যামের সুরলী বাজি

সেই পিরীতির সুধা স্বপ্ন জাগায়

রাধার নয়ন ছায় ॥

শুক বলে সারি

জানিয়ে তোর শ্যামের মুরলী বাজে

মোর রাধার কপাল লাল হয়ে ওঠে

কি জানি সে কোন লাজে ॥

সারি বলে শুক

যদি না বাজিত আমার শ্যামের বাঁশী

তোর রাধার অধরে খেলিতো কি তবে

বিজলী জড়ানো হাসি?

বাজিত কি তবে মধুর নূপুর

মাধুব-বধর পায় ॥

।। শিল্পী: নির্মলা মিশ্র ও মৃণাল চক্রবর্তী।। সুর: কালিপদ সেন।। 'কঠিন মায়া' কথাচিত্র।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৪০)

11

এই সাঁঝ-ঝরা লগনে আজ

কে ডাকে আমারে,

আমার পথে আশার প্রদীপ

কে সে জ্বালাতে আশার প্রদীপ

কে সে জ্বালাতে চায়।

আকাশেরই তারায় তারায়

আমার পায়ে লাগবে ধুলো

তাই ভেবে কি বকুলগুলো,

পথের পাশে এমন করে ঝরে আছে হায় ॥

অভিসারের পথ আমায়

যেথায় নিয়ে যাবে,

অনেক খোঁজার শেষে তোমার

ঠিকানা কি পাবে।

'পথে হল দেরী' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৪৬)

12

সেদিন যখন প্রথম বৃষ্টি এলো

তুমি বাতায়নে ছিলে একা

মনে কি পড়ে

ভিজে হাওয়া এসে এলো খোঁপা নিয়ে

দেখেছিনু খেলা করে।

তুমি পারনি তো তবু জানতে

আমি পিছনে আসিয়া দাঁড়িয়েছিলাম

তোমারি দুয়ার প্রান্তে

আমি ব্যাকুল ধ্যানের মৃধুর সে ছবি

দেখেছি আবেশ ভরে।

নীরবে আসিয়া আঙুল চাপিয়া চোখে

কয়েছি তোমার কানে কানে আমি

বলত কে?

তুমিও চিনেও চাওনি চিনতে

শুধু ক্ষণিক বিজলী ফোটালে মুকুল

তোমারই অধর বৃন্তে

তুমি কয়েছিলে জানি

কে এলো আমার প্রাণের বাসর ঘরে।

শিল্পী: রবীন মজুমদার। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৪৯)

13

বনে নয় আজ মনে হয়

যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে

আমি তাই গেয়ে যাই

এ কোন খুশি প্রাণে জেগেছে

প্রাণে প্রাণে গানে গানে

ফাগুনে আগুন বুঝি লেগেছে।

একি দোলা প্রাণে

একি দোলা গানে

এ দোলা কে আজি ছড়ালে

ফুলে ফুলে দুলে দুলে

অলি যে সুর ঐ ঝরালো।

মরমে মরমে

যে সুর যে রং আমি চেয়েছি

পিয়াসে তিয়াসে

সে দোল সে গান আজি পেয়েছি।

শিল্পী: সুচিত্রা সেন । সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫০

14

আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে

আসবে কি?

আমায় তুমি আগের মত

তেমনি ভালবাসবে কি?

ফাগুন বলে কোন কথাই শুনবোনা

ছড়াবো রং তোমার প্রাণে উনমনা!

সেই রঙে মন ভরিয়ে নিয়ে

আবার তুমি আসবে কি?

কে জানে আজ কোথায় আছ কোন দূরে

ভুললে কি গো তোমারই সেই বন্ধুরে

চোখে চোখে নীরব কথা

ব্যাকুলতায় ভাসবে কি?

শিল্পী: সুচিত্রা সেন । সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫১)

১৫

কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে

আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে

এই মধুক্ষণ মধুমাস হয়ে
না হয় উঠিত ভ' রে।
সুরে সুরভিতে না হয় ভরিত বেলা
মোর এলোচুল লয়ে বাতাস করিত খেলা,
ব্যাকুল কত না বকুলের রাশি
র'য়ে র'য়ে যেত ঝ' রে।
কিছু নিয়ে দিয়ে ওগো মোর মনোময়,
সুন্দরতর হোতনা কি বল
একটু ছোঁয়ার পরিচয়।
ভাবের নিলায় না হয় ভরিত আঁখি
আমারে না হয় আরো কাছে নিতে ডাকি,
না হয় শোনাতে মরমের কথা
মোর দুটি হাত ধরে।

'পথে হ'ল দেরী' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৩)

১৬

এ শুধু গানের দিন
এ লগন গান শোনাবার।
এ তিথি শুধু গো যেন দক্ষিণ হাওয়ার ॥
এ লগনে দুটি পাখী মুখোমুখী
নীড়ে জেগে রয়,
কানে কানে রূপকথা কয়।
এ তিথি শুধু গো যেন হৃদয় চাওয়ার।
এ লগনে তুমি আমি একই সুরে
মিশে যেতে চাই।
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার ॥

'পথে হল দেরী' কথাচিত্র ।। শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৪)

১৭

আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগর আর তের নদীর পারে,
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে।
সে এক রূপ কথারই দেশ
ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ,
তারারই ফুল পাপড়ি ঝড়ায়
যেথায় পথের ধারে।
সেই রূপকথারই দেশে
যে রঙ আমি কুড়িয়ে পেলাম প্রাণে,
সুর হয়ে তা বাজে আমার গানে।
তাই খুশির সীমা নাই
বাতাসে তার মধুর ছোঁয়া পাই,
জানিনা আজ হৃদয় কোথায়
হারাই বারে বারে।

'সাগরিকা' কথাচিত্র।। শিল্পী: শ্যামল মিত্র।। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

১৮

পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো

ফুল জানে পাখী কেন গান গায়,

রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো

চাঁদ জানে রাত কার পানে চায়।

সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে

মন চায় সেই সুরে হাসিতে,

নদী চায় সাগরে যে মিশিতে

সাগর নদীরে তাই কাছে পায়।

কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায় গো,

খেলাঘর কেন ভেঙে যায় যায় গো,

সীমার বাঁধনে আমারে বাঁধিতে চাও

যত খেলা মোর নীরবে সাধিতে দাও,

ধুলির যা আছে ধুলিতেই থাক পড়ে

ঝরা মালা মোর রেখে গেনু তব পায় ॥

'সাগরিকা' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৫৭)

১৯

আমি শুধু ভাঙি জানিনা তো গড়িতে,

ঝড়ের আঘাতে মোর প্রেম জানে

ফুলের মতন ঝরিতে।

আমি প্রলয়ের বাঁশী

আমি মেঘের অট্টহাসি,

রাঙা কামনার বহ্নি জ্বালায়

অন্তর জানি ভরিতে।

জ্বলে পুড়ে যাক মিথ্যা মায়ার মোহ,

Dhaka University Institutional Repository

শেষ করে দেব এই জীবনের

যত কিছু সমারোহ।

আমি আলোয়ার হাতছানি

আমি প্রদীপ নেভাতে জানি,

বিষ ভূঙ্গারে সুধা শৃঙ্গার

অধরে জানি গো ধরিতে।

'দেবী মালিনী' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৬৩)

২০

শুধু ক্ষমা চাওয়া ছিল বাঁকি

যারে ভাবি আলো

সে তো আলেয়ার ফাঁকি।

যদি মোর হাসি গান

নাহি পেলো প্রতিদান

ব্যথা অভিমান কেমনে বলগো ঢাকি ॥

যেথা ছিল হাসি আজ সেথা আঁখিজল

ঝরে গেছে মালা আছে শশুধু ফুলদল।

দূর তবু নহে দূর

সেতো জীবনেরই সুর

তারই মাঝে আমি নিজেরে লুকায়ে রাখি ॥

শিল্পীঃ অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় । সুরঃ সুধীরলাল চক্রবর্তী ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৬৯)

২১

দূর হতে শুধু ছুঁয়ে যাও তুমি
আমায় তোমার গানে।
কেন দূরে সরোও আলেয়ার মত
মন মোর নাহি জানে ॥
কেন এ ছলনা মন নাহি দেবে যদি
মোর প্রেম হবে কি গো মরুতে হারানো নদী
ভালবাসা মোর কোনদিন কিছু
চায়নি তো প্রতিদান ॥
হৃদয় আমার আঁধারে হারায়ে যায়
মধু ফাগুন এ ভুবন হতে
শুধু যে বিদায় চায় ॥
ঝরা মুকুলের সুরভিতে কাঁদে বেলা
বুঝিতে পারিনি মন নিয়ে একি খেলা
তব নামে জ্বালা মণিদীপ কিগো
নিতে যাবে অভিমানে ॥

।। শিল্পী: নীতা সেন।। সুর: সুধীরলাল চক্রবর্তী ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৭১)

২২

মুছে যাওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যে আমার হৃদয়ে বেদনার
রঙে রঙে ছবি আঁকে।
মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখার স্মৃতি,
মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি

Dhaka University Institutional Repository

দুজনায় দুটি পথ মিশে গেল এক হ'য়ে

নতুন পথের বাঁকে।

সে এক নতুন দেশে

দিনগুলি ছিল যে মুখর কত গানে

সেই সুর কাঁদে আজি আমার প্রাণে।

মনে পড়ে যায় সেই মিলন মধুর বেলা

মনে পড়ে যায় সেই হাসি আর গানের খেলা

কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে গেল

আকাশ কি মনে রাখে।

'লুকোচুরি' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৮৪)

২৩

এক পলকে একটু দেখা

আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কি?

যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে

মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি?

মিষ্টি হাসি দুষ্টুমিতে

ভালই লাগে সাড়া দিতে,

স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে দিয়ে

দিনগুলি যাক না চলে ক্ষতি কি?

হোলই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়,

এখন আড়ালটুকু সরে গেলে হয় গো ভাল হয় ॥

এড়িয়ে যাওয়া ছলনাতে

দেয় সে ধরা ইশারাতে,

কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায়

যদি আমার হৃদয় দোলে ক্ষতি কি?

'লুকোচুরি' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ কিশোর কুমার ।। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৫)

২৪

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে

আমারই এ দুয়ার প্রান্তে

সে তো হায় মৃদু পায়

এসেছিল পারিনি তো জানতে।

সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি

হায়, সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি

তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি

আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে।

সে যে আলো হয়ে এসেছিল কাচে মোর

আজ তারে আলেয়া যে মনে হয় ॥

এ আঁধারে একাকী এ মন আজ

আঁধারের সাথে শুধু কথা কয়।

আজ কাছে তারে এত আমি ডাকি গো

সে যে মরীচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো

ভাগ্যে যা আছে লেখা হয় রে

জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে।

।। শিল্পীঃ লতা মুঙ্গেশকার।। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

২৫

ও পলাশ ও শিমুল

কেন এ মন মোর রাঙালে

জানিনা জানিনা আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে ॥

যার পথ চেয়ে দিন গুনেছি

আজ তার পদধ্বনি শুনেছি

ও বাতাস কেন আজ বাঁশী তব বাজালে।

যায় বেলা যাক না আঁখি দুটি থাক

সুন্দর স্বপ্নে মগ্ন।

যেন এল আজ এই শুভলগ্ন ॥

এ জীবনের যতটুকৃ চেয়েছি

মনে হয় তার বেশী পেয়েছি

ও আকাশ কেন আজ এত আলো ছড়ালে।

আমারে যে দিলে তুমি ভরায়ে।

শিল্পী: লতা মুঙ্গেশকর। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২:৭৭)

২৬

আমি দূর হ' হে তোমাকেই দেখেছি

আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি।

বাজে কিংকিনি রিনিঝিনি

তোমারে যে চিনি চিনি

মনে মনে কত ছবি এঁকেছি।

ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল

তুমি বাতাসে ওড়ালে ভীরু অঞ্চল

ঐ রূপের মাধুরী মোর সঞ্চয়ে রেখেছি।

Dhaka University Institutional Repository

যেন কস্তুরীমৃগ তুমি

আপন গন্ধ ঢেলে এ হৃদয় ছুঁয়ে গেলে

সে মায়ার আপনারে ঢেকেছি।

ঐ কপোলে দেখেছি লাল পদ্ম

যেন দল মেলে ফুটেছে সে সদ্য

আমি ভ্রমরের গুঞ্জনে তোমারেই ডেকেছি।

।। সুর ও শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৭৮)

২৭

অলির কথা শুনে বকুল হাসে

কই তাহার মত

তুমি আমার কথা শুনে হাসনা তো।

ধরার ধূলিতে যে ফাগুন আসে

কই তাহার মত

তুমি আমার পাশে কভু আসনা তো।

আকাশ পারে ঐ অনেক দূরে

যেমন করে মেঘ যায় গো উড়ে

যেমন করে সে হাওয়ায় ভাসে

কই তাহার মত

তুমি আমার স্বপ্নে কভু ভাসনা তো।

চাঁদের আলোয় রাত যায় যে ভরে

কই তাহার মত তুমি কর না কেন

ওগো ধন্য মোরে?

যেমন করে নীড়ে একটি পাখী

সাথীরে কাছে তার নেয়গো ডাকি

Dhaka University Institutional Repository

যেমন করে সে ভালবাসে
কই তাহার মত
তুমি আমায় কভুও ভাল বাসোন তো।

।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৭৯)

২৮

তুমি যে আমার
(ওগো) তুমি যে আমার।
কানে কানে শুধু একবার বল
''তুমি যে আমার''।
আমার পরাণে আসি
তুমি যে বাজাবে বাঁশী,
সেই তো আমার জীবনে
তোমারই অভিসার।
তুমি যে আমার দিশা
অকুল অন্ধকারে,
দাওগো আমায় ভরে
তোমার অহংকারে।
জীবন মরেণ মাঝে
এস গো বধুর সাজে,
সেই তো আমার সাধনা
চাইনা সে কিছু আর।

'হারানো সুর' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ গীতা দত্ত ।। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৮২)

Dhaka University Institutional Repository

২৯

সেদিন বসন্ত বেলা

চুপি চুপি মন নিয়ে

করেছ খেলা

আজ আমি যেন ওগো কত একেলা

কেন জানিনা, কেন জানিনা।

আজ আমার পাশে নেই তুমি

কোথায় হারালে সেই তুমি

গুঞ্জন জাগে না কিছু ভাল লাগেনা

কেন জানিনা, কেন জানিনা।

সেদিন যে নাম ধরে ডেকেছিলে মোরে

সেই নাম ধরে আর ডাকবেনা কি?

এই যে স্বপ্নলোকে আমার অবাক দুটি চোখে

সেই মায়া আর আঁকবে নাকি?

আজ কোথায় তুমি কোনখানে

সে কি আমার মন জানে

বন্ধন খুলেছ আমারে কি ভুলেছ

আজ আমি যেন ওগো কত একেলা।

শিল্পীঃ নীতা সেন ।সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৩)

৩০

তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ

একি অভিশাপ, নাই প্রতিকার,

মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই আজ অধিকার।

কোথায় অযোধ্যা কোথা সেই রাম–

কোথায় হারাল গুণধাম।
একি হল, পশু আজ মানুষেরই নাম।
সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে
শেষ করে দাও এই অনাচার।
তোমার কঠিন হাতে বজ্র কি নাই–
হিংসার কর অবসান,
তোমার এ পৃথিবীতে যারা অসহায়–
তুমি মা তাদের কর ত্রাণ।
চরণতীর্থে তব এবার শরণ লব–
দুর্গম এই পথ হব পার। মরুতীর্থ হিংলাজ

সুর ও শিল্পী : হেমন্ত মুলোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৮৬)

৩১

পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেভরা কোলো তব
মাগো বল কবে শীতল হব।
কতদূর আর কতদূর বল মা?
আঁধারের ভ্রূকুটিতে ভয় নাই—
মাগো তোমার চরণে জানি পাব ঠাঁই,
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায়
হাসিমুখে সে বেদনা সব।
চিরদিনই মাগো তব কুরুণায়
ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়,
ঐ আকাশে যদি মা কভু ওঠে ঝড়
সে আঘাত বুক পেতে লব।
যতই দু:খ তুমি দেবে দাও

Dhaka University Institutional Repository

জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও,
মাগো তুমি ছাড়া এ আঁধারে গতি নাই
তোমায় কেমনে ভুলে রব।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' কথাচিত্র ।। সুর ও শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৮৭)

৩১

নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী
আর পৃথিবীর 'পরে ওই নীল আকাশ,
তুমি দেখছ কি?
আকাশ আকাশ শুধু নীল ঘন নীল নীলাকাশ
সেই নীল মুছে দিয়ে আসে রাত,
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে তুমি দেখছো কি?
তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছো কি?
শুনেছো কি রাত্রির কান্না বাতাসে বাতাসে বাজে
তুমি শুনেছো কি?
নিবিড় আঁধার নেমে আসে, ছায়াঘন কালোরাত
কলরব কোলাহল থেমে যায়
নিশীথ প্রহরী জাগে তুমি দেখেছো কি?
এই বেদনার ইতিহাস শুনেছো কি?
দেখেছো কি মানুষের অশ্রু?
শিশিরে শিশিরে ঝরে,
তুমি দেখেছো কি?
অসীম আকাশ তারই নীচে চেয়ে দেখ
ঘুমায় মানুষ
জাগে শুধু কত ব্যথা হাহাকার,

ছোটো ছোটো মানুষের ছোটো ছোটো আশা

কে রাখে খবর তার তুমি দেখেছো কি?

আর শুনেছো কি মানুষের কান্না

বাতাসে বাতাসে বাজে,

তুমি শুনেছো কি?

'নীল আকাশের নীচে' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৮)

৩২

ও নদীরে

একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে।

বল কোথায় তোমার দেশ

তোমায় নেই কি চলার শেষ।

তোমার কোন বাঁধন নাই,

তুমি ঘরছাড়া কি তাই

এই আছ ভাঁটায় আবার

এই তো দেখি জোয়ারে

একুল ভেঙে ওকুল তুমি গড়,

যার একুল ওকুল দুকুল গেল

তার লাগি কি কর?

আমায় ভাছ মিছেই পর

তোমার নেই কি অবসর,

সুখ দুঃখের কথা কিছু

কইলে না হয় আমারে।

'নীল আকাশের নীচে' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

৩৩

মনের কথাটি বলতে পারিনি মুখে

দ্বারে এসে ফিরে গেলে তাই

তোমার আখির ছায়া ছিল এ আখিতে আকা

দেখে তবু চেয়ে দেখি নাই

যে নদী গভীর হয়

ঢেউ তাতে নাহি হয়

তাই মোরে চিনিলো না

বুকে এ কি ব্যথা পাই

এই প্রাণে কেদে মরে

না বলা যে কথা

শুধু তীর বেধা পাখি জানে

মোর আকুলতা ।

ভেবেছিনু যারে ফুল

কাঁটাতে সে হল ভুল

ঝড়েরই আঘাতে মোর

দীপ বলে নিভে যাই ।

'যৌতুক' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৯৪)

৩৪

কেন দূরে থাকো

শুধু আড়ালে রাখো,

কে তুমি কে তুমি আমায় ডাকো।

মনে হয় তবু বারে বারে

এই বুঝি এলে মোর দ্বারে,

Dhaka University Institutional Repository

সে মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গো নাকো।

ভাবে মাধবী সুরভি তার বিলায়ে,

যাবে মধুপের সুরে সুরে মিলায়ে।

তোমারই ধেয়ানে ক্ষণে ক্ষণে

কত কথা জাগে মোর মনে,

চোখে মোর কাঞ্চনের ছবিটি আঁকো।

'শেষ পর্যন্ত' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৯৫)

৩৬

এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকেনা তো মন

কাছে যাবো কবে পাবো

ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

যূথী বনে ঐ হাওয়া

করে শুধু আসা যাওয়া,

হায় হায়রে দিন যায়রে

ভরে আঁধারে ভূবন।

শুধু ঝরে ঝরঝর আজ বারি সারাদিন,

আজ যেন মেঘে মেঘে হল মন যে উদাসী।

আজ আম ক্ষণে ক্ষণে

কি যে ভাবি আনমনে,

তুমি আসবে ওগো হাসবে

কবে হবে সে মিলন।

'শেষপর্যন্ত' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

৩৬

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু

একটি সে নাম,

আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে

তারে যেন মুছিয়া দিলাম।

কেন তবু বারে বারে ভুলে যাই

আজ মোর কিছু নাই,

ভুলের এ বালুচরে যে বাসর বাঁধা হলো

জানি তার নেই কোন দাম।

এই সাগরেরি কতরূপ দেখেছি,

কখনও শান্ড়রূপে কখনও অশান্ত সে

আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থেকেছি।

মনে হয় এ তো নয় বালুচর,

আশা তাই বাঁধধে ঘর

দাঁড়ায়ে একেলা শুধু ঢেউ আর ঢেউ গুনি

এ গোনার নেই যে বিরাম।

আজ সব কিছু দিয়ে আমি জানিনা তো

কি-বা নিলাম।

'শেষ পর্যন্ত' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ৯৭)

৩৭

এই রাত তোমার আমার

ঐ চাঁদ তোমার আমার,

শুধু দুজনের।

এই রাত শুধু যে গানের

Dhaka University Institutional Repository

এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের,

কুহু কূজনের।

এই রাত তোমার আমার।

তুমি আছো–আমি আছি তাই

অনুভবে তোমারে যে পাই,

এই রাত তোমার আমার

ঐ চাঁদ তোমার আমার ॥

'দীপ জ্বেলে যাই' কথাচিত্র ।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১০৪)

৩৮

আমার জীবনের এত খুশী এত হাসি

কোথায় গেল।

ফুলের বুকে ভ্রমর বাঁশী

আজ কোথায় গেল ॥

হায় স্বপ্নভরা সেই গান

আজ কেন হল অবসান

সেই দুটি কথা ভালবাসি

আজ কোথায় গেল ॥

এই না পাওয়ার ব্যথাভরা তিথিতে

মন আমার ভরে আছে স্মৃতিতে

হায় বাসর ভরা সেই ফুল

হলো কাঁটার আঘাতে যেন ভুল

মিলন মালার সেই বকুল রাশি

আজ কোথায় গেল ॥

'দুই ভাই' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১০৮)

৩৯

ওগো যা পেয়েছি, সেইটুকুতেই
খুশি আমার মন।
কেন একলা বসে হিসেব কষে
নিজেরে আর কাঁদাই অকারণ ॥
চৈত্র বেলায় ঝরাপাতার কান্না যখন শুনি
কেন যাই গো ভুলে জীবনে মোরে ছিল যে ফাগুনি
হাসি আমার চোখের জলে
নিজেই কেন দেব বিসর্জন ॥
ঘট ভরিতে পিছল ঘাটে
না আসে কেউ যদি
তবু চলার পথে যায় যে থেমে নদী
নিভে যাওয়া প্রদীপে মোর নাই থাকে গো আলো
আসেই যদি আঁধার ঘিরে সেই তো তবু ভালো
আমি ভাগ্য বলেই নেব মেনে
চিরদিনই ব্যথার আলিঙ্গন ॥

'দুই ভাই' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১১০)

৪০

এই পথ যদি না শেষ হয়
তবে কেমন হোত তুমি বলতো
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হোত তুমি বলতো।
কোন রাখালের এই ঘর ছাড়া বাঁশিতে
সবুজের ওই দোল দোল হাসিতে
মন আমার মিশে গেলে বেশ হয়

যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশে হয়

তবে কেমন হোত তুমি বলতো ॥

নীল আকাশের ঐ দূর সীমা ছাড়িয়ে

এই গান যেন যায় হারিয়ে

প্রাণে যদি এ গানের রেশ রয়

যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়

তবে কেমন হোত তুমি বলতো।

'সপ্তপদী' কথাচিত্র । শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১১২)

৪১

একগোছা রজনী গন্ধা

হাতে দিয়ে বললাম

''চললাম''।

বেশ কিছু সময়তো থাকলাম,

ডাকলাম,

মন রাখলাম।

দেখলাম দু'টি চোখে বৃষ্টি

বৃষ্টি, ভেজা বৃষ্টি

মনে করো আমি এক

মৃত কোন জোনাকি

সারারাত আলো দিয়ে জ্বললাম।

''চললাম''।

এখানেই সব কিছু শেষ নয়,

বেশ নয়

যদি মনে হয়

লিখে নিও গল্পের শেষটা,

থাক্ না তবু রেশটা

দেখ না গো চেয়ে তুমি

আনমনা চরণে

কোন ফুলে ভুল করে দললাম।

''চললাম'' ॥

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । সুর: নচিকেতা ঘোষ ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১১৪)

৪২

আমার পুতুল নিয়ে খেলতে এখন

লজ্জা করে

(কোন) এখানে ওখানে পা ফেলতে এখন

লজ্জা করে।

সবাই বলে আমার নাকি

মানায় ভালো শাড়ি পরলে

রূপটা আমার খোলে নাকি খোঁপা করলে

(কেন) এদিকে ওদিকে চোখ মেলতে এখন

লজ্জা করে।

আমি এখন ছোটটি নয়

লজ্জা করে কেউ ডাকলে,

লজ্জা করে কেউ আমার কাছে থাকলে

কারো বন্ধ দুয়ার কেন ঠেলতে এখন

লজ্জা করে।

শিল্পী: রানু মুখোপাধ্যায় । সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৪৩

লিলিতা গো বলে দে

কোন পথে ওগল শ্যাম?

বিশাখা গো বলে দে

কোন পথে গেল শ্যাম?

মুরলীর ধ্বনি তার

আমারে ডাকে আর

আর তো শুনি না রাধা নাম ॥

'বসন্তবাহার' কথাচিত্র।। শিল্প: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুর: জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৩৯)

৪৪

এখনো আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে

যদি গো আলো তার আসে নিভে

তবু জেনে গেছি তুমি আছ কাছে ॥

বুঝিনা তো কি যে বলে হাওয়া

বনলতা ঝরা ফুলে ছাওয়া

ঐ নীড়ে জাগা দুটি পাখী

কূজনেতে দুজনারে যাচে ॥

মনে রেখো এই কাছে থাকা

শপথের সুরে কাছে ডাকা।

কথাহারা এই নীরবতা

মনে মনে রচে রূপকথা

তাই কোন কথা নয় যদি

এই আবেশ ভেঙে যায় পাছে ॥

সুর ও শিল্পী: সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৫২)

৪৫

জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো

সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও।

এখনো কাছে আছি তাই তো বোঝনা

আমি যে তোমার কত প্রিয় ॥

হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারিতাম

বুঝিতে তুমি ওগো কিযে তারি দাম

আমি যে অসহায় আমার এ অপরাধ

পার তো ক্ষমা করে নিও ॥

যেদিন চিরতরে হারায়ে যাব আমি

ভাঙিবে ভুল তব তোমারে পার আমি।

সেদিন ডাক যদি এ নাম ধরে হায়

রুধির হয়ে যদি অশ্রু ঝরে যায়

তবুও আমায় পাবে না খুঁজে আর

বিরহী হব জানি বরণীয় ॥

সুর ও শিল্পীঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৫৩)

৪৫

আমি চেয়েছি তোমায়

সেকি মোর অপরাধ

শুধু এ জীবনে নয় এ যেন আমার

কত জনমের সাধ।

নেভা দীপ সম নিজেরে লুকায়ে রাখি

দূরে দূরে সরে থাকি।

পাছে মোর কাছে এলে কেউ যদি বলে

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কলঙ্কী চাঁদ।

সূর্যের পানে চেয়ে ভরে

সূর্যমুখীর বুক।

তাইতো তোমায় দূর হতে দেখি

সেই যে আমার সুখ।

কি যে ব্যথা মোর সে শুধু আমি জানি

হার তবু নাহি মানি।

পথ চাওয়া মোর নয়ন নিমেষে

নামেনা তো অবসাদ।

শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য । সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৫৪)

৪৬

এ তো নয় শুধু গান

এ যেন তোমার কিছু অনুরাগ

আর কিছু অভিমান।

হয়তো তুমি আমার গানের

এভাষারে যাবে ভুলে

এ মালা ফেলিবে খুলে

তবু জেনে রেখো মোর প্রেম কভু

চায়নি তো প্রতিদান!

কি কথা যে আজ জানাই তোমায়

এ গানের সুরে সুরে।

আজ নয় জানি বুঝিবে গো তুমি

চলে যাবে যবে দূরে।

সেদিন যদি গো ফাগুনের মত

আমার ভুবন ঘিরে

আসো তুমি ওগো ফিরে

একটি সে নদী দেখিবে মরুতে

হয়ে গেছে অবসান।

শিল্পী: দীপক মৈত্র । সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যা ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৫৯)

৪৭

আমি আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাই

চক্ষের জলে কালি,

আর পাজর ছিঁড়িয়া লিখি এই কথা

পিরীতি যে চোরাবালি।

দীরঘশ্বাস যে কাগজ বন্ধু

দু:খ আখর তারই,

মাথার কিরা সে লিখনের ভাষা

আমিই লিখতে পারি

সে ভাব বুঝিতে সে ভাষা পড়িতে

মোর বন্ধুরাই জানে খালি।

হায় ধ্যান জ্ঞান মোর নাইরে

সবাই মুখ্য আমারে কয়,

তোমারাই বল বল গো

এই পত্র লিখিতে বিদ্যা শিখিতে

পুঁথি কি পড়িতে হয়?

বিরহ যে তার শিরনামা ওগো

জানিনা বধুর নাম,

তাই যে গো হায় পারিনা লিখিতে

Dhaka University Institutional Repository

কি তার নাম ঠিকানা ধাম।

সে যদি না পড়ে এ প্রাণ লিখন

বিধি চিতায় দাও গো জ্বালি

'নবজন্ম' কথাচিত্র।। শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ।। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৬৭

৪৮

ক রয়েছেন কলকাতায়

খড়গপুরে খ-এর বাস,

গোয়ালিয়ার গেছেন চলে

গড়গড়ি শ্রীগঙ্গাদাস।

আর ঘাটশিলাতে ঘ-এর কাছে

ঙ থাকেন বারমাস।

চমচমেতে আছি আমি চ বলে ঐ চেঁচিয়ে,

ছানাতে ছ জিলিপিতে জ রয়েছে পেঁচিয়ে।

লাল লঙ্কার ঝালেতে ঝ মুখটা যে দেয় পুড়িয়ে,

এর জীবন কাটে কেবল পরেরই পাত কুড়িয়ে

ট রয়েছেন ট্যাঁকশালে

ঠ-এর ঠাকুরদার ঠুংরি গায়,

নেই কোন ডর ড-এর প্রাণে

বাঁয়ে যেতে ডাইনে যায়।

আর পেট ফুলিয়ে ঢোল ঢ-এর হাতে–

ণ গাট্টা খায়।

তড়তড়িয়ে তাড়াতাড়ি ত চলে তরতরিয়ে,

থানাতে থ দৌড়ে দ-এর ঘাম ছোটে দরদরিয়ে।

ক্ষেত ভরা ঐ ধানেতে ধ জীবনটা দেয় বাঁচিয়ে

ন নস্যি টানে খাওয়ার শেষে আঁচিয়ে ॥

‘পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট’ কথাচিত্রের গান ।

।। শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।। সুর: নচিকেতা ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৭৩)

৪৯

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে

পান্থ পাখীর কূজন কাকলী ঘিরে

আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো

আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে

অশ্বথের ছায়ে মাঠের প্রান্তে দূরে

রাখালী বাঁশী বেজে বেজে ওঠা সুরে

আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই নীড়ে।

ঝরা পাতাদের মর্মর ধ্বনি মাঝে

কান পেতে শুনো অশ্রুর সুরে

মোর এই গান বাজে।

পরাগ ঝরনো স্বপ্ন ভরানো বনে

যেথায় সুর তোলে মনে মনে

আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই নীড়ে।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । সুর: নচিকেতা ঘোষ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৮১)

৫০

বনে নয় মনে মোর পাখী আজ গান গায়

এই ঝিরি ঝিরি হাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

দোলা দিয়ে যায়

গুণ গুণ ভ্রমরের ফাগুন

ডাকে মোরে আয় ॥

একি তবে রূপময় অপরূপ দিল ডাক

স্বপ্নের সমারোহে বেলা আজ কেটে যাক

কার ছোঁয়া সুরে যেন এই আমি আপনারে

যেন খুঁজে পাই

চম্পা বুকলের ভাঙে ঘুম

চঞ্চল হল আজ ফাগুন

কার সে নূপুরের সুর বাজে রুমঝুম।

রূপে জানিনা এই সুন্দর লীলা কার

সে কি তবে এ জীবনে মধুরের উপহার

সুর আর সুরভিতে আনমনা বাঁশী যেন

তারই সাড়া পায়।

শিল্পী: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় । সুর: নচিকেতা ঘোষ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৮৪)

৫১

মেঘ কালো আঁধার কালো

আর কলঙ্ক যে কালো

যে-কালিতে বিনোদিনী হারাল তার কুল।

তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল।

কাশ যে সাদা ধেনু সাদা

আর সাদা খেয়ার পাল

সাদা যে ঐ স্বপ্ন মাথা রাজহংসের পাখা

তার চেয়েও সাদা কন্যা

তোমার হাতের শাঁখা।

লজ্জা রাঙা সিঁদুর রাঙা

আর রাঙা কৃষ্ণচূড়া

রাঙা যে গো সাঁঝ আকাশের ঐ যে অস্তরাগ

তার চেয়েও রাঙা কন্যা

তোমার আলতার ঐ দাগ।

শষ্য সবুজ পাতা সবুজ

আর সবুজ টিয়া পাখী

দুর্বা সবুজ তার সাথে যে চিরসবুজ বন।

তার চেয়েও সবুজ কন্যা

তোমার অবুঝ মন।

শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । সুরঃ নচিকেতা ঘোষ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ১৮৮)

৫২

যদি কাগজে লেখো নাম

কাগজ ছিঁড়ে যাবে,

পাথরে লেখো নাম

পাথর ক্ষয়ে যাবে—

হৃদয়ে লেখো নাম

সে নাম রয়ে যাবে।

হৃদয় আছে যার

সেই তো ভালোবাসে

প্রতিটি মানুষেরই

জীবনের প্রেম আসে

কেউ কি ভেবেছিল

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামকে ভালোবেসে

রাধার ভালোবাসা

কাহিনী হয়ে যাবে,

হৃদয়ে লেখো নাম

সে নাম রয়ে যাবে।

গভীর হয়গো যেখানে ভালোবাসা

মুখে তো সেখানে

থাকে না কোনো ভাষা,

চোখের আড়ালে মাটির নিচে ওই

ফল্গু চিরদিনই

নীরবে বয়ে যাবে,

হৃদয়ে লেখো নাম

সে নাম রয়ে যাবে ॥

।। শিল্পী: মান্না দে ।। সুর: নচিকেতা ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৯৩)

৫৩

কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল

কোথায় পথের প্রান্ত।

ঠিকান-হারানো চরণের গতি

হয়নি কি তবু ক্লান্ত।

পিছনের পথে উঠেছে ধূলির ঝড়

সমুখে অন্ধকার,

বল তবে ওগো কবে হবে অভিসার।

তৃষিত আশারে কোরোনা গো তুমি ভ্রান্ত।

তবুও তো যেতে হবে

কাঁটা বিঁধে পায়ে যদি গো রক্ত ঝরে

অশ্রুতে মোর তবু হাসি ছুঁয়ে রবে।

প্রদীপের পায়ে প্রজাপতি তার প্রেম

করে গো সমর্পণ

সে তো মরণের কাছে জীবনের নিবেদন।

ঝর চলে গেলে পৃথিবী যে হয় শান্ত।

সুর ও শিল্পীঃ মান্না দে।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৯৮)

৫৪

এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু,

কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন

মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু।

আমলকী পিয়ালের কুঞ্জে–

কিছু মৌমাছি এখনও যে গুঞ্জে,

বুঝি সেই সুর ভরালে গো বন্ধু।

বাতাসের কথা সে তো কথা নয়

রূপকথা ঝরে তার বাঁশীতে,

আমাদের মুখে কোন কথা নেই

শুধু দুটি আঁখি ভ'রে রাখি হাসিতে

কিছু পরে দূরে তারা জ্বলবে

হয়ত তখন তুমি বলবে,

জানি মালা কেন গলে পরালে গো বন্ধু।

'হসপিটাল' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ গীতা দত্ত ।। সুরঃ অমল মুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২০২)

Dhaka University Institutional Repository

৫৫

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ হে তুমি

প্রাণে প্রাণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো।

বিষের ভাণ্ড যে হাতে

সেই হাতে তোমার প্রভু অমৃত ঢালো।

প্রভু তোমারই এ নিখিলে

আমার আমার বলে

কেন হয় মন পাপে কালো।

প্রভু মেটাও এ জীবন তৃষ্ণা–

তুমি পথ তুমিই যে দিশা,

সম্মুখে আঁধার নিশা–

করুণার কর হে আলো।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২০৫)

৫৬

হয়তো কিছুই নাহি পাবো

তবুও তোমায় আমি––

দুর হতে ভালবেসে যাবো।

যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা

জানি তুমি বুঝিবেনা তবু তারই ভাষা

তোমারই জীবনে কাঁটা আমি

কেন মিছো ভাবো।

ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়––

প্রতিদান সে কি পায়!

ক্ষতি নাই অনাদরে যদি কভু কাঁদি––

আলো ভেবে যদি ছায়া বুকে বাঁধি

Dhaka University Institutional Repository

পাবারই আশায় তবু ওগো

কিছু নাহি চাবো।

শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় । সুরঃ শ্যামল মিত্র ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ২১২)

৫৬

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

মন যেতে নাহি চায়

তবুও মরণ কেন এখান থেকে

ডেকে নিয়ে যায়

কে জানো কোথায়,

না না না না যাব না ।।

মনে হয়, মানুষেরই সুখে দুখে মিশে থাকি

তাদের কাছে ডাকি,

কণ্ঠ জড়ায়ে ধরে বলি যেতে দিও না আমায়

না না না যাব না।।

যদি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে

তবু এই আকাশ এই বাতাস

পিছু ডাকে কেন তবে।।

এ ভূবনে দুদিনেরই তবে শুধু কেন আসা

মিছে মায়া ভালোবাসা,

ওগো নিঠুর জীবন তুমি মোরে

বোল না বিদায়,

না না না না যাব না।।

সুর ও শিল্পীঃ শ্যামল মিত্র ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ২২৪)

Dhaka University Institutional Repository

৫৭

এমন একটা পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই

যেখানে যুদ্ধ নেই–যেখানে দ্বন্দ্ব নেই

কামানের গোলা, বারুদের কোনো গন্ধ নেই

যেখানে প্রাণের দরজাগুলো বন্ধ নেই।।

হিংসা, হীনতা, বিবাদ, দীনতা, স্বার্থ

সেই পৃথিবীতে ফেলবে না ছায়া আর তো

যেখানে মানুষকে বাঁধে মানুষই প্রাণের বন্ধনে

থাকতে যে চাই শান্তির সেই নন্দনেই।।

এমন একটা পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই

যেখানে যুদ্ধ নেই– যেখানে দ্বন্দ্ব নেই

F16, মিগ, মিরাজের পাঁজর কাঁপানো

ছন্দ নেই

যেখানে প্রাণের দরজাগুলো বন্ধ নেই।।

যেখানে বলতে পারবো হাতে টেনে নিয়ে হাত যে

একটি পৃথিবী–একটি মানুষ জাতকে

বাঁচবো আমরা সুখ স্বপ্নের স্পন্দনেই

থাকতে যে চাই শান্তির সেই নন্দনে।।

শিল্পীঃ বনশ্রী সেনগুপ্ত । সুরঃ নীতা সেন।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২৩৪)

৫৮

যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম

আদর কইর‍্যা সাজাইয়া পানের খিলি

তারে খাওয়াইতাম ।।

সেই পানের রসের লাল রং যে,

Dhaka University Institutional Repository

লাগতো দুখান ঠোঁটে

মনে হইতো অসময়ে যেন রাঙা পলাশ ফোটে

হায়রে–ঐ না রাঙা ঠোঁটে।

ভোমরা হইয়া উইড়্যা গিয়া আমি,

সেই না মধু খাইতাম।।

পানের্ রঙের মতো যে গো প্রাণের রঙ যে লাল

লজ্জা হইয়া সেই রঙে তার রাঙা হইতো গাল।।

সোনা মুখের মিঠা কথায়,

ভরতো যে মন সুখে,

মাঝে মাঝে হাসির ভিতর

মুক্তা ঝরতো মুখে

পাইলে কি আর অবুঝ হইয়া

আসমানের চাঁদ চাইতাম।।*

সুর ও শিল্পী: উৎপলেন্দু চৌধুরী ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ২৪৮)

৫৯

মাছের কাঁটা, খোঁপার কাঁটা

কাঁটা অনেক রকম

ফুলের কাঁটার চেয়েও জ্বালায়

পিরিত কাঁটার জখম।

বুঝলেন কি কথাটা।

কাঁচপোকা, শ্যামাপোকা,

পোকা নানাজাতি

এত পোকার মধ্যে শুধু

জোনাকি দেয় বাতি

Dhaka University Institutional Repository

বুঝলেন কি কথাটা।

কালোটাকা, কালোবাজারী,

কালোকথা মুখে

নয়ত কালো শিশুর হাসি

মায়ের শীতল বুকে।

পাথর ভাঙ্গে, কাঁচ ভাঙ্গে,

ভাঙ্গে নদীর কূল

ঘরভাঙ্গে, কপাল ভাঙ্গে

ভাঙ্গে না তো ভুল

বুঝলেন কি কথাটা।।

শিল্পীঃ আশা ভোঁসলে।। সুরঃ রাহুল দেব বর্ম্মণ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ২৫৩)

৬০

ও মালিক সারাজীবন কাঁদালে যখন

আমায় মেঘ করে দাও,

তবু কাঁদতে পারবো পরের সুখে অনেক ভাল তাও,

মানুষে যেন কোর না আমায় মেঘ করে দাও।

ফসল হারা শুকনো মাটির

বৈশাখেতে তৃষ্ণা পেলে

সাগর থেকে জল এনে যে

বৃষ্টি ধারায় দেব ঢেলে,

আর রামধনুকে বলবো আমায়

রাঙিয়ে দিয়ে যাও।

আকাশটা যে হবে কাগজ

তাতে বিজলী আখর দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি নয় মেঘদুত হোক

লেখা আমায় নিয়ে,

আমি মজনুর চোখে হবো না মেঘ

এই কি তুমি চাও?

মানুষ যেন কোর না আমায়

মেঘ করে দাও।।

শিল্পীঃ ভূপেন হাজারিকা । সুরঃ সুপর্ণকান্তি ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ঃ ২৬৮)

৬১

কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই

কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই

আজ আর নেই।

নিশিলেশ প্যারিসে মইদুল ঢাকাটতে

নেই তারা আজ কোন খবরে

গ্রাণ্ডের গীটারিষ্ট গোয়ানীজ ডি' সুজা

ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে

কাকে যে ন ভালবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে

পাগলা গারদে আছে রামা রায়

অমলটা ধুঁকছে দুরন্ত ক্যানসারে

জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায়।

সুজাতাই আজ শুধু সবচেয়ে সুখে আছে

শুনেছি তো লাখপতি স্বামী তার

হীরে আর জহরতে আগাগোড়া মোরা সে

গাড়ি বাড়ী সব কিছু দামী তার।

আর্ট কলেজের ছেলে নিখিলেশ সান্যাল

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতো

আর চোখ ভরা কথা নিয়ে নির্বাক শ্রোতা হয়ে

ডি'সুজা বসে শুধু থাকতো।

একটা টেবিলে সেই তিন চার ঘন্টা

চারমিনার ঠোঁটে জ্বলতো

কখনো বিষ্ণু দে কখনো যামিনী রায়

এই নিয়ে তর্কটা চলতো

রোদ ঝর বৃষ্টিতে যেখানেই যে থাকুক

কাজ সেরে ঠিক এসে জুটতাম

চারটেতে শুরু করে জমিয়ে আড্ডা মেরে

সাড়ে সাতটায় ঠিক উঠতাম।

কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগ কবি কবি চেহারা

মুছে যপাবে অমলের নামটা

একটা কবিতা তার হলো না কোথাও ছাপা

পেলো না সে প্রতিভার দামটা।

অফিসের সোস্যাল-এ্যমেচার নাটকে

রমা রায় অভিনয় করতো

কাগজের রিপোর্টার মইদুল এসে রোজ

''কি লিখেছে'' তাই শুধু পড়তো।

সেই সাত জন নেই আজ

টেবিলটা তবু আছে

সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই

একই সে বাগানে আজ

এসেছে নতুন কুঁড়ি

শুধু সেই সেদিনের মালী নেই

কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই কফি হাউসে

কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়

Dhaka University Institutional Repository

কত জন এলো গেলো

কতজনই আসবে

কফি হাউসটা শুধু থেকে যায়।

শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ সুপর্ণ কান্তি ঘোষ।।

(উৎসঃ হারানোদিনের গান : ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী ২০০৭:১৭৮)

৬২

নীড় ছোট ক্ষতি নেই

আকাশ তো বড়।

হে মন বলাকা মোর আনার আহহ্বানে

চঞ্চল পাখা মেলে ধর ॥

সাঁঝের আখরে ওই আশের গায়-

আলোক লেখনী তব প্রেমের কবিতা লিখে যায়,

সুদুর পিয়াসী পাখা কাঁপে থরথর।

মেঘ রোদ সব বাধা পার হয়ে যাও-

তব ঐ ছুটি কালো চোখে ভুবনেরে নাও ভরে নাও,

তাই নিয়ে আপনারে সুন্দর কর।

‘ইন্দ্রাণী’ কথাত্রি।। শিল্পীঃ হেমন্তমুখোপাধ্যায় ও গীতা দত্ত ।। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৭৫)

৬৩

ওগো বরষা তুমি ঝরোনা গো

অমন জোরে

কাছে সে আসবে তবে

কেমন ক'রে।

এলে না হয় ঝরো তখন

অঝোর ধারে

যাতে সে যেতে চেয়েও

যেতে নাহি পারে

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

মেঘ তুমি চাঁদকে ঢেকো

যদি ওঠে

চন্দ্রমলিকা যেন না ফোটে

আমারই চাঁদ আমার থাকুক

কেউ যেন না দেখে তারে,

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

যেন তার পায়ের নুপুর

বাজে রুনঝুন,

এত রাতেও ভ্রমর কেন

করো গুন গুন,

লক্ষ্মী ভ্রমর চুপ করো না

আসছে সে আজ আমার দ্বারে,

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ॥

শিল্পী: মান্না দে। সুর: নচিকেতা ঘোষ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৪)

৬৪

যদি জানতে চাও তুমি

এ ব্যথা আমার কদটুকু

তবে বন্দী করা কোনো

পাখীর কাছে জেনে নিও,

যদি দেখতে চাও আমার

ভিজে যওয়া চোখ ছুটো

তবে জলে ডোবা কোন

পদ্মফুল দেখে নিও ॥

প্রশ্ন কোরো না আগ্নেয়গিরিকে

কেন সে ঘুমিয়ে আজ আছে,

জবাব পাবেনা তার কাছে।

শুধু ডানাভাঙ্গা ভ্রমরকে হাতে ধ'রে

ফুলে তুমি রেখে দিও ॥

গুনতে চেওনা আকাশের তারা

শেষ তার খুঁজে পাবে না,

আমার ব্যথাও গোনা যাবে না ।

নয় আমাদের পরিচয় ভোরের

কুয়াশা দিয়ে চেকে দিও ॥*

শিল্পীঃ হেমন্তমুখোপাধ্যায়। সুরঃ নচিকেতা।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৫)

৬৫

তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীড় ভাঙ্গা ঝড়

তারই মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর।

চাঁদ আসে তাই যেন উলাসে ঐ

রঙের মাধুরী লয়ে ফুল হাসে ঐ

নিকটের পানে চাহি দূর কাঁদে গো

সব শেষে পলবে জাগে মর্মর ॥

র্তজ্ঞারে কাছে ডাকে মরুমায়া গো।

ক্লান্ড়িরে মুছে দেয় তরুছায় গো।

Dhaka University Institutional Repository

চিরদিনই রয় ব্যথা বন্ধনে হায়

হাসি কেন মিশে আছে ক্রন্দনে হায়

সৌরভ গৌরবে ধূপ জ্বলে ঐ

আলো আর আঁধারের খেলা চলে ঐ

অন্তরে ধূ ধূ করে শুধু বালুচর ॥

সুর ও শিল্পী: মান্না দে ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৭)

৬৬

এমনও দিন আসতে পারে

যখন তুমি দেখবে আমি নেই

আমায় তুমি ভুল বুঝোনা যেন

তোমার আগে আমিই যদি যাই ।

ফেরে না কেউ যেথায় গেলে হায়

সাধ করে আর কেইবা বল

সেথায় যেতে চায়

তবুও যদি তোমায় ছেড়ে হয় গো যেতেই কভু

দূরে গিয়েও তোমায় যেন

এমনি করেই পাই ।

সেদিন ওগো এমন করে

ফুটবে বকুল আবার ।

সেইতো হবে লগন ওগো

তোমায় ফিরে পাবার ।

তোমার কাছে আমার যত ঋণ

পারব না তো জানিয়ে যেতে

তোমায় কোনদিন ।

Dhaka University Institutional Repository

ফিরব ভেবে আশায় থেকে

হও গো নিরাশ যদি

সেই কথাটি তোমায় আমি

জানিয়ে গেলাম তাই ।

সুর ও শিল্পী : শ্যামল মিত্র ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২১০)

৬৭

কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে

ভগবান, ও ভগবান দেখেও তুমি দেখো না ।

ওরা যে সেই পাঁজরে প্রাসাদ গড়ে

ভগবান, ও ভগবান দেখেও তুমি দেখো না ।

মিনতি শুনে হায়

পাষাণও গলে যায়

তুমি তো দেখোনা গো না চেয়ে

বেদনা পেয়ে

আমরা কাঁদি ওদের ক্ষেতে

হাসির ফসল ঝরে গো ॥

মোদের এ ভাগ্য যেন খেলার পাশা

ওদেরই চরণছায়ে বাধে বাসা ।

এ ব্যথা শোধে গো

আঁধার রোধে গো

জানিনা আমাদের কি দাম আছে

আলোরই কাছে

আমরা যেন প্রদীপ শিখা

নিয়তি যে ধরে গো ॥

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী : সাবিত্রী ঘোষ ॥ সুর : অনুপম ঘটক ।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১)

৬৮

ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর

তুমি সুন্দর আরো,

কত সুন্দর এই দুটি কথা–

'তুমি আমি তুমি আমি' ।

ভালো লাগে ওগো কাকলী কূজনে

ফাগুনের মুখরতা,

আরো ভালো লাগে এই দুটি কথা

'তুমি আমি তুমি আমি' ।

এই দুটি কথা শুনে পাখিরা গান গায়,

ঐ কুঞ্জ বাসর ছায় ।

ভ্রমর রাখাল পাখার বেণুতে

রচে একি আকুলতা,

তবু আরো ভালো লাগে এই দুটি কথা–

'তুমি আমি তুমি আমি' ।

'অনুপমা' কথাচিত্র ।। শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুর : অনুপম ঘটক ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৩)

৬৯

এতো ভাবিনি কোনদিন

জীবন এত সুন্দর হবে;

শুধু দোল দোল একি হিল্লো

একি সুর জাগে আজ হৃদয়ের উৎসব ।

জানিনা তো আজ আমায়

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণে ক্ষণে কে ডাকে

সে কোথায় থাকে

দেখা হ'লে ওগো আমারে সে কি

কাছে তার টেনে লবে ?

হাওয়ার মত এ প্রাণে আমার

সে শুধু সুর আনে

তারে হৃদয়ে জানে

এত কাছে থেকে তবুও সেকি

চিরদিনই দূরে রবে ?

'অসমাপ্ত' কথাচিত্র ।। শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুর : অনুপম ঘটক ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬)

৭০

কে তুমি আমারে ডাকো–

অলখে লুকায়ে থাকো,

ফিরে ফিরে চাই–

দেখিতে না পাই ।

মনে তো পড়ে না তবুও যে মনে পড়ে–

হাসিতে গেলেই কেন হৃদয় আঁধারে ভরে,

সমুখের পথে যেতে–

পিছনে টানিয়া রাখ ।

নতুন অতিথি ঐ দাড়ায়ে রয়েছে দ্বারে,

তবু ফিরাতে হবে যে তারে ।

ভুল করে মালা যদি দিতে চাই কারো গলে–

কেন কাঁপে হাত বল বাধা পাই পলে পলে,

আমারই আকাশ শুধু

মেঘে মেঘে কেন ঢাকো ॥

'অগ্নিপরীক্ষা' কথাচিত্র ।। শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুর : অনুপম ঘটক ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

৭১

ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তাঁরা

এই মাধবী রাত,

আসেনি ত’ বুঝি আর,

জীবনে আমার ।

এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি ,

এই মধুর তিথিরে স্মরণ করি ।

ওগো মায়াভরা রাত–

(আর) ওগো মায়াবিনী চাঁদ ।

বাতাসের সুরে শুনেছি বাঁশী তার ।

ফলে ফুলে ঐ ছড়ান সে হাসি তার ।

সব কথা গান সুরে সুরে যেন রূপকথা হয়ে যায়,

ফুর ঋতু আজ এল বুঝি মোর

জীবনের ফুলছায় ।

কোথায় সে কত দূরে জানিনা ভেসে যাই,

মনে মনে যেন স্বপ্নের দেশে যাই ।

‘সবার উপরে’ কথাচিত্র ।। শিল্পী : সন্ধ্যামুখোপধ্যায় ।। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৫৮)

৭২

জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া

ছল ছল আঁখি মোর

জল ভরা মেঘে যেন ছাওয়া।

পদধক্ষান শুনে তার আমি বারে বারে

ছুটে যাই দ্বারে।

ভূল ভেঙে যায় আমারে কাঁদায়ে শুধু

Dhaka University Institutional Repository

খেলা করে হাওয়া!

আকাশে উঠেছে ঝড়

কান পেতে শুনি তার ভাষা

তবে কি বেঁধেছি আমি বালুচরে বাসা।

দীপু বুঝি নিভে যায় মন নাহি মানে

তবু তার পানে-

চেয়ে থাকি হায় সহিতে পারিনা তার

এই নিভে যাওয়া।

'সবার উপরে' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬১)

৭৩

আজ এইতো প্রথম এমন ক'রে

আমার কাছে এলে,

আকাশ বুঝি তারার প্রদীপ

তাই দিলে গো জ্বেলে।

পাখী বলে, আমি দিলাম গান-

সুরে ভরিয়ে তোলে প্রান

ঐ ছড়িয়ে খুশি কি খেলা আজ

বাতাস গেল খেলে।

যেমন ক'রে ভুবন ভরে ফাগুন বেলা আসে,

তারই মত এলে ওগো বন্ধু আমার পাশে।

আমার মালা বলে, কণ্ঠে পেয়ে ঠাঁই

আমি যে আজ ধন্য হতে চাই।

এই লগনে আজ তুমি কি তার

আভাস কিছু পেলে।

'ইন্দ্রধনু' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ।। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

৭৪

আমায় কৃপা কর হে দয়াময়

তোমার চরণে প্রভু দিয়ো ঠাই,

জানি তুমি আছ ক্ষমাসুন্দর

পাপের পঙ্কে যদি ডুবে যাই।

যে লোহা বাঁটতে কাটে পুজারই ফল,

সে যে ব্যাধের অস্ত্র হয় হিংসারই বল-

পরশ-মণির কাছে কোনদিনও

তাদের যে কোনও ভেদাভেদ নাই।

পান করে সকলেই তটিনীর জল,

সে যে নালাতে কভুও প্রভু নয় নির্মল-

গঙ্গায় মিশে তারা এক হয়ে যায়-

কেন ছুটিরে পৃথক করে দেখিতে বা চাই ॥

'শিকার' কথাচিত্র ।। সুর ও শিল্পীঃ হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯২)

৭৫

আকাশের অস্তরাগে-

আমারই স্বপ্ন জাগে,

তাই কি হৃদয় দোলা লাগে।

আজ কান পেতে শুনেছি আমি-

মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর,

''আমি তোমারই,''

সেই সুরে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি আমি

মনে হয় এ লগন আসেনি আগে।

এবার বুঝিছি আমি

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ কেন চেয়ে থাক চকোরীর পানে,

আমি যে তোমারই ওগো

বলি কানে কানে।

আজ কান পেতে শুনেছি আমি-

সাগরের কানে কানে তটিনী বলে,

''আমি তোমারই''

কি আশায় তিয়াসায় দিন শুধু গুনিছি আমি

বাতাসের বাঁশী বাজে অনুরাগে।

'সুর্যমুখী কথাচিত্র ।। শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুর: হেমন্তমুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৮)

৭৬

আমার জীবনের এত খুশী এত হাসি

কোথায় গেল।

ফুলের বুকে আলির বাঁশী

আজ কোথায় গেল ॥

হায় স্বপ্নভরা সেই গান

আজ কেন হল অবসান

সেই দুটি কথা ভালবাসি

আজ কোথায় গেল ॥

এই না পাওয়ার ব্যথাভরা তিথিতে

হায় বাসার ভরা সেই ফুল

মিলন মালার সেই বকুল রাশি

আজ কোথায় গেল ॥

'দুই ভাই' কথাচিত্র।। সুর ও শিল্পী : হেমন্তমুখোপাধ্যায়।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০৮)

Dhaka University Institutional Repository

৭৭

তারে বলে দিও সে যেন আসেনা,

আমার দ্বারে তারে বলে দিও

ঐ গুন গুন সুরে মন হাসে না

সে যেন আমার কাছে আসে না ॥

ঐ ফুল মালা দিল শুধু জ্বালা

ধুলায় সে যাক ঝরে যাক না।

এই ভাঙা বাঁশী ভোলে যদি হাসি

ব্যথায় সে থাক ভরে থাক না।

জানি ফাগুন আমার ভালবাসে না

নেই আলো চাঁদে তাই রাত কাঁদে

এ আঁধার শেষ তবু হয় না।

যায় প্রেম সরে ফাঁকি দিয়ে মোরে

এই ব্যথা প্রাণে সয় না।

হায় স্বপ্নে আঁখি আর ভাসে না ॥

'দুই ভাই' কথাচিত্র গান।। সুর ও শিল্প : হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১০৯)

৭৮

যদি জানতে চাও তুমি

এ ব্যথা আমার কতটুকু

তবে বন্দী করা কোনো

পাখীর কাছে জেনে নিও,

যদি দেখতে চাও আমার

ভিজে যাওয়া চোখ দুটো

তবে জলে ডোবা কোন

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মফুল দেখে নিও ॥

প্রশ্ন করো না আগ্নিগিরিকে

কেন সে ঘুমিয়ে আজ আছে,

জবাব পাবে না তাঁর কাছে,

জবাব পাবে না তার কাছে।

শুধু ডানাভাঙ্গা ভ্রমরকে হাতে ধ'রে

ফুলে তুমি রেখে দিও ॥

শুনতে চেওনা আকাশের তারা

শেষ তাঁর খুঁজে পাবে না,

আমার ব্যথাও গোনা যাবে না।

নয় আমাদের পরিচয় ভোরের

কুয়াশা দিয়ে ঢেকে দিও ॥

শিল্পী : হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।। সুর: নচিকেতা ঘোষ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৮৮)

৭৯

যে বাঁশী ভেঙ্গে গেছে

তারে কেন গাইতে বল?

কেন আর মিছেই তবে

সুরের খেয়া বাইতে বল?

আজ সোনার খাঁচার বন্দী পাখীর

পঠে যে সেই সুর,

আজ যেন সেই বনের ছায়া

সে তো অনেক দূর।

তারে হারিয়ে যাওয়া ফাগুনের

ফিরে কেন চাইতে বল?

Dhaka University Institutional Repository

একদা সুরে সুরে দিত যে হৃদয় ভ'রে,

দেখ তার গানের বীণা ধূলায় পড়ে।

আজ সব হারানোর নীরব ব্যাথ্যায়

কাঁদে গো যায় প্রাণ,

বল ওগো কেমন করে

গাইবে সে তার গান।

মিছে ফাগুন বেলার হাসিতে তার

সুরের ভুবন ছাইতে বল?

'স্বরলিপি' কথাচিত্র গান।। শিল্পী : গীতা দত্ত ।। সুর : হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১১৮)

৮০

বেদনার মত কি আছে মধূর আর

অশ্রু সাগরে খেয়াতরী বেয়ে

তাইতো মানিনি হার।

কত সুর যেন বাজেনি বাঁশীতে মোর

শুধু ঝরে ব্যথা করুণ হাসিতে মোর

কত তারা হায় ঝরিল আকাশে

কে রাখে ঠিকানা তার ॥

এ ভুবন মোর কাঁদে যে রিক্ত হয়ে

ঝরে জায় মোর মালার গ্রন্থি

শিশিরে সিক্ত হয়ে।

কত কথা যেন পারিনি বলিতে হায়

যে প্রদীপ মোর জানেনা জলিত হায়

তারই চারিপাশে এ জীবন শুধু

ঘনালো অন্ধকার ॥

শিল্পী : উৎপলা সেন ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৫১)

৮১

তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই

বাতাসেও নেই সাড়া।

জেগে জেগে যেন কথা বলে ঐ

দূর আকাশের তারা।

দুজনেই কাছে তবু যেন কতদূর

মুকুলের কানে মৌমাছি আনে সুর

তোমার আঁখির পলবে মোর

আঁখি যে নিমেষ হারা।

তোমার আমার মতনই যেন গো

এ রাতের ভাষা নাই

কথা হারা এই স্বপ্নের মাঝে

নিজেরে হারাতে চাই।

জানিনা তো কেন দিলে তুমি মোরে ফুল

এ রাতের শেষে মনে হবে সে তো ভুল

হাসি দিয়ে যার শুরু হয় সেতো

আঁখিজলে হয় সারা।

শিল্পী: হেমন্তমুখোপাধ্যায় ॥ সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬১)

৮২

তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের

লজ্জা জড়ানো ছন্দ ওগো,

তুমি যে আমার আকাশ ভরানো

তারাময়ী শুভ মিলন রাতি।

তুমি যে আমার স্বপ্ন পিয়াসী

বকুল মালার গন্ধ ওগো।

তুমি যে আমার ফাগুন বেলার

রঙে রসে ভরা ধরায় হাসি,

তুমি যে আমার পরাণের গোঠে

গোকুল মাতানো শ্যামের বাঁশী।

তুমি যে আমার মানসী রাধার

প্রণয়ের ফুল-বন্ধ ওগো।

তুমি যে আমার মুক্তিতীর্থ

অসীম আকাশে পথের দিশা।

তুমি যে আমার অন্তর্যামী

সুন্দর আনন্দ ওগো।

তুমি যে আমার অশ্রু মুছায়ে

ঘুচাও সকল দ্বন্দ্ব ওগো।

'ভালবাসা' কথাচিত্র ।। শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। নাচিকেতা ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৬৬)

৮৩

এই বেশ ভালো লাল সাদা কালো

হাসি আর আলো

নাড়া দিল এই মনটায়

এই বেশ খাসা প্রাণ খুলে হাসা

ঠুং ঠাং ভাষা

রিকশার ওই ঘন্টায়।

ট্রাম চলে বাস চলে সব বাঁকাপথে-

নেই তাতে ভুল তো,

আমি যদি চলি সোজা পথে দেখি তাতে

Dhaka University Institutional Repository

ফলটি হয় উল্টো।

ঘোড়া চলে, গরু চলে, ঐ গাধা চলে

তারও আছে দাম রে,

আমি যদি চলি তবে তার পানে,

উল্টো বুঝলি রাম রে।

ফাঁকি চলে, ঘুস চলে, মেকি টাকা

সেও চলে যায় রে,

আমি শুধু চিরদিনই পিছে কেন

পড়ে থাকি হায় রে।

'পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট' কথাচিত্র।। শিল্পীঃ হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৭২)

৮৪

মৌ বনে আজ মৌ জমেছে-

বৌ কথা কও ডাকে,

মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে।

ছন্দ ভরা গন্ধ ধরা এ এক নতুন বেলা–

আমায় কে আর আজকে ধরে রাখে।

নতুন নতুন সুরে পাখীরা গায়–

নতুন নতুন ফুলে রঙ ভরে যায়,

তাদের ঘিরে প্রজাপতি

পাবার স্বপ্ন আঁকে ॥

নতুন নতুন খুশি হৃদয়ে পাই–

নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই,

উকি দিল সূয্যি সোনা

ভাঙা মেঘের ফাঁকে।

Dhaka University Institutional Repository

আর নতুন কিছু পাবো এবার

জীবন পথের বাঁকে ॥

‘বন্ধু’ কথাচিত্র ।।শিল্পী : হেমন্তমুখোপাধ্যায় ।। সুর: নচিকেতা ঘোষ।

৮৫

তুমি আর ডেকোনা পিছু ডেকোনা

আমি চলে যাই শুধু বলে যাই

তোমার হৃদয়ে মোর স্মৃতি রেখোনা।

আঁখিজল কভু ফেলোনা

নিবিড় আঁধারে একা

নেতা দীপ আর জেলোনা

পথ চেয়ে আর থেকো না।

জানি মোর কিছু রবে না

তোমার আমার দেখা

এ জীবনে আর হবে না

আমার এ চলে যাওয়া চেয়ে দেখ না।

অকারণে ব্যধা পেয়োনা

হারালে যাহারে আজ

তারে আর ফিরে চেয়ো না

বেদনার হাসি ঢেকোনা।

সুর ও শিল্পী : মান্না দে।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ১৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

৮৬

তোমাদের গানে সভায় এসেছি

এই তো প্রথম গান শোনাবো বলে।

হবো যে ধন্য আমি

তোমরা সবাই খুশি হ'লে ৷৷

সুরের এই খেয়াতরী বাইতে গিয়ে

কেন যে কণ্ঠ কাঁপে গাইভে গিয়ে

আমকে ভুল বুঝে কি–

যাওগো চলে!

গাইতে গিয়ে শুধু মনে জাগে ভয়

ক্ষমা কি করবে নাগো যদি ত্রুটি হয়।

কিছু তো বিনিময়ে চাই না আমি

শুধু যে তোমারই মন পাইনা আমি

চাও কি ধূপের মতই–

যাইগো চলে ৷৷

ছবি: 'প্রতিবাদ' কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।। সুর: শ্যামল মিত্র।। শিল্পী : বনশ্রী সেনগুপ্ত।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০৮)

৮৭

সোনাতে কলঙ্ক হবে না

তবে কেন, সোনার অঙ্গে

কলঙ্ক লাগে।

যদি জোছনাই দেয় চাঁদ।

অপবাদ কেন তার কলঙ্ক দাগে ৷৷

মেঘের কালো ছায়া

পড়ুক না তাজমহলের গায়

তাতে শুভ্র প্রেমের বল কি আসে যায়,

কালো প্রেমের গানে শ্বেতপদ্ম জাগে

তবে কেন, সোনার অঙ্গে

কলঙ্ক লাগে।

তোমাকে ভালবেসে

কলঙ্কের অলঙ্কারে ভরে।

কৃষ্ণ প্রেমের রাধা

কালো হল কলঙ্কেরই বিষে,

কালোতে সাদা ঐ গেল যে মিশে,

জ্বালা ছাড়া মালা কে

পায় অনুরাগে

তবে কেন সোনার অঙ্গে

কলঙ্ক লাগে।

শিল্পী : মান্না দে সুর: নীতা সেন

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৩১)

৮৮

আমার সবটুকু ভালবাসা

তোমাকেই দিলাম তুমি নিয়ে যাও

আমার আনন্দ আলো আশা

তোমাই দিলাম তুমি নিয়ে যাও।

আমার ধুপেরই গন্ধে

সুরভিত হও তুমি

তুমি তো আমারি ওগো

অন্য কেউ নও তুমি

আমার না বলা গোপন কথা

তোমাকেই দিলাম তুমি নিয়ে যাও।

তুমি সুখী হও সুখে থাকো

জীবনকে উৎসবে ভরে রাখো।

জেনে রেখো তুমি মায়া

আমি ছায়া পিছে তার

তুমি প্রদীপের আলো

আমি অন্ধকার নীচে তার

আমার আনন্দ আলো আশা

তোমাকেই দিলাম- তুমি নিয়ে যাও।

'সোনার বাংলা' কথাচিত্র ।। শিল্পী : হৈমন্ত্ৰী শুক্লা ।। সুর : নীতা সেন ।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৩৯)

৮৯

আগামী বসন্তেবুক ভরা গান নিয়ে

আসবো আবার তোমার কাছে আসবো আমি

নয়তো কোনও হলুদ অঘ্রানে

মাঠ ভরা ধান নিয়ে

আসবো আবার তোমার কাছে ॥

কে বলেছে আসবে না আর

নদীর সাঁকোটা হয়ে পার

আবার আসবো আমি আমের বোলের ঐ

মনকাড়া ঘ্রান নিয়ে

আসবো আবার তোমার কাছে।

তোমাদের উঠোনে ঐ যেখানে

চড়ুই পাখীরা এসে খুদ খুটে খায়

সেখানে আসবো ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদেরি চেনা শব্দ তুলে দুটি পায়।

ফিরবোনা আর ভাবাটাই ভুল

ভরিয়ে নদীর দুটো কূল

আবার আসবো আমি বৈশাখের মরা স্রোতে

জোয়ারের বান নিয়ে

আসবো আবার তোমার কাছে ॥

শিল্পী : নির্মলা মিশ্র। সুর : নীতা সেন।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪২)

৯০

কবিগুরু তোমার মত লিখবে কে সেই গান

যার, সুরের আগুন এই দেশেরি প্রেরণা

আর প্রাণ ॥

গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল কোথায় গেলে তুমি

তোমার গানের ধন ধান্যে ভরাও জন্মভূমি!

কান্ড়-কবি শান্তকেন কণ্ঠ তোমার ক্লান্তকেন

আনো, হৃদয়ে আজ তোমার সুরের বাঁধ-ভাঙা

সেই বান ॥

কবিগুরু তুমি তো নেই লিখবে কে সেই গান

যার, সুরের আগুন এই দেশেরি প্রেরণা

আর প্রাণ ॥

অতুলপ্রসাদ কোথায় তোমার সেই গানেরি বেশ

যা, ধর্মে-কর্মে মর্মে মর্মে জাগিয়েছিল দেশ।।

কোথায়, মুকুন্দদাস তোমার সে গান রক্ত

দিয়ে লেখা।

দেশকে ভালবাসা সে তো তোমার

Dhaka University Institutional Repository

কাছেই শেখা।

মুকুন্দদাস কোথায় সে গান রক্ত দিয়ে লেখা ।।

নজরুল সেই ছন্দ-গানে বজ্র জাগাও অন্ধপ্রাণ

তোমার, অগ্নিবীণার সুরে হৃদয় করুক সূর্যস্নান।।

আমরা কি কেউ ভুলতে পারি তোমাদেরি গান

সেই গানে আবার আগুন-ভরা মন্ত্র কর দান।।

শিল্পী : সুধীন সরকার ।। সুর: নীতা সেন।।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৪৬)

৯১

চোখে চোখে কথা বলো

মুখে কিছু বলো না

মন নিয়ে খেলা কর

এ কি ছলনা।

ঘুরে এসে যাও দূরে

যাওয়া তবু হয় না

ফুলে কাঁটা সয় যদি

মনে কেন সয় না?

মরীচিকা হয়ে জ্বলো

তারা হয়ে জ্বলো না।

ভুলে থাকা ষেত যদি

ভালো হতো হায় গো

চাও কি গো ভরা নদী

মরু হয়ে যায় গো

সাগরের পথে তাকে,

ডেকে নিয়ে চল না।।

শিল্পী : আশা ভোঁসলে।। সুর: রাহুল দেব বর্মন।

(গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২৫৪)

৯২

মাগো ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই 'মা'
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।।
আমরা হারবো না হারবো না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বোনা
আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি।।
আমরা অপমান সাইবোনা
ভীরুর মতো ঘরের কোণে রইবো না
আমরা আকাশ হতে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি।।

শিল্পী ও সুর : হেমন্তমুখোপাধ্যায়।। কথা: গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ।।

(এই গানটি ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।)

৯৩

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ ॥
সেই সবুজের বুকচেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবে
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার খনি ॥
বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,

জীবনানন্দের রূপসীবাংলা,

রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।

‘জয়বাংলা’ বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,

আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,

অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।

কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ।। সুর : অংশুমান রায় ।।

(উৎস: ভাষা ও দেশের গান : ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ২০০৫:৮৭)

(এই গানটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।)

৯৪

আমার এই জন্মভূমির মতন বল

কে আছে আর।

মাটি মা যে সবার আপন

নেই তুলনা তার।

হাসবো মায়ের সকল সুখে

তার দুঃখ যত নেবো বুকে

ভয় পাবো না জীবন দিতে

আসুক অন্ধকার।

আমার মায়ের কোলের মত

শান্তি কোথায় আছে

মায়ের পুণ্য নামে ধন্য হয়ে

জীবন যেন বাঁচে।

এমন মাকে ভালোবেসে

যেন কাটে জনম শুধুই হেসে

মা যে স্বর্গাদপি গরিয়সী

এই বুঝেছি সার ।

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৯৫

এ দেশের একটি গানও কবিতা

এ মাটির একটি ধানও কবিতা

আকাশে তুলির টানও কবিতা।

এ মাটির সবুজ হাসিও ছবি

রাখালের মেঠো বাঁশীও ছবি

এ দেশের একটি প্রাণও কবিতা

এ মাটির রূপের দানও কবিতা

এ মাটির সোনালী মাঠও স্বপ্ন

এ দেশের খেয়ার ঘাটও স্বপ্ন

এদেশের গঞ্জ হাটও স্বপ্ন

এ দেশের নদীর কুলও ছবি

এ মাটির একটি ফুলও ছবি

আর তার মধুর প্রাণও কবিতা।

সুর: নীতা সেন শিল্পী: দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১৬)

৯৬

বড় বৌ কুট্‌নো কোটে

মেজো কাটে মাছ

সেজোর মুখে খৈ ফোটে

চুলোতে দেয় আঁচ।

রাঙা বৌ বাটনা বাটে

ছোট বৌ গড়ায় খাটে

দেমাকে তার ঝিলিক্ মারে

নাকছাবির ঐ কাঁচ ॥

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১১)

৯৭

সবাই করে দুর দুর, বুক করে দুর্‌দুর

গন্ধ যে ভুর ভুর, পেট করে গুড়্‌মূড়্‌

নেশাতে চুরচুর, দাঁত করে সুরসুর

পথটা যে ঘুরঘুর, গাছ পড়ে হুড়্‌মুড়্‌

পাতা ঝরে ঝুর ঝুর, খোকা করে ঘুরঘুর

হাওয়া বয় ফুরফুর ॥

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ :১১১)

৯৮

মিষ্টি কথা, মুখ নষ্ট

ধান নষ্ট পোকাতে

হায়রে কপাল দেশটা হল

নষ্ট বুড়ো খোকাতে

অভাবে যে স্বভাব নষ্ট

ব্যবসা নষ্ট বোকাতে

কথার দোষে কাজ নষ্ট

ভিক্ষায় নষ্ট মান

স্ত্রীর দোষে ঘর নষ্ট

চুনে নষ্ট পান।

মেঘের দোষে চাঁদ নষ্ট

ঝড়ে নষ্ট ফুল

নদী যে তার বন্যা দিয়ে

নষ্ট করে কুল।

বেসুরো ঐ গলার দোষে

নষ্ট যে হল গান।

পাখীর দোষে ফল নষ্ট

অভাবে নষ্ট মুখ।

(গৌরীপ্রসন্ন ২০০৩ : ১১২)

৯৯

আজ আছি কাল কোথায় রব-

কোথায় রব কে জানে,

কাল কি হবে তাই ভেবে আজ

মিছেই কেন আকুল হবে।

আনন্দ আর গানে

এই ক'টি দিন কাটিয়ে যাও,

জীবনেরি পানশালাতে

উৎসবে প্রাণ মিশিয়ে নাও।

ক্ষণিক হলেও দুজনারে

দুজন চিনে লব।

তুমি আমি রব না কেউ

আয়ুর প্রদীপ হবেই ক্ষীণ,

তাই তো বলি হেসে খেলে

এন ভরিয়ে যাক না দিন।

আছি দুজন সবার হেয়ে

এই তো অভিনব।

(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ২০)

Dhaka University Institutional Repository

১০০

আকাশ মাটি ঐ ঘুমাল

ঘুমায় রাতের তারা।

তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে

হঠাৎ জাগায় সাড়া।।

ঝিরি ঝিরি বাতাস এলো ঝরা পাতার বনে

স্রোতের মতন স্বপ্ন এলো মনে

হৃদয় আমার কেই বা জানে ওগো

বল আমি ছাড়া।।

ওগো আমার স্বপন দোসর বল কিবা চাও

ছায়ার মত ছুঁয়ে আমায় ব্যথা কেন পাও

ঝরা পালে তরী কিগো বল

হবে স্রোতে হারা।।

জ্বল জ্বল তারার প্রদীপ ঐতো নিভে আসে

আর জলে ভরা নয়ন আমার হাসে

এত পেয়েও মাঝপথে কেন

ঘারায় তবু ধারা।।

(গৌরীপ্রসন্ন ১৯৯২ : ২১)

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

cjK e‡›‘¨vcva¨v‡qi wbewPZ Mvb msKjb

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়|| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

cjK e‡›'¨vcva¨v‡qi wbewPZ Mvb msKjb

১

আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো
আমি হারিয়ে যাব তোমার সাথে
সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে
কিছু সময় রেখো তোমার হাতে!
কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্প শোনা
ছিল কল্পনা জাল এই প্রাণে বোনা
তার অনুরাগের রাঙা তুলির ছোঁয়া
নাও বুলিয়ে নয়ন পাতে।
তুমি ভাসাও আমার এই চলার স্রোতে
চিরসাথী রইবো পথে;
তাই যা দেখি আজ সবি ভালো লাগে
এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে
কেন দিনের আলোর মত সহজ হয়ে
এলে আমার গহন রাতে??

শিল্পী: লতা মুঙ্গেশকর।। সুর: সুধীন দাশগুপ্ত।। ছবি: 'শঙ্খবেলা'।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১)

২

সূর্যের মতো শাশ্বত হোক পৃথিবীর ইতিহাস
সাগরের মত নির্মল হোক জীবনের বিশ্বাস!
মিলন অভয় বাণী
পথের পাথেয় মানি
দু' চোখে নামুক নতুন দিনে নির্মেঘ নীলাকাশ!

Dhaka University Institutional Repository

আগুনের মত কখনো দারুণ

দীপ্ত দহন দানে

যা আছে বেদনা পুড়ে হোক সোনা

গহন গভীর প্রাণে;

আলোর বন্যাধারা

ভাঙুক অন্ধ কারা

মুক্ত হাওয়ায় নিল যে বুক ভরা নিশ্বাস!!

শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।। : হংস মিথুন’

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪)

3

উদাস উদাস দুপুরে ঝরা পাতার নূপুরে

ডাহুক ডাকা মাঠ পেরিয়ে একলা যেয়োনা!

কাউকে কিছু না বলে বাতাস ভরে আঁচলে

পঙ্খী হয়ে ও সোনা বৌ, উড়তে চেয়ো না!

সোনা বৌ, গাঁয়ের সীমা ছাড়ালে

বিজন পথের আড়ালে

ওই পাঁজরের পিঞ্জরে মন ফিরবে না আর হারালে

ডাগর কালো নয়নে অমন বিনা কারণে

নয়নতারা ফুল ফুটিয়ে স্বপ্ন তুমি ছোয়োনা!

সোনা বৌ, ঘরের আগল খুলোনা

বাঁশীর ডাকে ভুলোনা

ময়ূর-মুখী হাতের বালায় রিনিক্ রিনিক তুলোনা

ও ভাবে গুনগুনিয়ে যেওনা কিছু শুনিয়ে

শুনতে পারে রসিক ডাকাত ওভাবে গান গেয়োনা।।

শিল্পীঃ নির্মলা মিত্র।। সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫)

৪

দেহেরই পিঞ্জিরে প্রাণপাখী কাঁদে
প্রাণেরি পিঞ্জিরাতে মন
মনেরি পিঞ্জিরায় আশা কাঁদে সারাক্ষণ!
ভালোবাসা কেঁদে মরে তোমায় পেয়ে কাছে
সবি কেন যায়না দেওয়া হৃদয়ে যা আছে
প্রেম সাগরে ডুবে কাঁদে ছোট্ট এ-জীবন!
সরম কাঁদে চোখের পাতায়
যায়না দেখা ভালো
রূপের জ্বালায় কেঁদে জ্বলে
যৌবনেরি আলো;
অধর কোণে ভাষা কাঁদে 'বলি বলি' করে
সত্যি হওয়ায় স্বপ্ন কাঁদে আশার খেলাঘরে
বিধিলিপি লেখায় কাঁদে জীবন মরণ।।

শিল্পী: মুকেশ।। সুর: রতু মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬)

৫

আবার নতুন করে
ভুলে যাওয়া নাম ধরে ডেকোনা
হারানো স্বপন চোখে এঁকোনা!
ঝরা মালা বুকে তুলে নিয়ে
স্মৃতির সুরভি ঢেলে দিয়ে
ফাগুনের গান মনে রেখোনা!
আবার মধবীলতা
বাতাসে চেয়োনা তুমি দোলাতে

যে-ব্যথা নিয়েছি মেনে

অকারণে এসোনা তা' ভোলাতে!

যে-আশা হয়েছে জানি মিছে

শুধু আলেয়ার পিছে পিছে

সমব্যথা দিয়ে তারে দেখোনা!!

শিল্পীঃ মুকেশ।। সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬)

৬

মনে করো আমি নেই

বসন্ত এসে গেছে

কৃষ্ণচূড়ার বন্যায়

চৈতালী ভেসে গেছে!

শুক্লাতিথির ওই ছায়াপথে

চলছে নতুন রাত মায়া-রথে

তুমি অবাক চোখে চেয়ে অপলকে

ভাবছো ভালো কে বেসে গেছে?

যেন মনে লাগে দোলা সেই

দোলা লাগে বিনা কারণেই

শুধু মনে কারো আমি নেই;

হঠাৎ খুশীর ওই রঙিন পাখী

হাওয়ায় লেখে তার ডাকাডাকি

তুমি সেই লগনে ভাবো আপন মনে

আমার হাসিই সে হেসে গেছে!!

শিল্পীঃ সুমন কল্যাণপুর।। সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭)

Dhaka University Institutional Repository

৭

দুরাশার বালুচরে
একা একা আজো গান গাই
প্লাবনের ঢেউ আসে
তবু আমি ঘর বেঁধে যাই।।
মহ হয় ভাঙনের তীরে
আবার এসছো তুমি ফিরে
আমার হারানো নাম খুনে আমি চোখ মেলে চাই।।
সযতনে রাখি সেই মালা
মানিনা ঝরেছে ফুল
দেখিনা কাঁটার ভুল
লাগেনাতো বুকে কোনো জ্বালা;
যেখানেই থাকে তুমি শোনো
অনুযোগ রাখিনিতো কোনো
আকাশে প্রদীপ জ্বলে
অন্তরে আলো আমি পাই।।

শিল্পী: সুমন কল্যাণপুর।। সুর: রতু মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭)

৮

দরদী গো
কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম
সাধের প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে
নিজেই আমি পুড়ে গেলাম!
সুখ নামে শুকপাখীটায় ধরতে গিয়ে
কিনেছি সোনার খাঁচা

যা কিছু সব বিকিয়ে

সোনার শিকল কেটে দিয়ে হায়

সে-পাখী আমার যায় উড়ে যায়

ভাবিনি সেই সে-আশার এই পরিণাম!

ভুল কী সে না- জেনে যাই মাশুল দিয়ে

হিসাবের শূন্য আমার

মেলেনি সব হারিয়ে;

ললাট-লিখন লিখে বিধাতা

নাম কিনেছে ভাগ্যদাতা

রাখি সেই দাতার পায়ে হাজার প্রণাম!!

সুর ও শিল্পীঃ মান্না দে (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭)

৯

এইতো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে

আমার অবুঝ বেদনা

দুটি হাত ধরে আমি তোমায় বলেছি

এ শুধু আমার তুমি কেঁদোনা।।

তোমার প্রেমের কাছে চিরঋণী করে

আরো কী চেয়েছো দিতে এ-হৃদয় ভ'রে

কণাটুকু তার আমি শুধিতে পারিনি

ব্যথা দিয়ে তাই আর বেঁধোনা।।

অনেক হারাতে হোলো জীবনে তোমার

সেই অপরাধে আমি অপরাধী

এবার একলা আমি কাঁদি;

বিদায় নেবার আগে শুধু বলে যাই

তোমার ক্ষমার মাঝে পাই যেন ঠাঁই

Dhaka University Institutional Repository

স্বরলিপি ভুল করা শেষের এ-গান

স্মৃতির বীণায় আর সে ধোনা।।

সুর ও শিল্পীঃ মান্ন দে।। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৮)

১০

কোনো কথা না বলে

গান গাওয়ার ছলে

এই যে সুরের সাথী জুটলো তাতে ক্ষতি কী হলো?

বিনা আমন্ত্রণে আজ চোখের কোণে

ওই যে অবুঝ হাসি ফটলো তাতে ক্ষতি কী হলো?

আকাশে যে মেঘ ছিল এতো দিন

সে কেন আজ হলো স্বপ্ন রঙিন

আজ তারই বুকে কোন মধুর সুখে

সাতরঙ্গ রামধনু উঠলো তাতে ক্ষতি কী হলো?

এতো বাঁধন নিল নয়ন দেখে যায় তবু যদি স্বপ্ন

তাতে দোষী কে বলো?

কেউ কি জানে কোন সে দিনে আসবে কখন শুভলগ্ন?

হার মেনে যদি মেলে রত্ন মালা

জয় করে চাইনা এ-কাঁটার জ্বালা

কিছু পাওয়ার আগে মধু অনুরাগে

এই যে মানের বাধা টুটলো তাতে ক্ষতি কী হলো??

শিল্পীঃ মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুরঃ গোপেন মল্লিক।।

ছবিঃ জীবন মৃত্যু। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০)

১১

নতুন নতুন রঙ ধরেছে সোনার পৃথিবীতে

যেন ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে নীল আকাশের গায়

আমায় দেখতে দাও আমায় দেখতে দাও!

ওই মন ভোলানো রামধনু-রঙ দেখতে দাও!

দু' চোখ ভওের দেখবো আমি শিশুর মুখের হাসি

বুক ভরানো হে মায়া স্বপ্ন রাশি রাশি

সব পেয়েছির স্বর্গ আমার মাটির সীমানায়।

এ-মন আমি বিছিয়ে দিলাম

সবার চলার পথে

তোমরা এসো খোলা হাওয়ার

খেয়াল খুশীর রথে;

আএন্দর এই নতুন দেশে সাতশো তলা গ'ড়ে

সুখে থাকে তোমরা সবাই পরকে আপন ক' রে

আমায় দিও একখানি ঘর নীচের মহলায়

সুর ও শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

ছবি: অজানা শপথ।। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০)

১২

আমি তোমার কাছেই ফিরে আসবো

তোমায় আবার ভালোবাসবো

তুমি কি ডাকবে মোরে

চেনা সে নামটি ধ' রে?

জীবনের এই পথ আঁকাবাঁকা হয় হোক

হোক্না সে বন্ধুর

ঠিকানা লিখে যাক্ ওই দুটি কালো চোখ

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রিয় বন্ধুর

চেনা সে নামটি ধরে তুমি কি ডাকবে মোরে?

তুমি দিলে সে-কথা পাখী নিয়ে গায়

আকাশের নীল স্বপ্নে আলো হ' য়ে যায়;

পৃথিবীর যত সুখ যত কিছু ভালো তার

সব নিয়ে চলে যাই;

দুজনার দুটি মন চিরতরে একাকার

এই শুধু বলে যাই!

চেনা সে নাম-টি ধরে তুমি কি ডাকবে মোরে??

শিল্পী শ্যামল মিত্র।। সুরঃ রাজেন সরকার।।

ছবিঃ বালুচরী।। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১)

১৩

আরো কিছু রাত তুমি জাগতে যদি

দেখতেগো সব তারা জ্বলছে

মিষ্টি কথা চাঁদ বলতে জানে

তুমি শুনতে পেলেনা!

একটু পরেই ওই নদী কূলে কূলে জোয়ার পেলো

একটি সাগর জলরঙে ওই ছবি রাঙিয়ে গেলো

তাই আমি জেগে জেগে একা একা দেখি

তুমি দেখতে এলেনা!

মন থেকে অনুরাগ

আনতে আনতে আনতে

পড়লে যে তুমি ঘুমিয়ে

পারলে না কিছু জানতে;

একটু ছোঁয়ায় কোন্ আশা মনে মনে সত্যি হোতো

একটু শোনায় কোন কথা লাগতো সেয সোনার মতো

ভাবনার পথে পথে চুপি চুপি তুমি তারে জানতে গেলেনা!!

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।। সুর: রাজেন সরকার।।

ছবি: বালুচরী।। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১)

১৪

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু প্লিজ্ প্লিজ্ ডোন্ট টাচ্

তাড়াতাড়ি করে বাড়াবাড়ি করে

কাড়াকাড়ি করে

ভেঙোনা ভেঙোনা বঁধু প্রেমের রঙিন কাঁচ!

ধীরে ধীরে এগোও না রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে

আধো আধো বাধো বাধো মিঠি মিঠি কথা কয়ে

যেন এখনি হয় না শুরু মনের ময়ূর নাচ!

বিন্দু বিন্দু জলে হয় যে সাগর

তিলে তিলে যে প্রেম বাড়ায়

মহাজনে বলে তাকে রসিক নাগর;

হেসে হেসে কাছে এসে কিছু বলো কানে কানে

কিছু বলো দূরে থেকে সুরে সুরে গানে গানে

বঁধু প্রণয় সাগরে হোয়ো গভীর জলের মাছ!!

শিল্পী: মান্না দে।। সুর: গোপেন মল্লিক।। ছবি: তিন অধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২)

১৫

ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি

ভালবাসবে?

Dhaka University Institutional Repository

পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে

কী করে এখানে তুমি আসবে?

ক’ টা রাত কাটিয়েছো জেগে

স্বপ্নের মিথ্যে আবেগে

কী এমন দু:খ কে সয়েছো যে তুমি

এতো সহজেই হাসবে?

হাজার কাজের ভীড়ে

সময় তো হয়নি তোমার

শোনোনিতো কান পেতে

অস্ফুট কোনো কথা তার;

আজ কেন হাহাকার করো

সে-কথায় ইতিহাস গড়ো

কী সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছো যে তুমি

সুখের সাগরে ভাসবে??

শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪১)

১৬

গানে গানে কতবার এই কথা কয়েছি

আমরা দুজনে শুধু দুজনার

এই গান শুনে ওরা দিয়ে গেছে অপবআদ

হাসিমুখে তাই আমি সয়েছি!

আমার ফুলের বনে ফাগুন তুমিই

আমার প্রাণের দীপে আগুন তুমিই

পৃথিবীর ফাগুনের প্রদীপ না দেখে তাই

মনের ভুবনে চেয়ে রয়েছি!

Dhaka University Institutional Repository

দেখুক সকলে ওরা আকাশে ইন্দ্রধনু জেগেছে

তোমার নয়নে আমি অপলকে চেয়ে দেখি

সেখানে কত যে রং লেগেছে;

তোমার প্রেমেই যদি পেলাম সবই

কেন গো হব না তবে তোমারি কবি

সে প্রেমের গান গাওয়া হয় যদি অপরাধ

জেনো আমি অপরাধি হয়েছি!!

শিল্পী: উৎপলা সেন।। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৮)

১৭

ভেবে কে আর ভাব করে হে

ভাব করে স্বভাবে

ছেড়ো না এই ভাবের নেশা

আনন্দেরি অভাবে!

পারো যদি কোনো মতো

সেই ভাবের ভাবুক হতে

জুড়াবে মনের জ্বালা

ভালোবাসার প্রভাবে!

তবু তো কেউ জানে না হে

সে জন কেন চলে যায়

মন যে শুধু পড়ে থাকে

মন-হারানোর যন্ত্রণায়

ভাবের ঘরে দিয়ে চাবি

যতই কেন হও হিসাবী

সাড়াতো মিলবে না আর

আসল কথার জবাবে!!

শিল্পী: মান্না দে।। সুর: সুধীন দাশগুপ্ত।। ছবি: নিশিকন্যা।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৪৯)

১৮

এমন অনেক কথাই বলো তুমি
মন থেকে যা বলো না
আবার অনেক তোমার সত্যি কথা
আমি ভাবি ছলনা!
রেশমি চুড়ির আওয়াজ দিয়ে
কত কথা যাও যে বলে
কত কথা বলে ওঠো
কালো চোখের ওই কাজলে
আবার কত কথা বরি বলি
করেও কিছু বলো না!
ভালোবাসার কোন কথাটির
কী যে আসল মানে
ভালে যারা বেসেছো গো
তারাই শুধু জানে
তাইতো যখন শপথ করে
বললে ভালো বাসবে না আর
শুনেই আমি বুঝে নিলাম
তুমি হলে আরও আমার
তুমি প্রেমের পুঁথি পড়েই গেলে
অর্থ জানা হলো না!!

সুর ও শিল্পী: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫০)

Dhaka University Institutional Repository

১৯

এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না

যাতে মুক্তো আছে

এমন কোনো মানুষ খুঁজে পেলাম না

যার মন আছে!

শুনে গেলাম অনেক কথা

অনেক গল্প অনেক গাথা

এমন একটি কথা খুঁজে পেলাম না

যাতে সত্যি আছে!

পথেই শুধু পথ হারালাম

নিরুদ্দেশে গেলাম না;

ভালোবাসা অনেক পেলাম

ভালোবাসা পেলাম না;

স্বপ্ন অনেক গেলাম দেখে

রোদ বৃষ্টি নামলো চোখে

এমন একটি আশাও খুঁজে পেলাম না

যার অন্ত আছে!!

শিল্পী: নির্মলা মিত্র।। সুর: নচিকেতা ঘোষ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৪)

২০

আজ আবার সেই পথেই দেখা হয়ে গেলো

কত গান কত সুর মনে পড়ে গেলো

বলো ভালে আছো তো?

ক’ দিন আগে এমন হলে

আরও ক’টা দিন বেশী পেতাম

Dhaka University Institutional Repository

আরও আকাশ আরও বাতাস

লিখে দিতো তোমারই নাম

শুধু আমি নয় ওরাও সবাই

ডেকে ডেকে বলে বলে যেতো।

বলো ভালো আছো তো

জানি তোমায় আপন ভাবার

কোনো অধিকার নেই যে গো আর

এও জানি দেখা হওয়াই

কত বড় ভাগ্য আমার

শুধ বলো আজ আমায় ভুলে

সুখী তুমি হয়েছ কত?

বল ভালো আছো তো??

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৫৫)

২১

কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায়

কী কথা রাখলে বাকী

খুঁজে দ্যাখোনা তাকি জানো না?

ভেবে দ্যাখোনা তাকি জানো না?

কিছু না বলে চলে গিয়ে মনকে দিওনা ফাঁকি!

তোমার চোখের আলোয় আমি

এ মন করেছি আলো

আমার বালোবাসায় তুমি

আকাশ প্রদীপ জ্বালো

প্রিয় ভাষিণী কথা রাখো নি

আশায় আশায় কত যে আর   শুধুই বসে থাকি!

আজ কী তোমার স্বপ্ন দেকার

সময নিয়ে নিয়ে

যায়যে সব হারিয়ে;

তোমার প্রথম ডাকে আমি

অনেক দিয়েছি সাড়া

তোমার মনের ছায়ার আমি

ঘুরে ঘুরে দিশাহারা

প্রিয় ভাষিণী কথা রাখোনি

ফাগুন এসেও   অজান্তে আজ

হলো কি বৈশাখী??

শিল্পী : মান্না দে।।   সুর: সুধীন দাশগুপ্ত।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৬১)

২২

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না

ও বাতাস আঁখি মেলো না

আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে।

আহা   কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে!

তার   সময় হলো আমায় মালা দেবার

সেযে   প্রাণের সুরে গান শোনাবে এবার

সেই সুরেতে ঝর্ণা তুমি

চরণ ফেলোনা।

ও পলাশ ফিরে চেয়োনা

ও কোকিল তুমি গেয়োনা

লাজুক লতা হয়তো গো লাজ পাবে

Dhaka University Institutional Repository

তার মখের কথা বুকেই রয়ে যাবে;

তার অনেক ভীরু স্বপ্ন জাগে আশায়

আহা হৃদয় মাঝে সুরের খেয়া ভাসায়

দোহাই বকুল ছন্দে তাহার

গন্ধ ঢেলোনা!!

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৫)

২৩

কারে আমি এ ব্যথা জানাবো

মরমিয়া তুমি চলে গেলে

দরদী আমার কোথা পাবো?

কে বলো আর শুনবে এ-গান

রাঙিয়ে দেবে আমার এ-প্রাণ

শিউলি ফুলের মালা গেঁথে

কারে পরাবো?

বোলো না গো বিদায়ের বারতা

মনে আমার সইবেনা তো

সে-ব্যথা;

কে আছে আর বন্ধু আমার

দু:খ সুখের কথা শোনার

কার নয়নের আশা নিয়ে

হৃদয ভরাবো?

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

২৪

তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা

তাই এতো গান গাওয়া

এতো কাছে থাকা

নীরব মনের নিভৃত দেখেছি!

সুদূরাকাশে জ্যোছনা হাসে

সাগরে বাজে বীণ

তুমি ও আমি দিবসযামী

কাটাবো সোনালী দিন

প্রজাপতিদের পাখায় পাখায়

ফুলের পরাগ মাখা।

তোমার দখিন হাতে

আমি যে বেঁধেছি রাখী

কাকলী কুজনে তাই

মুখর হয়েছে পাখী;

তুমি যে আশা সুরের ভাষা

প্রাণের গানে মোর

তোমারি তরে হৃদয় ভরে

ঝরে যে আঁখি লোর

তোমারে ঘেরিয়া মোর কবিতার

ভাবনা মেলেছে পাখা!!

শিল্পী: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।। সুর: অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

২৫

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই
পাছে ভালোবেসে ফেলো
তাই দূরে দূরে রাই।
আমার এ-পথে শুধু
আছে মরু ভূমি ধূ ধূ
আমি কী ভাবে বাঁচাবো তোমার মাধবী ওই!
কত পেয়ালা লাঞ্ছনার
আমি নীরবে করি যে পান
আর যারা সুধা নিয়ে চলে
তুমি গাও গো তাদেরি গান;
এমনি বিভেদ কত
মনে আসে অবিরত
দুটি ভিন্নজীবন যে না মিলিত হই!!

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৭৯)

২৬

নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা
বুঝিবা পথ ভুলে যায়
কুলায় যেতে যেতে কী যেন কাকলী
আমারে দিয়ে যেতে চায়!
দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে
ওই গোধূলির রঙিন সোহাগ মেশে
বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি
কী বাঁশী ফেলে রাখে হায়!

Dhaka University Institutional Repository

কোন অপরূপ   অরূপ রূপের রাগে

সুর হয়ে রয়   আমার গানের আগে

স্বপন কথাকলি ফোটে কি ফোটে না

সুরভি তবু আঁখি ছায়!!

শিল্পী: লতা ও হেমন্ত।। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।। ছবি: মণিহার।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৯১)

২৭

এ-কথা কখনও ভাবিনিতো

এমন আপন কেউ হবে

আমি ব্যথা পেলে ব্যথা পাবে

আমার সুখে যে সুখী রবে!

আকাশে ঘনালে আমানিশা

তারা হয়ে কেউ দেবে দিশা

তাও যদি ঢাকে কালো মেঘে

জ্বালাবে প্রেমের শিখা তবে!

আমার মনের কোনো হাসি

বাজাবে কখনও কারো বাঁশী

মোর মধুমাস ফিরে গেলে

ঝরে যাবে কারো ফুল রাশি;

আমার কঠিন সাধনাতে

কেউ আশা দিতে রবে সাথে

নতুন জীবন দেখাবে গো

নিরাশার ছায়া পাবে যবে!!

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০১)

২৮

আজ মনে হয় এই নিরালায়

সারাদিন ছন্দের গান শুনি

আমি এক স্বপ্নের জাল বুনি

নিজেরে হারাই সুরের মায়ায়।

বাতাসের এই আবেশে   চলে যাই অজানা দেশে

পাখীরা যেখানে শুধু   মরমের কাকলী শোনায়।

কে যেন বলে গো আমায়   আজ পৃথিবীতে নাই ব্যথা নাই

সে শুধু তুমি ওগো   এ তো কাছে আছো তাই।

জীবনের এই দোলাতে   যেন তাই হৃদয় মাতে

ফুলেরা কেন কে জানে   এতো যে সুরভি ঝরায়!!

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৩)

২৯

আবার হবে তো দেখা

এ- দেখাই শেষ দেখা নয়তো?

কী চোখে তোমায় দেখি

বোঝাতে পারিনি আজো হয়তো!

যাবার বেলায় আজ কেন যে কেবলি মনে পড়ে গো

অসময়ে নীলাকাশে কতদিন কত মেঘ ভরে গো

শপথের মালাতেও

মাঝে মাঝে কাঁটা জেগে রয় তো!

এমনোতো হতে পারে সবই তুমি খেলা ভেবে নিয়েছো

খেয়ালের অভিনয়ে আমায় কথার কথা দিয়েছো

বলো না সহজ করে আমায় পেরেছো তুমি বুঝতে

হয়নি একটু দেরী এ-গানের কোনো মানে খুঁজতে

কাছে থেকে দূরে গেলে

নেই কিছু হারাবার ভয়তো??

শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৪)

৩০

কতদিন পরে এলে   একটু বোসো

তোমায়   অনেক কথা বলার ছিল   যদি শোনো!

আকাশে বৃষ্টি আসুক গাছেরা উঠুক কেঁপে ঝড়ে

সেই ঝড় একটু উঠুক তোমার মনের ঘরে

বহুদিন এমন কথা বলার ছুটি পাইনি জোনো!

জীবনের যে পথ আমার ছিল গো তোমার ছায়ায় আঁকা

সেই-পথ তেমনি আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা

চেনাগান বাজলো যদিই বেজেই আবার থামবে কেন??

শিল্পী ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৪)

৩১

তুমি   অনেক যত্ন করে আমায় দু:খ দিতে চেয়েছো

দিতে পারোনি!

কী তার জবাব দেবে   যদি বলি আমিই কি হেরেছি

তুমিও কি একটুও হারোনি?

সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলেছো   ফুলেতে আগুন তুমি জ্বেলেছো

ফাগুনের সব কেড়ো নিয়েছো   স্মৃতিটুকৃ কেন কার কাড়োনি?

অন্তরে আলো জ্বেলে রেখে

দৃষ্টিকে গেছো শুধু আঁধারেতে ঢেকে;

নিজেকে প্রশ্ন করে দ্যাখোনা যার নাম তুমি আর লেখোনা

কেন তাকে ধরে আছো হৃদয়ে বিদায়ের পথ কেন ছাড়োনি??

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৪

৩২

সুন্দরী গো দোহাই মান কোরোনা!

আজ নিশীথে কাছে থাকো ‘না’ বোলোনা!

অনেক শিখা পুড়ে তবে এমন প্রদীপ জ্বলে

অনেক কথার মরণ হলে হৃদয় কথা বলে

না, না, চন্দ্রহারে কাজল ধোয়া জল ফেলোনা!

একেই তো এই জীবন জুড়ে কাজের বোঝাই জমে

আজ পৃথিবীর ভালোবাসার সময় গেছে কমে

না, না, একটু ফাগুন আগুন দিয়ে না জ্বেলোনা!!

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৫)

৩৩

তুমি একজন বন্ধু আমার শত্রুট্টও তুমি একজন

তুমিই আমার পূর্ণিমা রাত তুমিই চন্দ্রগ্রহণ তাই তোমাকেই ভালোলাগে

ওই দুটি হাত যেমন আমায় টেনে নিয়ে যায় মরণে

তেমনি আবার ও-হাত ধরেই ফিরে আস আমি জীবনে

যে-নয়ন জ্বালে দারুণ আগুন

বৃষ্টিও দেন সে-নয়ন!

তোমায় পেয়ে এই মনে হয় কানায় কানায় ভরেছি

এই মনে হয় সব হারিয়ে শূন্য আমায় করেছি

যে-সাপের মণি দেয়গো আলো

সেই তো করে দংশন!!

শিল্পীঃ মান্না দে সুরঃ নচিকেতা ঘোষ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৬)

৩৪

আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে নিশুতি রাত গুম্‌রে কাঁদে

আমার মনের ময়ূর মরেছে ওই ময়ূর মহলেই

দেখি মুকুটটাতো পড়েই আছে রাজাই শুধু নেই!

ওই দরবারে তার ছিল আমার সোনার সিংহাসন

আমি হাজার হাতের সেলাম পেলাম পেলাম নাতো মন

আজ মখমলের ঐ পর্দাগুলো ওড়ায় শুধু স্মৃতির ধূলো

ফুলবাগানের বাতাস এসে আছড়ে পড়ে যেই!

আমার নাচ ঘরে যেই পাগল হোতো ঘুঙুর তোমার পায়

আমি ইরানদেশের গোলাপ ছুঁড়ে দিতাম তোমার গায়।

তুমি শ্বেত পাথরের গেলাস ভরে অনেক সুধা দিতে ধরে

আবার বিষও পেলাম তোমার দেওয়া ওই পেয়ালাতেই!!

শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১০৬)

৩৫

তুমি নয় না-ই কাছে আসলে নাইবা আমায়ে ভালোবাসলে

তাই বলে আমি কেন ভালোবাসবোনা

আমি কেন কাছে আসবো না!

মেঘে নয় আকাশটা ঢাকলো চাঁদ নয় আড়ালেই থাকলো

নদী কেন ভরবেনা জোয়ারে সেই স্রোতে আমি কেন ভাসবো-না?

আঁখি নয় স্বপ্নকে ভুললো অশ্রুই শুধু ভরে তুললো

মন কেন দেখবে না স্বপন্ সেই সুখে আমি কেন হাসবোনা??

শিল্পী ও সুর: মান্ন দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১২)

৩৬

কাল কিছুতেই ঘুম এলোনা

ওই মুখ ওই চোখ ওই মৃদু হাসিটি প্রাণ থেকে মোছা গেলোনা!

আজকে যেভাবে হোক্ খুঁজবো তাকে

জানবো সে অপরূপা কোথায় থাকে

ভালো করে দেখবো সে চঞ্চলকে কেন তার নেই তুলনা!

যে-চাঁদ আকাশে থাকে চাঁদনী রাতে

লুকোচুরী খেলুক সে দোষ কী তাকে

মাটিতে এসেছে নেমে যে- জ্যোছ্না সয়নাযে তার ছলনা।।

সুর: ও শিল্পী: মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৩)

৩৭

পৌষের কাছাকাছি রোদমাখা সেই দিন

ফিরে আর আসবে কি কখনো

খুশী আর লজ্জার মাঝামাঝি সেই হাসি

তুমি আর হাসবে কি কখনো?

অনুরাগ করা নাম না-জেনে   অধরেতে কোনো সাড়া না-এনে

দেখা আর না- দেখার   কাছাকাছি কোনো রঙ

চোখে আর ভাসবে কি কখনো?

কাব্য কি কথা সে ভাববো কি বিলাসে

মায়াজাল বুনবো কি তখনো

দু-একটি পাখীদের   সে-কাকলী   শুনবো কি তখনো;

সে-বাতাস বাঁশী কি গো বাজাবে   সে-আবেশ মনে মনে সাজাবে

বোঝা আর না-বোঝার   কাছাকাছি কোনো গান

ভালো আর বাসবে কি তখনো??

শিল্পী ও সুর মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৩)

৩৮

অনেক জমানো ব্যথা বেদনা   কী করে গান হলো জানিনা

তিলে তিলে যাকে আমি সয়েছি   বুকে রয়েছি

সেইকি এ-গানের প্রেরণা?

কখনো গাইনি আমি যে-গান কোথাও

সেই গান আজ গাইলাম   আলোর আকাশে চাইলাম

যে-আলো ফোটায় সূর্যমুখী মনো এলো সেই সাধনা!

এতো আমি কাছে আসি   তবু কোনোদিন

পারিনিতো কাছে আসতে   স্বপ্নের স্রোতে ভাসতে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝেও কেন বুঝলো না সে কী আমার শুভ কামনা!!

শিল্পী: কিশোর কুমার।। সুর: অজয় দাস।। ছবি: পারাবত প্রিয়া।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৪)

৩৯

যে-ক্ষতি আমি নিয়েছিলাম মেনে

সেই ক্ষতিপূরণ করতে কেন এলে?

কী খেলা তুমি নতুন করে যাবে আবার খেলে?

আমি যে-সব কথা গিয়েছিলাম ভুলে

রেখেছিলাম অন্ধকারের বন্ধ খাঁচায় তুলে

সেই পাখীকে ডাকলে কেন নতুন পাখা মেলে?

আমার যা কিছু আকাঙ্ক্ষা যা-কিছু অনুভব

পাথর হয়েই বুকের মাঝে জমে ছিল সব;

সেই পাথর চাপা ঝর্ণাটাকে আবার

বললে কেন সময় হলো নদী হয়ে যাবার

জানিনাতো কোন্ মরুতে রাখতে তাকে ফেলে!!

শিল্পী ও সুর: মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১১৫)

৪০

বড়ো সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি

কত কাল দেখিনি তোমায়।

স্মৃতির জানলা খুলে চেয়ে থাকি চোখ তুলে

যতটুকু আলো আসে সে-আলোয় মন ভরে যায়!

আমার এ অন্ধকারে কতরাত কেটে গেলো

আমি আঁধারেই রয়ে গেলাম;

তবু ভোরের স্বপ্ন থেকে সেই ছবি যাই এঁকে

রঙে রঙে সুরে সুরে ওরা যদি গান হয়ে যায়!!

শিল্পী: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬)

৪১

ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়োনা

আমার এত সাধের কান্নার দাগ ধুয়োনা

সে যেন এসে দ্যাখে পথ চেয়ে তার কেমন করে কেদেছি

দোহাই গানের বীণা মনকে ভরে তুলোনা

দেখেই তাকে ব্যথার এ -গান ভুলোনা

সে যেন এসে শোনে তার বিরহে কী সুর আমি সেধেছি!

ক্লান্ত প্রদীপ ওগো হঠাৎ আলোয় ফুটোনা

দেখেই তাকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটোনা

সে যেন এস জানে কোন আধারে এ-রাত আমি বেঁধেছি !

শিল্পী: হৈমন্তী শুক্লা।। সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১২৬)

৪২

তুমি কী যে বলো আমি বুঝিনা

তোমার মুখের পানে চাইলে আমি কিছু শুনিনা

হয় তো অনেক কথা দিয়ে যাও আমার মনের কাথা নিতে চাও

দুটি হৃদয়ের কথামালা হৃদয়েই গাঁথা থাকে

পারিনা পরাতে পারিনা !

Dhaka University Institutional Repository

তার চেয়ে চোখে নয় রাখো চোখ এভাবেই দুজনার কথা হোক

শুধু বুকভরা ভালবাসা যেখানে পাঠায় ভাষা

সে ভাষাই এসো বলিনা !

শিল্পি ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩১)

৪৩

যাবার আগে কিছু বলে গেলেনা নীরবে শুধুই রইলে চেয়ে

কিছুকি বলার ছিল না?

তখন বসন্ত শেষ চৈত্রের বেলা তখনো বাতাস আচলে করে যে খেলা

তখনো পাখীর গানে সাজানো ফুলের মেলা

ওদের ওই উচ্ছ্বাস এতোটুকু তুমি কিগো তোমার হৃদয়ে পেলেনা ?

এতো কী অভিমান ভুল বোঝা বলো কত কীসের বেদনাতে প্রেমকে কাদালে অত

কীসের অহংকার এখনো আগের মত

আমার এ প্রশ্নের কোনোই জবাব তুমি এখনো আমায় দিলেনা !!

শিল্পি ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩২)

৪৪

ও কেন এতো সুন্দরী হলো ওমনি করে ফিরে তাকালো

দেখে তো আমি মুগ্ধ হবোই আমি তো মানুষ !

সবে যখন আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে

ঝড় ওঠেনি বাতাসটাতে ঘোর লেগেছে

ও কেন তখন উড়িয়ে আঁচল খোলা চুলে বাইরে এলো?

সবে যখন প্রাণে আমার মন জেগেছে

পৃথিবীটা একটুখানি বদলে গেছে

ও কেন তখন হঠাৎ অমন বিনা কাজে সামনে এলো??

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৩)

৪৫

অমন ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে
কালো ওই চোখটা থেকেও কাজল কালো কি?
দেখতাম ও-মুখ হাতে আয়না পেলে !
যেখানে পলাশকলি সারাবছর ফোটে
লাভ কী রং লাগিয়ে ওমনি রাঙা ঠোঁটে
পলাশের কলির চেয়েও ও -রং রাঙা কি?
দেখতাম ও-মুখ হাতে আয়না পেলে?
উড়ো মেঘ যার চুলেতে এমনি বসে থাকে
চিরুনীর আঁচর দিয়ে ছড়াও কেন তাকে ;
যে-মুখে দিনে রাতে জোছনা ঝরে পড়ে
চন্দন সেথায় কেন মাখলে অমন করে
মুখের ওই জ্যোছনা থেকেও ও রং সাদা কি ?
দেখাতাম ও মুখ হাতে আয়না পেলে!!

শিল্পী ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৩)

৪৬

যখন জমেছে মেঘ আকাশে বৃষ্টি না হয় যদি ঝড়তো হবে
তোমায় যখন ভালোবেসেছি আপন না হও যদি পরতো হবে!
তোমার মনের দেশে যখন গিয়েছি এসে
সুখের ইন্দ্রপুরী না হলো দু:খ ব্যথায় ভরা ঘরতো হবে !

চরণ চিহ্ন দিলে এ পথে   কিছুনা যাবে পাওয়া

হয় আসা নয়   চলে যাওয়া;

হয় ব্যথা নয় হাসি কিছুতো বাজাবে বাঁশি

কান্না দুচোখে নদী না -হোলো   অশ্রুমতীর বালুচরতো হবে !!

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়   সুর: অসীমা মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৩৪)

৪৭

“কী দেখলে তুমি আমাতে?” কত সহজ এ-কথা জানানো

কত যে কঠিন কী দেখেছি আমি   এ কথা তোমাকে বোঝানো !

ওগো কোথায় আমার সাধের জীবন   আর কোন সুখে কোন সুখের মরণ

আমার অনুভব বিনা   এই অনুভূতি   কাউকে যায় না শেখানো !

বিরাট পৃথিবী   দিকে দিকে কত আয়োজন

আমি কী করে বোঝই   তোমাকে পেয়েছি   আর কিছু নেই প্রয়োজন ;

এই সব পেয়েছির দেশটা কোথায় ওগো কোনখানে গেলে তাকে পাওয়া যায়

যদি   জানতে চাওতো   শুধু ভালোবসো   মুখে তা যায়না শোনানো !!

শিল্পী: শিপ্রা বসু।।   সুর: সুধীন দাশগুপ্ত।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪০)

৪৮

কাটে না সময় যখন আর কিছুতে

বন্ধুর টেলিফোনে মন বসেনা

জানলার ওই গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা

মনে হয় বাবার মত কেউ বলেনা   আয় খুকু আয়!

আরে আমার সাথে গান গেয়ে যা

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নতুন সুর নে শিখে নে
কিছুই যখন ভালো লাগবে না তোর
পিয়ানোই বসে তুই বাজাবি রে আয় খুকু আয়!
সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়
গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়
কবিতার বইগুলো ছুড়ে ফেলি
মনে হয় বাবা যদি বলতো আমায় আয় খূকু আয়!
আয়রে আমার সাথে আয় এখনি
কোথাও ঘুরে আসি শহর ছেড়ে
ছেলেবেলার মত বায়না করে
কাজ থেকে নে না তুই আমায় কেড়ে আয় খুকু আয় !!
দোকানে যখন আসি সাজবো বলে
খোপাঁটা বেঁধে নিই ঠান্ডা হাওয়ায়
আর্সিতে যখন এই চোখ পড়ে যায়
মনে হয় বাবা যেন বলছে আমায় আয় খুকু আয়!!
আয়রে আমার কাছে আয় মামনি
সবার আগে আমি দেখি তোকে
দেখি কেমন খোঁপা বেধেছিস তুই
কেমন কাজল দিলি কালো চোখে আয় খুকু আয় !!
ছেলেবেলার দিন ফেলে এসেই
সবাই আমার মত বড়ো হয়ে যায়
জানিনা কজনে আমার মতন
মিষ্টি সে পিছু ডাক শুনতে যে পায় আয় খুকু আয়!!
আয়রে আমার পাশে আয় মা-মনি
এ-হাতটা ভালো করে ধর এখনি
হারানো সে দিনে চল চলে যাই
ছোট্টবেলা তোর ফিরিয়ে আনি আয় খুকু আয় !!

শিল্পী: শ্রাবন্তী মজুমদার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।। সুর: ভি বালসাঁরা ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৪২)

৪৯

আমি ভুলতো করিনি ভালোবেসে

ভুল যে করেছি   ভালবাসা আশা করে

তোমার এতোটা কাছে এসে!

তোমার সুখেই আমি হাসতাম

তোমার -ই ব্যথায় তুমি কাদতাম

চাইতে গেলাম কেন আমার ব্যথায় তুমি কাদো

আমারও হাসিতে ওঠো হেসে!

এ আমার অনুতাপ নয়

যেন এই ভুল আর কারো

কখনো না হয়;

তোমার কথাই আমি   রাখবো

তোমার পাশেই আমি   থাকবো

চাইবো না কোনদিন আমার কথাও তুমি রাখো

তুমি দাড়াও   মোর পাশে

শিল্পীঃ উৎপলা সেন ।। সুর : মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫২)

৫০

শুধু তোমার-ই জন্যে   ওই অরণ্যে

পলাশ হয়েছে লাল

সবুজ স্বপ্নে ছেয়ে গেছে আজ

বন মহুয়ার ডাল।

সাগর হয়েছে   অসীম অপার

আকাশে সুর্য ভেঙেছে আঁধার

তোমার আমার এই প্রেম ওগো

Dhaka University Institutional Repository

রয় যেন চিরকাল!

যেদিকে তাকাই দেখি শুধু আজ

আমাদের-ই ভালোবাসা

পাখীর কণ্ঠে কান পেতে শুনি

দুটি হৃদয়ের ভাষা;

এক হলো তাই এই দুটি মন

একাকার হলো এ দুটি জীবন

সুরের হাওয়ায় হাজার গানের

তরী মেলে দিল পাল !!

শিল্পী: সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সুর : উৎপলা সেন

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৩)

৫১

ওগো মেঘ তুমি উড়ে যাও কোন ঠিকানায়

কে তোমায় নিয়ে যায় দূর অজানায় বলো না আমায়?

আমি নই সে বিরহী

আমার কাউকে কিছু বলার নেই

তবু যেন কী বেদনা জমে ওঠে হৃদয়েই

মনে হয় আমার কেউ কেন নেই ওই অলকায়!

তবু আজ এ লগনে

তোমায় একটি বারতা জানালাম

ব্যথা যদি না-ই পাই এ জীবনে কী পেলাম

সেই প্রেম কেন নেই যে-এসে আমার মনকে কাঁদায়??

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৫৪)

৫২

গোলাপের অলি আছে ফাগুনের আছে বাহার

সকলের-ই সাথী আছে শুধু কেউ নেই আমার

সাথী কেউ নেই আমার!

নয়নের কত কাছে স্বপনের ছোঁয়া আছে

মালাখানি গাঁথা আছে সে-আসন পাতা আছে

সাধ আছে কতো আশার সুখ আছে ভালোবাসার!

শুধু কেউ নেই আমার

বাঁশীতেও সুর বাজে অভিসারে রাই সাজে

নুপুরের রিনিঝিনি মন বলে চিনি চিনি

সবি আছে ভালোলাগার চেয়ে চেয়ে রাত জাগার!!

শুধু কেউ নেই আমার!!

শিল্পী: মান্না দে সুর: অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ছবি: তিলোত্তমা ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৬৫)

৫৩

মার স্নেহ কাকে বলে জানিনা বাবার মমতা কী বুঝতে না-বুঝতেই

এ-বিরাট পৃথিবীতে দেখলাম সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই

সে আমার ছোট বোন বড়ো আদরের ছোট বোন !

ভালো করে যখন সে কথা শেখেনি তখন থেকেই সে গেয়ে যেত গান

বাজনার হাত ছিল ভালই আমার তার সাথে বাজাতাম দিয়ে মনপ্রাণ

রাস্তায় ভীড় করে শুনতো সবাই অবাক হতো যে কত জ্ঞনী গুনী জন।

ভোরবেলা তার গানে ঘুম ভাঙ্গতো রাতে তাকে বাজনায় ঘুমপাড়াতাম

ভাইয়ের বাজনা আর বোনের গানে সহজ সরল সেই দিন কাটাতাম

ছোট্ট একটি ঘর এ -দুটি মানুষ এই ছিল আমাদের সুখের ভুবন!

একদিন যখন সে একটু বড় প্রথম সুযোগ এলা এক জলসায়

মুগ্ধ শ্রোতারা তার কণ্ঠ শুনে দুহাত ভরালো তার ফুলের তোড়ায়

ঘরে এস আমায় সে করলো প্রণাম প্রথম ভরলো জলে আমার নয়ন!

এরপর কী যে হল গান শুধু গান ঝড়িয়ে পড়লো তার আরো বেশী নাম

শ্রোতারা উজাড় করে দিল উপহার দিল না সময় শুধু নিতে বিশ্রাম

ক্লান্তির ক্ষমা নেই ওদের কাছে এরা বেশী দিতে হবে বুঝে নিল মন !

একদিন শহরের সেরা জলসা সেদিন -ই গলায় তার দারুণ জ্বালা

তবুও শ্রোতারা তাকে দিল না ছুটি শেষ গান গাইলো সে পরে শেষ মালা

শিল্পের জন্যই শিল্পী শুধু এ ছাড়া নেই যে তার অন্য জীবন

নীরব হলো যে ছোট বোন বড়ো আদরের ছোট বোন ।

তার গান থেমে গেছে নেই শ্রোতা আর আমি একা বসে আছি স্মৃতি নিয়ে

তার ।

আনন্দ নিয়ে গেছে ওরা সকলেই দু:খটা হোক আজ শুধুই আমার !

অনুযোগ এতো নয় এই শিল্পীর ভাই বোন সকলের ভাগ্য লিখন !!

।। শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ সুপর্ণকান্তি ঘোষ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭০)

৫৪

আমার বলার কিছু ছিল না

চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে!

সব কিছু নিয়ে গেলে যা দিয়েছিলে

আনন্দ হাসিগান সব কেড়ে নিলে

যাবার বেলায় শুধু নিজের -ই অজান্তে

স্মৃতিটাই গেলে তুমি ফেলে!

দুহাতে তোমার ওগো এত কিছু ধরে গেলো

ধরলো না শুধু এই স্মৃতিটা

রয়ে গেলো শেষ দিন রয় গেল সেদিনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দেখার সেই তিথিটা;

কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেলো

সাজানো ফুলোর বনে ঝড় বয়ে গেল

সে-ঝড় থামার পরে পৃথিবী আঁধঅর হলো

তবু দেখি দীপ গেছো জ্বেলে!!

।। শিল্পীঃ হৈমন্তী শুক্লা ।। সুরঃ মান্না দে ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭১)

৫৫

আমি ফুল না হয়ে কাঁটা হয়েই বেশ ছিলাম

জানিনা কোন ভুলে তোমার আচলে জড়ালাম?

আমি সুখ না-হয়ে দু:খ হয়েই বেশ ছিলাম

কেন যে তোমার বুকের দীর্ঘশ্বাস ঝরালাম!

সকলেই অঝর ধারার বৃষ্টি কি আর হয়

কেউ কেউ আগুন হয়েই সারাজীবন রয়

আমি অনেক দূরের আগুন হয়েই বেশছিলাম

কেন যে কাছে এসে তোমার মনে ছড়ালাম!

চাইলেই মনের মত মন কি সবাই পায়

জীবনে অনেক কিছুই শূন্য রয়ে যায়

আমি আমার ব্যথার বোঝা নিয়েই বেশ ছিলাম

সমব্যথার আশায় কেন যে হাত বাড়ালাম??

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৭১)

৫৬

শুধু একদিন ভালোবাসা মৃত্যু যে তারপর

তা-ও যদি পাই আমি তা -ই চাই

চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর!

যদি ওচোখে রোশ্‌নি জ্বালো শুধু একবার

আমি তাতেই পোড়াতে রাজী যা কিছু আমার

আমি চাই না দেখতে ওই প্রাণহীন চোখের পাথর!

ভাগ্যের দরবারে দুহাত পেতে

আমি চাইনা পুণ্যফলে স্বর্গে যেতে

ওই্ স্বর্গকে ধরে ফেলি হাতের মুঠোয়

যদি একবার হাতখানি রাখো এ হাতে

যদি উপহার দিয়ে ফ্যালো একটাও ফুল

যদি একবার ও করো কোন সামাজিক ভুল

আমি তাতেই ভাবতে রাজী

এই ঘর সুখের বাসর!!

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৮০)

৫৭

হয়তো আমাকে কারো মনে নেই

আমি যে ছিলাম এই গ্রামেতেই

এই মাটিতেই জন্ম আমার

তাইতো ফিরে এলাম আবার

অনেক চেনা অনেক জানা তোমাদের কাছতেই!

এই খানেতেই হৃদয় দিয়ে

গেলাম শুধুই দু:খ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বুকটা ভেঙে গেলো যে-ঝড়

এলাম সে ঝড় বুকেতে নিয়েই!

ফিরে এলাম জবাব দিতে

সব কিছুর-ই হিসাব নিতে

প্রতিশোধটা পাওনা হলে

মিটিয়ে দেবো প্রতিশোধই!!

শিল্পী: কিশোর কুমার ।। সুর: অজয় দাস ।। ছবি: প্রতিশোধ

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৮২)

৫৮

আমি আজীবন শুধু ভুল করে গেছি

রাত্রির কাছে সুর্য চেয়েছি

লেখা স্বরলিপি আশা করে গেছি

স্বপ্ন বীণার কাছে

হায়রে হৃদয় চেয়েছি তোমার মতন

হৃদয়হীনার কাছে!

যোগ্য শাস্তি তাই হাতে হাতে পেয়েছি

গানের বদলে আমি বুকের ব্যথ্যায় গেয়েছি

তুমি আসরে আমার আসোনি কখনো

সেই গান শুনে ফ্যালো পাছে!

তোমার ছবিই তবু মনে মনে এঁকেছি

সুন্দর ওই মুখ প্রাণ ভরে দেখেছি

কত অকরুণ হাসি অপরূপ হয়ে

ওই মুখে আজো লেগে আছে!!

।। শিল্পী ও সুর: মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯১)

Dhaka University Institutional Repository

৫৯

দীপ ছিল শিখা ছিল
শুধু তুমি ছিলে না বলে আলো জ্বললো না
ভাষা ছিল কথা ছিল
তুমি ডাকলে না বলে মন কথা বললো না !
ঝর্ণা কেমনে হয নদী
সাগর না ডাকে কভু যদি
তাই যেতে যেতে থামলো সে বয়ে চললো না !
বুক ভরা আশা নিয়ে মন আমার
শুধু শুধু কাছে এলো
পারলো না দিতে কিছু উপহার;
যে-মালার ফুল গেছে ঝরে
রেখেছি সে মালা বুকে করে
তাই ওই ফুল ও- চরণ আজো দললো না!!

।। শিল্পী ও সুর : মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৫)

৬০

আকাশ মেঘে ঢাকা শাওন ধারা ঝরে
সেদিন ছিলে পাশে সেদিন মনে পড়ে।
সেদিন এই খানে সজল ছিল হাওয়া
কেয়ার বনে তারও ছিল যে আশা যাওয়া
যুথীর সুরভিতে আঙিনা ছিল ভরে !
এখনো সেই স্মৃতি বুকেতে বযে চলি
নিজেরই সাথে আমি নিজেই কথা বলি;
স্মৃতির মণিমালা সবার চেয়ে দামী

Dhaka University Institutional Repository

আজো তা পরে আছি   ভুলিনি কিছু আমি

এখনো বসে আছি   হারানো খেলা ঘরে!!

শিল্পী: চিত্রা সিং ।। সুর: জগজিৎ সিং।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ১৯৭)

৬১

খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে

মনটা কেন এতো কাছে আনলে

পারবে কি বাসতে ভালো আমাকে জানলে

আমাকে তেমন করে জানলে?

যেখানে শুধুই আলো

যেখানে শুধুই ভালো

আমি যে   মন্দ করি সবি তা

লিখো না   কবিতা আমায় নিয়ে

স্বপ্নের হাতটি ধরে

নাই আমায় টানলে!

এখানে জীবন আমার

ফুল নয় শুধুই কাটার

স্বর্গের দেবী তুমি এসোনা

মাটিতে   কোমলচরণ রেখোনা

ক্ষতি কি তোমার বলো

এই অনুরোধ মানলে ??

।। শিল্পী: শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ।। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।। ছবি: ভালোবাসা -ভালোবাসা।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৪)

৬২

যত ভাবনা ছিল যত স্বপ্ন ছিল

সব দিলাম তোমায় আমি দিলাম তোমায়

তুমি নেবে কি আমায়?

ডেকে নিবে কি আমায়?

চম্‌কে দেখি দু চোখ মেলে

সকল দ্বিধা লজ্জা ফেলে

বন্ধ আমার দরজা ঠেলে

সামনে তুমি এগিয়ে এলে

সুস্বাগতম্ বলতে তোমায়

ইচ্ছে যে যায়!

কোন্ মালাতে করবো বরণ

পাতবো কোথায় তোমার আসন

পাই না ভেবে মনের মতন

কী উপহার আনবো এখন

বাধবো তোমায় কোন সে গানে

কোন দুরাশায়??

শিল্পী: অরুন্ধতী হোম ।। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।। ছবি : ভালোবাসা -ভালোবাসা ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৫)

৬৩

আমি তোমার চিরদিনের

তুমি আমায় আপন করে নাও

আমার প্রাণের সন্ধ্যা প্রদীপ

তোমার আলোয় জ্বলতে দাও !

অনেক পথের চলার শেষে

Dhaka University Institutional Repository

সো তুমি রাজার বেশে
দেখি তোমায় আড়াল থেকে
কে দাঁড়ালে সামনে এসে
তোমার অভিষেকের মালা থেকে
এই আঙিনায় ফুল ছড়াও!
জানিনাতো এই ঠিকানা
কোথায় তুমি খুজে পেলে
পাষাণ তোমার মূর্ত্তি ভেঙে
এতো দিনে সামনে এল
এবার ধন্য করো ও দেবতা
করবো প্রণাম পা বাড়াও !!

শিল্পী: চিত্রা সিং।। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।। ছবি: সন্ধ্যা প্রদীপ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২০৮)

৬৪

যদি এখনো আমাকে শুধু ভালোলাগে
ভালো না-বাসো মন্দ কী?
চোরা চাউনিতে যদি দুর থেকে দেখো
কাছে না-আসো তাই বা মন্দ কী
যদি ও মুখের ভাব পাথর করে
ঘেরো ফেরো সারাদিন নিজের ঘরে
যদি চোখের তারায় শুধু হাসো একবার
মুখে না-হেসে তাই মন্দ কী?
তোমার জানলার পর্দাটা বাতাস উড়িয়ে দিযে
পালায় যখন
আমার এ ঘর থেকে তোমার ঘরটা দেখি

Dhaka University Institutional Repository

ভরিয়ে নয়ন;

দেখি আয়নার সামনেতে দাড়িয়ে থেকে

কাউকে না দেখে শুধু দ্যাখো নিজেকে

যদি আমাকে ভাসাও আরো স্বপ্নে তোমার

নিজে না-ভাসো তাই বা মন্দ কী??

শিল্পী: মান্না দে ।। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১২)

৬৫

তুমি অপরের আমি জানতাম

ভালোবাসলাম তবু তোমাকেই!

আমার ফেরার উপায় নেই

আর ফেরার উপায় নেই !

এতে যদি কেউ দোষ দ্যাখে

বলে যাবো আমি আজ তাকে

যে ভালোবাসে আর যে ভালোবাসায়

অপরাধী তারা দুজনেই !

নাই যদি তুমি আসো ঘরে

রয়ে যাবে এই অন্তরে

এই মন থেকে যে তুমি বিদায় নিতে যে

পারবে না আর কিছুতেই !!

শিল্পী: শিবাজী চট্টোপাধ্যায়।। সুর: অজয় দাস ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১২)

৬৬

দু:খ আমাকে দু:খী করেনি করেছে রাজার রাজা

ও রানী সাহেবা বিদায় এবার

তোমার সাজ ঘরে রাজা সাজবো না আর

তুমি নকল পোশাক পরিয়ে আমাকে

অনেক দিয়েছ সাজা!

তোমার নাট মন্দিরে যত্রা আসরে

তুমি চিকের আড়ারে ছিলে

সেদিন রাজার ভুমিকা ছিল য়ে আমার

তুমি সত্যি ভেবে তা নিলে

তাই মখ্‌মলে ঢাকা রূপোর থালায়

আসরের মাঝে পাঠালে আমায়

একটি গোলাপ তাজা!

আহা সেইদিন থেকে এ-ফকির রোজ

শুধু গেয়েছে রাজার পপালা

তুমি জুড়ায়ে সে-গানে তোমার

আসল রাজার বিরহ জ্বালা

আর অভিনয় শেষে ভাঙা আয়নায়

আমি দেখে গেছি করুণ ব্যথায়

ফকিরের রাজা সাজা!!

শিল্পী: মান্না দে।। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ :২১৪)

৬৭

আমি সারারাত ধরে শুধু কেঁদেছি

বুঝিনি ওভাবে তুমি চলে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

জানিনা কী অপরাধ করেছি?

পারিনি কিছুতে নিজেকে বোঝাতে

কী ভুলে সবই যে হলো হারাতে

পারিনি সে রাতে তোমায় ফেরাতে

ঢেকেছি এ আখি শূন্য দুহাতে

তবে কি ভুলের-ই স্বর্গ গড়েছি?

জানিনা কী পেলে তুমি এ খেলাতে

সুখের-ই ছবিটি ছিড়ে ফেলাতে

জানিনা তোমাকে আমি কী দিয়েছি

কী বা চেয়েছি কী বা পেয়েছি

চোখের-ই জলেতে মুক্তো যে ধরেছি !!

শিল্পীঃ মান্না দে ।। সুরঃ সুপর্ণকান্তি ঘোষ ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৮)

৬৮

চিরদিন-ই তুমি যে আমার

যুগে যুগে আমি তোমারি

আমি আছি সেই যে তোমার

তুমি আছো সে্ই আমিারি

সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী!

এতো কাছে রয়েছ তুমি

আরো কাছে তোমাকে যে চাই

তুমি ছাড়া এমন আপন

আমার যে আর কেউ নাই

আমি কিগো তোমাকে ছেড়ে

এক একা থাকতে পারি?

Dhaka University Institutional Repository

এ জীবন   ফুরিয়ে যেদিন

পাবো এক নতুন জীবন

সেদিনও হবে একাকার

দুজনার এই দুটি মন

হৃদয়ের সব কবিতায়

ঝরে পড়া ছন্দ তার-ই!!

শিল্পী: কিশোর কুমার ও আশা ভোসলে বাপ্পী লাহিড়ী।।   ছবি: অমর সঙ্গী।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২১৮)

৬৯

ভালোবাসা   ছাড়া আর আছে কি

ভালোবাসা   হলো নি:শ্বাস এ-দেহের

নি:শ্বাস বিনা মানুষ কখনো বাঁচে কী

যে ভাবেই হোক তাই

ভালোবাসা পেতে চাই

তার এতটুকু কণা আছে গো তোমার কাছে কি?

এ যে গো   হীরের হার

একবার মেলে যার

কভু   হীরার অভাব   মেটে তার ভাঙা কাচে কি?

বুঝিনা কি তার ছল

কী যে তার কৌশল

তাকে পেয়ে গেলে তার দোষ গুণ কেউ বাছে কি?

এ যে গো ব্যথার সুখ

ভরে গেলে এই বুক

কোনো   নতুন ব্যথা কেউ আর কভু যাচে কি??

শিল্পী: কিশোর কুমার ও আশা ভোসলে।।   সুর: অজয় দাস।। ছবি: পাপ-পুণ্য।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২১)

Dhaka University Institutional Repository

৭০

জানি যেখানেই থাকো এখনো তুমি যে

মোর গান ভালোবাসো

আমি তাই গেয়ে যাই

গান শুনে তুমি কাছে যাতে ছুটে আসো!

এ-গান তোমায় বোঝে

তাই এভাবে তোমাকে খোঁজে

সে জানে তাহার কান্না হাসিতে

তুমি আজো কাঁদো হাসো!

শুনে যাক্ সবাই কী গান আমার মুখে

শুধু তুমি শোনো কী গান

আমার বুকে;

এবার আড়াল তোলো

যদি দু:খ থাকে তো ভোলো

এসো গো আমার স্বপ্ন সাগরে

সোনার তরীতে ভাসো!!

শিল্পীঃ কিশোর কুমার।। সুরঃ মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ছবিঃ তুমি কত সুন্দর।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২২)

৭১

ও বাঙালী ভুল কোরো না গেয়োনা এমন গান

যাতে জগৎসভায় লুটিয়ে পড়ে বাংলা ভাষার মান!

বলো কে বলে এই গানের দেশে

ঝুলি তোমার খালি

তোমার আছে কীর্ত্তন ঝুমুর

বাউল ভাটিয়ালী

তুমি সমাদরে দাও ফিরিয়ে পরের দেওয়া দান

যাতে জগৎ সভায় বেঁচে থাকে

বাংলা ভাষার মান!

তোমার চণ্ডীদাসের গান রয়েছে

করছো কেন ভুল

আছে লালন ফকির রবি ঠাকুর

কবি নজরুল

কেন্ নিজের হাতে ছুরি মেরে

নিচ্ছো নিজের প্রাণ?

তুমি বেঁচে থাকো বাঁচিয়ে রাখো

বাংলা ভাষার মান!

শিল্পী: শিবাজী চট্টোপাধ্যায়।। সুর: অজয় দাস।। ছবি: শ্রীমতি হংসরাজ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৩)

৭২

তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে

আমার মরণযাত্রা যেদিন যাবে

তুমি বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থেকো

মেষ দেখাটা দেখতে পাবে!

আমায় দেখতে তোমায় দেয়নি যারা

জানবে নাতো কেউ-ই যে তারা

আমি পাথর চোখের দৃষ্টি দিয়ে

দেখবো তোমায় বিভোর ভাবে!

তুমি ফুল ছুঁড়োনা ওপর থেকে

একটু ফেলো দীর্ঘনিশ্বাস

আমার শিয়রে জ্বলা ধুপের ধোঁয়ায়

ওটাই হবে সুখের বাতাস;

যদি নতুন কোনো জন্ম থাকে

পাবো দুজন দুজনাকে

সেদিন নতুন হয়ে আসবে কাছে

তখন তোমায় কে আটকাবে??

শিল্পী: কিশোর কুমার।। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।। ছবি: তুমি কত সুন্দর।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৩)

৭৩

আমারও তো গান ছিল সাধ ছিল মনে

সরস্বতীল চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে!

জানি না কী অপরাধে শোনাতে সে-গান

বাঁধা বীণা ছিঁড়ে গেলো ভেঙে গেলো প্রাণ

কত সুখ পেলি বিধি

তার এ-লিখনে?

আজ তোমাদের কাছে শুধু জেনে যেতে চাই

নিয়তির চেয়ে বড়ো কিছু কিগো নাই

ভালোবাসা রাজার রাজা

নয় কি ভুবনে?

ভালোবাসা নিয়ে এসো

কাছেতে আমার

সুর খুঁজে পাবো আমি

কণ্ঠে আবার

জ্বালো গো আলোর শিখা আঁধারের কোণে!!

সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকি এ-জীবনে!!

শিল্পী: কিশোর কুমার।। সুর কানু ভট্টাচার্য।। ছবি: দোলন চাঁপা।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২২৫)

৭৪

মনে পড়ে সেই দিনটি

যেদিন পাখীকে গাইতে দেখে

আমার-ও গাইতে ইচ্ছে হলো!

আমি ভয়ে ভয়ে মুখ খুললাম

এই কণ্ঠেতে সুর তুললাম

অনেক অনেক স্বপ্ন

দুচোখে ছাইতে ইচ্ছে হলো!

তবু আজোতে হলো না জানা

সেদিন কোথায় জ্বললো আলো

সেই প্রথম গানটি শুনে

কার প্রথম লাগলো ভালো;

আমি তার খোঁজে কত ঘুরলাম

কত স্মরণের ফুল ছুঁরলাম

আজো তার সে প্রেরণা নিয়ে যে

তরীটি বাইতে ইচ্ছে হলো!!

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৩৩)

৭৫

সে কেন আমায় বুঝলো না

আমি তাকে ভালোবাসি এখনো

তার ব্যথা ভাবি মোর ব্যথা

তার সুখে আমি হাসি এখনো!

এতো কাছে ছিল যে গো

যে আমার এতোটা আপন

Dhaka University Institutional Repository

যে আমার জানলো না

দেখলো না আমার এ-মন

চলে গেলো শুধু রেখে গেলো

স্বপ্ন যে রাশি রাশি এখনো!

ভেঙে গেলো যত আশা

ছিঁড়ে গেলো সে-বীণার তার

স্মৃতি ছাড়া কোনো সুর

এ জীবনে বাজবে না আর

তবু আছি এই মনে মনে

দুজনে যে পাশাপাশি এখনো!!

শিল্পী: পঙ্কজ উদাস।। সুর: বাপ্পী লাহিড়ী।। ছবি: আমার তুমি।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪৫)

৭৬

বলছি তোমার কানে কানে আমার তুমি

বলছি তোমার গানে গানে আমার তুমি!

আজকে আমার প্রাণ পেয়েছে অনেক নতুন ভাষা!

অনেক দিনের স্বপ্ন যে অনেক দিনের আশা

আমার তুমি!

তোমায় পেয়ে হয় যে মনে

আর জনমেও সাথী ছিলাম

আমরা দুজন মনের সুখে

অনেক জনম ঘুরে এলাম

চিরদিন-ই থাকবে এক-ই আমাদের এই ভালোবাসা!

তুমি আমার অনেক আপন

মেনে নিয়েও বলে এ-মন

Dhaka University Institutional Repository

হও না তুমি আরো কাছের

হও না তুমি আরো আপন

এক সাগরে মিলবো বলেই তোমার আমার স্রোতে ভাসা!

শিল্পী: বাপ্পী লাহিড়ী ও রোমা লাহিড়ী ও লতা মঙ্গেশকর।। সুর: বাপ্পী লাহিড়ী।। ছবি: আমার তুমি।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪৬)

৭৭

শুনতে শুনতে অনেক মিথ্যে সত্যি হয়ে যায়

বলতে বলতে অনেক কথাই মন যে কয়ে যায়!

শিলার উপর শিলা জমে

অনেক নদীর পথ ঘোরায়

আবার বইতে বইতে নদীর স্রোতে পাথরও ক্ষয়ে যায়!

দুচোখ মেলে চেয়ে থেকেও

অনেক কিছুই নজর এড়ায়

আবার দেখতে দেখতে অনেক দেখাই চোখেতে সয়ে যায়!

ক্ষমার ছোঁয়ায় যা-কিছু ভুল

ফুলের মত পাপড়ি ম্যালে

আবার সাজানো বাগান ভেঙে চুড়ে ঘুর্ণি বিয়ে যায়!

লোহার খাঁচায় রাখলে ধরেও

সময়টা ঠিক পালিয়ে যায়

আবার অনেক স্মৃতি বিদায় দিলেও বুকেই রয়ে যায়!!

শিল্পী ও সুর: মান্না দে।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

৭৮

অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার

তোমাকে জানাই প্রণাম

সারাটি পৃথিবী জুড়ে তোমার গানের সুরে

ছড়ালে যে ভারত মাতার নাম!

বহু ভালোবাসা দিয়ে শোনালে তুমি

গভীর প্রেমের কত গান।

মিলনের আনন্দ বিরহের বেদনা

মানুষকে দিয়ে গেলে দান

বন্ধুর কত ত্যাগ শত্রুর ছলনা

নিয়ে কত গান গেয়ে গেলে অবিরাম!

অনেক কান্না বুকে লুকিয়ে রেখে

কত গান তুমি শুনিয়ে গেলে

বোঝেনি তোমাকে কেউ বুঝতেও দাওনি

কোন ঋণে তুমি জড়িয়ে গেলে

আজকের শিল্পীরা কান্না ছাড়াগো আর

কী দিয়ে মেটাবে সেই গানের দাম??

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: বাবুল বসু।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫০)

৭৯

একটাই কথা আছে বাংলাতে

মুখ আর বুক বলে এক সাথে

সে হলো বন্ধু বন্ধু আমার!

কে গরীব কে আমীর সে মানে না

জাতের বিচার করা সে জানে না

Dhaka University Institutional Repository

সে হলো বন্ধু বন্ধু আমার!

দুহাতে মোহর গিনি ছড়িয়ে গেলে

এ-জগতে দামী দামী কতো কী মেলে

টাকায় যায় না কেনা বন্ধু কোথায়

সে শুধু কপালগুণে মেলে দুনিয়াতে!

এক মার গর্ভেতে জন্ম না-পাই

বন্ধুকে বলি তবু নিজের-ই যে ভাই

রক্তের ব্যবধান তুচ্ছ যে তই

হৃদয়ের এ্যাতো মিল রয়ে গেছে যাতে!

কোনো দিন-ও ছাড়বো না বন্ধু তোমায়

রয়ে যাবো চিরদিন এক দুজনায়

আনন্দে দু:খে হবো একাকার

জীবনে মরণে রবো তোমাতে আমাতে!!

শিল্পী: বাপ্পী লহিড়ী ও মুন্না আজিজ ও রেমা লাডিড়ী ।। সুর: বাপ্পী লাহিড়ী ।। ছবি: বন্ধু আমার ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৫৭)

৮০

কলমীলতা কলমীলতা নীল সায়রের জলে

লাজুক লাজুক মনের কাছে গোপন কথা বলে।

ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের বুকে ঝিলিক্ ঝিলিক্ আলো

চিকন্ চিকন্ পাতার নাচন লাগছে ভারী ভালো

দোলন দোলন্ দোলনা হয়ে মনটা যে তই দোলে

কলমীলতা লাজুক লতা সেই কথাটার বলে!

বৌ কথা কও বৌ কথা কও ডাকছে কেন পাখী

ফাগুন ফাগুন এমন দিনে কীসের ডাকাডাকি

ঝনক্ ঝনক্ কনক চাঁপার দেখে নতুন রূপ

Dhaka University Institutional Repository

বলছে পাখী তার মিতাকে আর থেকোনা চুপ

ও বহুরী পায়ে পড়ি অমন ধারা হলে

আজ কি মানায় তুমিই বলো পাখীটা তাই বলে!

সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাতারাপ চুম্‌কি চোখে জ্বেলে

এখান ওখান সেখান কাকে খুঁজছে দুচোখ মেলে

ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায় কোথায় সাঁঝের বন

কাঁপন কাঁপন কীসের সাড়া তুলছে সে কার মন

তুলসী তলার সন্ধ্যাপ্রদীপ একটু হাওয়ায় দুলে

সেই পরপাণের খবর জানায় আলোর ছটা তুলে!!

।। শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন।। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।। ছবি: সজনী গো সজনী।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৬৮)

৮১

তুমি এলেনা কেন এলেনা

ভাঙা ভাঙা মন আমার কী পেলো

এই শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা!

রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টির ধারাতে

তুমি এসে পাশে যে দাঁড়াতে

চম্‌কাতো বিজলী কালো মেঘে তাই

তাকে তুমি ভুলে গেলে কী হলো?

আজো আছে সেই সে বরষা

মনে শুধু নেই সে ভরসা

কোথায় সে স্বপ্ন খুঁজে বলো পাই

কথা দিয়ে রাখলেনা কী হলো??

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: অরূপ-প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭১)

Dhaka University Institutional Repository

৮২

তুমি আছো এ্যাতো কাছে তাই
পৃথিবীতে স্বর্গকে পাই
তোমার চোখে যে-স্বপ্ন
তা-ই দেখি যে দিকে তাকাই!
যতো ব্যথা ছিলোগো আমার
তোমার পরশে দূর হলো
হৃদয়ের মৌন বীণা
নিমেষে গানের সুর হলো
তোমার দেওয়া সে গান আজ
তোমাকেই গেয়ে যে শোনাই!
সাধ ছিলো বাসবো ভালা
তোমায় কখনো পাই যদি
ভাবিনিতো এ-প্রেমে হবে
দুকুল ছাপানো এক নদী
তোমার আমার যা-কিছু
এ স্রোতে এসোনা ভাসাই!!

শিল্পী: কুমার সানু।। সুর: অরূপ প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭১)

৮৩

তোমার সুরে সুর বেঁধেছি
মনে কিগো পড়ে সেই দিনের কথা
তারা ভরা রাতে চাঁদ-ও ছিলো
রজনীগন্ধা ফুটেছিলো যে-রাতে?
প্রথম দিনের সেই মিষ্টি কথা

হাসির আড়ালে ছিলো অজানা ব্যথা

ব্যথার আড়ালে ঢাকা সুখের-ই কান্না

দুটি আঁখি পাতে কেঁপেছিল!

এখনো দুচোখে সে যে রয়েছে লেগে

মৃদু সে-আলোর শিখা রয়েছে জেগে

যখনি হৃদয় চায় দেখি যে আমি

হৃদয় কী আলো জ্বেলেছিলো!!

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: অরূপ প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭১)

৮৪

কেন তুমি আমাকে যে এ্যাতো ভালোবাসো

আমার-ও যে মন আছে কেন বোঝোনা?

এ্যাতো যদি ভালোবাসো কেমনে তা সই

সোহাগের মালা আমি কী করে যে বই

কতো বাধা আজো আছে কেন বোঝো না!

ঢেউ দিয়ে দিয়ে নদী ভাঙে যদি কূল

বালুকার বাঁধ দেওয়া সেখানে যে ভুল

স্রোতে আমি ভেসে যাবো কেন বোঝোনা??

শিল্পী: কুমার শানু। সুর: অরূপ-প্রণয়।। (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭২)

৮৫

তুমি জানোনা নাকি বোঝোনা

ভালোবাসা কেন যে হয়

প্রেম কেন আসে মনে?

শুধু মন-ই বোঝে এই মনের কথা

পারবেনা কেউ পালাতে এতে এমন মজা!

বলে ক'য়ে দেখে শুনে সেতো আসেনা

সোহাগ-নদীর জল বিনা সে তরী ভাসেনা

শুধু তরী-ই জানে ছোটে কীসে টানে

পারবেনা কেউ এড়াতে এতে এমন মজা!

মনের ঘরে সে- প্রেম এলা মানতে কী ক্ষতি

জীবন সাথী ভেবো তাকে সে নয় অতিথি

তার হাতটা ধওেরা তাকে আপন করো

পারবেনা কেউ ফেরাতে সে যে রাজার রাজা!!

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: অরূপ-প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭২)

৮৬

জীবনে আমার আরো আছে গান

আরো বতহু সুর আছে বাঁকি

এখনি এমন ভালো বেসোনা আমায়।

চাওগো আমাকে যদি ফুল দিতে

একটি গোলাপ আমি পারি নিতে

দিওনা বাগান ভরা ফুলের-ই বাহার

দিওনা এমন মালা এ্যতো উপহার!

আরো যে সুদূরে দিতে হবে পাড়ি

দাওনা আমাকে প্রেরণাটা তার-ই

সেই শুভ আশা দাও হৃদয় ভরে

শিল্পীর স্বপ্ন যা সত্যি করে!!

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: অরূপ-প্রণয় ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭২)

৮৭

তোমায় কি কোনো দিন বলেছি

ভালোবাসি আমি তোমাকে

কেন তুমি ভেবে নিলে

তোমার প্রেমিক আমাকে?

রোজ এখানে এই বাগানে

ফুটিয়েছি আমি কতো ফুল

একটিও ফুল দিয়ে তোমাকে

করেছি কি কোনোদিন-ও ভুল

কোনো বাবে কখনো কি

ফেলেছি তোমায় বিপাকে?

এই সেতারে ওই নূপুরে

চেয়েছি কি কখনো মিলন

মীড়কে গমকে মূর্চ্ছনাতে

একাইতো তুলেছি রণন

বেজে গেছে সেতার আমার

নিজের-ই সুরের দেমাকে!!

শিল্পীঃ কুমার শানু।। সুরঃ অরূপ-প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৪)

৮৮

তোমার চুল বাঁধা দেখতে দেখতে

ভাঙলো কাঁচের আয়না

তোমার ছলাকলা দেখতে দেখতে

ভাঙলো বুকের আয়না!

ভরা যৌবনে সাজাতে তোমায়

ষোলটি ফাগুন লেগে গেছে

তোমার অতো রূপ ধরে রাখতে

পাগল হলো যে আয়না!

আমি যেমন তোমার-ই ছিলাম

তেমন তোমার-ই আছি

তুমি আয়নাকে প্রশ্ন করো

শুনে নাও কী বলে আয়না?

তুমি একদিন এখানে এসা

আমার চোখের দিকে শুধু চাও

তুমি তবেই বুঝবে আমাকে

চোখ যে মনের আয়না!!

শিল্পী ও সুরঃ জগজিৎ সিং।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৭)

৮৯

বেশী কিছু আশা করা ভুল

বুঝলাম আমি এ্যাতো দিনে

মুক্তি মেলেনা সহজে

জড়ালে হৃদয় কোনো ঋণে!

এই জগতে এমন-ও লোক থাকে

স্বপ্ন দেখতে নেই যাকে

দু: খের মূল্যতে যে

কঠিন সত্য নেয় কিনে!

আমি সেই সে দলের এক জনা

বুকে যার শুধু বঞ্চনা

যে বর্ষার মেঘ পেরিয়ে

আসেনা আলোর আশ্বিনে!!

।। শিল্পী ও সুরঃ জগজিৎ সিং।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৭)

৯০

চোখে চোখ রেখে আমি সুরা পান করি

হাতে হাত রেখে আডিম সুরা পান করি

তৃষ্ণা বাড়িয়ে আমি সুরা পান করি

স্বপ্ন ছড়িয়ে আমি সুরা পান কির!

পান্থশালাতে আলো কামনা থাকে

পান্থশালা যে তাই আমাকে ডাকে

আলোর ঘোরেতে আমি ক্ষমা হীনা নারী

আমি তাই সে-আঁধারেই সুরা পান করি!

তোমাকে যে বানিয়েডছি নয়ন তারা

কিছুই দেখিনা আমি তোমাকে ছাড়া

বলো এই দিশা নিয়ে বাঁচি না মরি

বাঁচি মারি যা-ই হোক্ সুরা পান করি।

কিছুলোক আছে যারা যাতো পিয়াসী

পরকে তৃষিত করে তারো যে বেশী

নদীর তৃষায় জানি মেঘ যাবে ঝড়ি

মেঘ তিয়াসী হলে?

সুরা পান করি!!

শিল্পী ও সুরঃ জগজিৎ সিং।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ২৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

৯১

ঘুমাও ও-চাঁদ ঘুমাও গো

ঘুমাও ও-রাত ঘুমাও গো

আমরা দুজন আজকে রাতে থাকবো শুধু জেগে!

রাতের পাখী দোহাই তোমায় এবারে চুপ করে

দখিন বাতাস অনেক হলো এবার ঘুমিয়ে পড়ো

আজ আমাদের চোখের পাতা কাঁপবে আবেশ লেগে!

বুকের কথা বুকেই থাকো আর এসোনা মুখে

কিনা কথার কথা এখন বলবো মনের সুখে

আমরা জাগি না-ঘুমানোর স্বপ্নের-ই আবেগে!!

শিল্পী: কুমার শানু।। সুর: অরূপ-প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩১৫)

৯২

বহুদূর থেকে এ কথা

দিতে এলাম উপহার

তুমি যে আমরা ওগো তুমি যে আমার!

আমার দুচোখে জ্বালো

তুমি যে নতুন আলো

যে দিকে তাকাই আমি দেখি তাই

তোমাকেই শুধু বারবার!

আমার মাটির ভূমি

স্বর্গ করেছো তুমি

ভরে গেলো মন ভরলো জীবন

চাইনাতে কিছু আর!!

।। শিল্পী: কিশোর কুমার।। সুর: গৌতম বসু।। ছবি: হীরক জয়ন্তী।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯ : ৩১৭)

Dhaka University Institutional Repository

৯৩

পূজার থালায় ভরা ছিল অঞ্জলি

কণ্ঠেতে ছিল যে মণিহার আমার

সহসা তাকিয়ে দেখি হয়ে গেলো আজ একি

মালাটি গলায় দোলে তোমার!

আমি প্রাণের প্রণামে তোমার চরণ ধরি

সরায়োনা তুমি যেন তারে

তুমি এলে আঁধারে প্রথম সূর্য হয়ে

সোনা রঙ আলোরই বাহারে!

আমি নিজেকে লুকাতে নিজেকে প্রকাশ করি

দোষ হলে ক্ষমা করে নিও

দূর হতে তোমাকে দেখি যেন সারাদিন

শুধু এই অনুমতি দিও!!

।। শিল্পীঃ অনুরাধা পাড়ওয়াল।। সুরঃ অজয় দাস।।ছবিঃ অভিমান।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯:২০৬)

৯৪

কতো যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি

কতো পথ হলাম যে পার

তোমার মতন এ্যাতো অপরূপ সুন্দর

কাউকে তো দেখিনি গো আরি

প্রিয়তমা মনে রেখো অনুপমা মনে রেখো!

হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে ওই কাশফুল

উড়ে যায় আঁচল যে ওড়ে এলো চুল

আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়ায়

পথ চলো প্রিয়া যে আমার

অনেক দেখেছি তবু তোমার ও মুখখানি
সাধ হয় দেখি গো আবার!
সোনায় সোনায় মোড়া নীল নীলাকাশ
শান্ত দীঘির জলে খেলে রাজহাঁস
কাজলা চোখের মিষ্টি চাওয়ায়
ছবি আঁকো প্রিয়াযে আমার!
অনেক দেখেছি তবু এ-সবুজ বাংলাকে
সাধ হয় দেখি গো আবার
তোমার মতন এ্যাতো অপরূপ সুন্দর
কাউকে তো দেখিনি গো আর!!

।। শিল্পী: কুমার সানু।। সুর অরূপ-প্রণয়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯:২৯৪)

৯৫

বাঙালি কাঙালি নয় জিয়ন রসের কারবারী
নিজের মুখের ব্যাঞ্জনে সে সাজায় পরের তরকারী
বাঙালি যতো না খায় তারো যে বেশি খাওয়ায়
আয় আয় আয় খাবি আয় দ্বার খুলেছে ভাণ্ডারী!
বাঙালির পিছে পায়েস খেয়ে যা করে আয়েস
গা-গতোর শক্ত হবে নিমেষে কমবে বয়েস
বাঙালির মুড়ির মোয়া গুড়পাটালির স্বদ ভারী!
বাঙালির ভাপা ইলিশ আহারে আস্তে গিলিস
কচু শাক মাছের মাথার ঘন্টোতে ঢেঁকুর তুলিস
সে মরুক লাল দই যে খায় নি কোথাও এক হাঁড়ি!
বাঙালির পাবদা মাছে ঝালেতে যাদু আছে
একবার চাখলে দাদা আসবে রোজ-ই কাছে

বাঙালির লেডিকেনির পরনে তাই লাল শাড়ি!

বাঙালির সন্দেশ আর বাঙালির রসোগোল্লার

চরণে লুটিয়ে পড়ে দুনিয়া এক কোটিবার

না–খেলে বাংলা পানের দুটো খিলি ঝকমারী!!

শিল্পীঃ মিঠুন চক্রবর্তী।। সুরঃ বাবুল বসু ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯ঃ ৩০১)

৯৬

শুধু একটা শহীদ ক্ষুদিরাম

লক্ষ বছর ধরে একটা জাতিকে দেয়

শ্রেষ্ঠ জাতির শিরোনাম!

ও বাঙালি ক্ষুদিরাম ক্ষুদিরাম

প্রণাম তোমায় প্রণাম!

স্বাধীনতার ওই সূর্য তোরণে

তোমার প্রাণের আলো

ধুয়ে দিয়ে গেছে রক্ত শিখায়

অনেক আঁধার কালো

অন্ধ যারা দ্যাখো না তাকে ইতিহাস শুধু নীরবে লেখে

সূর্যের অক্ষরে তোমারই নাম!

হাসি মুখে ফাঁসি গলায় পরে যে

পথের নিশানা দিলে

সেই পথে চলে যারা ভুলে যায়

এ-পথ তুমিই দ্যাখালে

তাদের ক্ষমা করবো না তো শোধ দিতে কেউ পারবো না তো

মরণের ভাঙা হাটে জীবনের দাম!!

শিল্পীঃ মিঠুন চক্রবর্তী।। সুরঃ বাবুল বসু ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯:৩০১)

৯৭

বাঙালির গড়া এই বাংলা

শস্য সবুজ এই শ্যামলা

আজ কেন হয়ে গেল ক্যাংলা

যদি প্রশ্ন করে ধীর নেতাজী

কি তার জবাব দেব আমরা?

আমাদের বিণয় বাদল

দীনেশ বাঘা যতীন

রক্তে রাঙা এই ঝাণ্ডা

মহীয়ান হোক চিরদিন

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির রক্ত

ইতিহাসে হোক আরো অমলিন!

লক্ষ শহীদের খুনে

ভেজানো এই যে মাটি

জগতের যতো সোনা আছে

সকলের চাইতে খাঁটি

যে বাঁশের লাঠি ভাঙে অনাচার অবিচার

হুঙ্কার দিক সেই লাঠি!

শিল্পীঃ মিঠুন চক্রবর্তী ।। সুরঃ বাবুল বসু ।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯:৩০২)

98

ঢাকা থেকে ইলিশ আনলাম মশলা কোলকাতার

ভোজ আমাদের জমবে ভালো লাগবে মজাদার।

বর্ধমানের মিহিদানা

বগুড়া জেলার টক্ মিঠা দই

আরামবাগের মিষ্টি আলু

তেল ভরা ওই যশুরে কই

এক থালাতে মিলেমিশে হবে একাকার!

দার্জিলিঙের কমলালেবু

সিলেট জেলার লাল আনারস

মালদার আম নাম ফজলি

খুলনার গুড় রস টস্ টস্

এমন খাবার দুনিয়াতে নেই যে কোথাও আর।।

শিল্পীঃ আদিত্য নারায়ণ।। সুরঃ বাবুল বসু।। ছবিঃ রাজা রানী বাদশা।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯: ২/৩)

৯৯

আমায় একটু জায়গা দাও

মায়ের মন্দিরে বসি

আমি অনাহূত একজন অনেক দোষেতে দোষী।

আমি সবার পিছনে থাকবো

শুধু মনে মনে মাকে ডাকবো কারো কাজে বাধা হলে

সাজা দিও যতো খুশি! ভেবোনা হঠাৎ
সামনে এগিয়ে মায়ের চরণ ছুঁয়ে দেবো

দূর থেকে শুধু চোখের জলেতে

মার রাঙা পা ধুয়ে দেবো;

শুধু আরতি যখন করবে

মার পূজা দীপ তুলে ধরবে আমাকে দেখতে দিও

মায়ের একটু হাসি!!

শিল্পীঃ মান্না দে।। সুরঃ মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪০৯:৩৯/১৯)

Dhaka University Institutional Repository

১০০

যখন এমন হয়

জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা

ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই

রেলের লাইনে মাথা রাখি

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টা কি

মাগো সে কি তুমি

লাঞ্জনা শুধু লাঞ্জনা

স্বজনের কটু গঞ্জনা

দিন রাত শুনে নে যখন

সারাটি গায়ে আগুন লাগে

যখন ভালোবাসা

বহু পথ ধুয়ে

চলে যায় দূর থেকে দূরে

বন্ধুর দরজায় যত কিছু করাঘাত

যায় বিকলে।

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি বললি টা কি

মাগো সে কি তুমি ।।

সে কি তুমি মা।।

সুর ও শিল্পী: মান্না দে।।

(উৎস: ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

Dcmsnvi

চল্লিশের দশক হতে আশির বাংলা আধুনিক গানের এক স্বর্ণ যুগ। তাই হারানো দিনের গান শুনতে গিয়ে আমরা বারবার এই কালখণ্ডের মধুর গীতসুধায় সিক্ত হই। এই সময়ের অনেক গানই হারিয়ে যায় নি, বরং শ্রোতা হিসেবে আমরা কালজয়ী কিছু গানের সুর ও বাণীর রাজ্যে হারিয়ে যাই। গানের বাণী আমাদের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে অন্তরের অন্দরমহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাতে কণ্ঠশিল্পীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকলেও গীতিকার ও সুরকারের অন্তর্গত সৌরভ ও সমৃদ্ধি বিষয়ে সচেতন পাঠক-শ্রোতার আগ্রহ তৈরি হওয়া অসম্ভব কিংবা অসঙ্গত নয়। একটি সফল গানে গীতিকার-সুরকার-শিল্পীর মধ্যে কার ভূমিকা অধিক সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তর্কবিতর্কের আড়ালে কারো অবদানই হারিয়ে যায় না বলে আমরা মনে করি।

গীতিকার সুরকার আর শিল্পী– এই ত্রয়ী স্রষ্টার সফল সম্মিলনে বিশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে আশির দশকে বাংলা গান যে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছিল বলেই এই সময়ের গানে আমরা খুঁজে পাই বাঙালির চিরকালীন আনন্দ-বেদনার চলচ্ছবি।সংগত কারণেই তৎকালীন বাংলা আধুনিক গান হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সুমিষ্ঠ, আবেগঘন মর্মস্পর্শী ও প্রাসংগিক। ঐ গানগুলো তৎকালীন সময়ে যেমন প্রতিটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিল, তেমন আজকের দিনেও সমানভাবে আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়। তাই এই সময়ের গানগুলোকে আমরা 'হারানো দিনের গান' না বলে 'চিরদিনের গান' বা 'চিরকালের গান' বলাই যথার্থ বলে মনে করি। বংলা গানের স্বর্ণ যুগে গান রচনার ক্ষেত্রে যে সকল গীতিকারের পরিচয় মিলে, কিংবা বলা যায়, বাংলা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের গান যে সব গীতিকারের হাতে প্রাণ পেয়েছিল তাঁরা হলেন -সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২), হীরেন বসু (১৯৩০-১৯৮৭), শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৬৩), অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩), বানী কুমার (১৯০৭-১৯৭৪), সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪), অনিল ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৪৪), গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬), প্রণব রায় (১৯১১-৭৫), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) , জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), মোহিনী চৌধুরী (৯১৯২০-১৯৮৭), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭), সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৫), অনল চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮-) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা বাংলা আধুনিক গানকে কবিতার ঐশ্বর্য দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের পর বাংলা সংগীতের আকাশে ব্যতিক্রমী এক শিল্পমূল্য সৃষ্টি করে বাংলা আধুনিক গানকে এই দুই গীতবাণীর স্রষ্টা যে জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন তা বাংলা আধুনিক গানকে এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা যেমন তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বিস্মিত হই, তেমনি তাঁদের প্রকরণ পরিচর্যার শৈল্পিক মাধুর্যও আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তাঁরা পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, ও স্বদেশপ্রেমের আশ্রয়ে একদিকে যেমন তাঁদের গানকে বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি প্রকরণ পরিচর্যায়ও রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গানে অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, প্রতীক ইত্যাদি অলঙ্কারের শিল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে গীতবাণীকে করেছেন কাব্যময়; যা শিল্প বিচারের মাপকাঠিতে হয়ে উঠেছে যুগোত্তীর্ণ।

কবিতার অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজন কবি যতো বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকার সংগত কারণেই ততো স্বাধীন নন। কারণ গীতিকার তাঁর সৃষ্টিকর্মকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনে সুরকার ও শিল্পীর অভিপ্রায়কে মূল্য দেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতবাণীর প্রকরণ আলোচনায় অলঙ্কার অনুসন্ধানে আমরা লক্ষ করেছি, অলঙ্কার বাহুল্যে তাঁদের গীতিবাণী কখনোই শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে পড়েনি, আমাদের গৃহকর্মনিপুনা বধূটির মতোই প্রাঞ্জল-চঞ্চল-হাস্যময় তাঁদের শিল্পকর্মের ভাষা যা আপন প্রাণের উচ্ছালতায় অন্যজনের হৃদয়কে একটু স্পর্শই কেবল করে না, প্রবল নাড়াও দিয়ে যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ব্যবহৃত অলঙ্কারে কোন রকম অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় না দিয়ে তা গীতিকবির ভাবকে পাঠক ও শ্রোতার বোধের সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

চিত্রকল্প সৃজনের মাধ্যমে একজন কবি তাঁর অন্তগর্ত সৌন্দর্য তথা শিল্প-সত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক তৈরির প্রয়াস পান। চিত্রকল্পে আমরা কেবল চিত্রের অন্বেষণ করি না, সেই চিত্রের স্রষ্টার চিত্তকেও অনুধাবণ করতে চাই। প্রাকরণিক আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীর অধিকাংশ চিত্রকল্পে তাঁদের প্রকৃতি, প্রেম, বিরহ, সৌন্দর্যচিন্তা এবং জীবন সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গেই তাঁরা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। গীতবাণীকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতেই হয়। তাই চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁরা মানুষের কাছের এবং একান্ত অনুভবের জিনিসকেই গীতবাণীর উপকরণ বা প্রেরণা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সরল ভাষায় অনুভবের নিবিড় পরিচর্যায় তাঁরা তাঁদের ভাবনাকে গ্রথিত করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে শব্দের শক্তি নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দিয়ে ঝর্ণার মতো গান গেয়ে উঠেছে। প্রতীকী অর্থমাত্রায় ঋদ্ধ শব্দাবলি তাঁদের চিত্রকল্পে নতুন মাত্রা এনেছে।

গীতবাণীতে ব্যবহৃত প্রতীকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি প্রতীকের দূরসঞ্চারী আলোক প্রক্ষেপে তাঁদের সৃজনভুবনও হয়েছে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত । তাঁরা প্রতীকের ভেতর ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের বর্ণিল অভিজ্ঞতাকে, যা গভীরতর রহস্যের ধারণ হিসেবে পাঠকের চিন্তা শক্তিকে নানা দিকে নিক্ষেপ করে। গীতবাণীতে তাঁরা অন্ধকার, আকাশ, আগুন, হরিণ, বালুচর, নদী, ভ্রমর, কাটা, কোকিল, চাঁদ, ঝড় ইত্যাদি প্রতীকী শব্দ ব্যবহারে মাধ্যমে মানব জীবনের নানা প্রান্তকে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীক তাঁদের প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সুগভীর উপলব্ধির বর্ণিল প্রান্তরকে চিহ্নিত করেছে।

শিল্পসাহিত্যে পুরাণ কিংবা পৌরাণিক অনুসঙ্গের ব্যবহারে একজন স্রষ্টার ঐতিহ্য সংলগ্নতা চিহ্নিত হয়ে থাকে। পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন কবি যতটা স্বাধীনতা ভোগ করেন, একজন গীতিকারের পক্ষে তা নানা কারণে সম্ভব হয় না। গীতিকারকে বক্তব্যের সরলতা ও সুরের সীমাবদ্ধতা মেনেই শব্দকে সাজাতে হয়। গীতবাণীতে প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনে বিচিত্র অনুসঙ্গ বিধৃত হলেও প্রেমই মুখ্য উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। সেই কারণে প্রেম আশ্রয়ী পুরাণ ও পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্রের অধিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে রাধা-কৃষ্ণই প্রধান পৌরাণিক চরিত্র। তবে আরো নানা পুরাণ আশ্রয়ী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁরা। যেমন ললিতা, বিশাখা, সূর্পর্ণখা, সুখ-সারি, বেহুলা-লক্ষীন্দর, নদের চাঁদ, ইন্দ্র, রাম, ইত্যাদি যা তাঁদের গীতবাণীকে শিল্প সমৃদ্ধ করেছে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতবাণীতে ছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য পদচারণা চোখে পড়ার মতো। অক্ষরবৃত্তই তাঁদের গীতবাণীর প্রধান ছন্দ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতিও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষপাত লক্ষ করার মতো। তাঁদের বিপুল সংখ্যক গীতবাণী মাত্রাবৃত্তে রচিত। মাত্রাবৃত্তের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে পাঠক শ্রোতার কল্পনা প্রতিভা যেমন আন্দোলিত হয়েছে, তেমনি মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে অভিনবত্ব। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরবৃত্তের সুর লঘু হলেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরবৃত্ত ছন্দের গীতবাণী নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে ধারণ করেছে। তাঁদের স্বরবৃত্তে আড়ষ্ঠতা নেই বলেই সকল বিষয়কেই তা গতি দিতে পেরেছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছন্দের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে গীতবাণী সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন বলেই তাঁদের গীতবাণী পাঠে আমরা কবিতা আস্বাদনেরই আনন্দ লাভ করি।

জীবনের রূপ চিরন্তন সত্য নিয়ে প্রবাহিত হয় চরম উপলব্ধিতে। তাই মহান স্রষ্টা কখনোও অতীত বা সমাপ্তিতে মুছে যায় না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দিন মুছে যাবেন না। তাঁদের অন্তরতম উপলব্ধি ছিল, জীবন থেকে কিছুই বাদ দেওয়া যায় না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নবযাত্রা। সত্যর সন্ধানে তাঁদের জীবন দর্শন ঘটেছে। মন যেখানে উদার উন্মুক্ত, সেখানে সময়ের কোন ভাগাভাগি নেই।

মানুষ তাঁর অস্তিত্বের বিকাশ ঘটায় প্রকৃতি পরম্পরা ও বর্তমানকে নিয়ে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিধারার সমন্বয়ে তাঁদের মনের অভিব্যক্তিকে রূপায়িত করেছেন। বৈচিত্র্য আর নৈপুণ্যে ভরিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিকে। সে রত্ন অন্বেষণে রত্ন মিলবে-এ বিশ্বাস আমাদের অন্তরের। বাংলা গীতিসাহিত্যে যাঁদের নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর, সৃজনশীল এবং সমসাময়িক কালের স্পন্দনকে ধারণ করেই কালজয়ী শিল্পস্রষ্টা। তাঁদের গানের বাণী এবং সৃজনপ্রতিভা পর্যালোচনা করে আমরা উপলব্ধি করেছি, তাঁদের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, আবার কিছু কিছু বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধায় হলেন একই বৃন্তে বিকশিত দুটি কুসুম। আর এঁদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কিংবদন্তী শিল্পী মান্নাদে। বাংলা আধুনিক গানের অন্যতম রূপকার ও বাণী স্রষ্টা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে শিল্পী মান্নাদে'র উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁদের শিল্প জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মান্নাদে ১৯৫৩ সালে তাঁর জীবনের প্রথম বাংলা আধুনিক গান 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বলো' এবং 'হায়-হায় গো রাত যায় গো' গান দুটি গেয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্নের কথায় এবং বাংলা প্রথম চলচিত্রের গান ' অমর ভূপালীর 'কথাও ছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। পরবর্তীকালে গৌরীপ্রসন্নের অসংখ্য আধুনিক ও চলচিত্রের গান মান্নাদে তাঁর কন্ঠে ধারণ করেন। পক্ষান্তরে ১৯৬০ সালে মান্নাদে প্রথম পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান 'আমার যদি না থাকে সুর' এবং 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই' গান দুটি গেয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মান্নাদের জীবনের সিংহভাগ গানের কথা লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতশাস্ত্রে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মান্না'দে বুঝতে পেরেছিলেন যে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন এই দুই সংগীতস্রষ্টার মধ্যে যদি একটি সুন্দরের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা যায় তবে তা বাংলা আধুনিক গানের বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে একটি ইতিবাচক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, যা বাংলা সংগীতের জন্য অভূতপূর্ব সুফল বয়ে আনবে। কার্যত তাই-ই হয়েছে। যখনই গৌরীপ্রসন্ন একটি ভাল গান লিখতেন, তাঁর জবাবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি ভাল গান লেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। গৌরীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটতো। তখন সুন্দরকে সৃষ্টি করার এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কিছু ভাল গান। এ প্রসঙ্গে শিল্পী মান্নাদে'র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতির স্মরণ নেওয়া যাক।

> গীতিকার হিসেবে গৌরীবাবু এবং পুলকবাবু দু'জনের দক্ষতাই প্রশ্নাতীত। তাই দু'জনের গান লেখার মধ্যে যদি একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা এনে দেওয়া যায়, তা হলে বাংলা গানের পক্ষেই তা আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। তাই গৌরীবাবুকে বললাম ওইরকমভাবে। আর সেই প্রতিযোগিতার প্রভাবেই গৌরীবাবু

> প্রথমে লিখছেন- 'ওগো বর্ষা তুমি ঝরো নাকো অমন করে'। তার উত্তরে পুলকবাবু প্রথমে লিখলেন- 'তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার'। আবার গৌরীবাবু লিখলেন- 'যদি কাগজে লেগো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে'। তার উত্তরে আবার পুলকবাবু লিখলেন- 'আমার ভালবাসার রাজপ্রাসাদে'। (মান্নাদে ২০০৫ : ২০৩)

গান লেখার ব্যাপারে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনই ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মান্নাদের উদ্ধৃতি থেকে আমরা এই সত্যের প্রমাণ পাই : 'গৌরীবাবুর সঙ্গে সে-সময় একটা সুন্দর বোঝাপড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। গৌরীবাবু সিনেমার পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং কে গাইছেন, কে লিপ দিচ্ছেন এ-সব বুঝে নিয়ে এত সুন্দর গান লিখে ফেলতেন যে ভাবা যায় না। এই একইভাবে বাংলা আধুনিক গানও তিনি এত ভাল করে লিখতে পারতেন, যে সত্যি বিস্ময়কর।' (মান্নাদে ২০০৫: ১৯২)। আবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মান্নাদে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'গান লেখার ব্যাপারে পুলকবাবুর প্রতিভার কোনও সীমা ছিল না। যে-কোনও অবস্থার মধ্যে, যে-কোনও পরিস্থিতি বা সেন্টিমেন্টের গান পুলকবাবুকে একটু ধরিয়ে দিলেই, উনি তাঁর থেকে লিখে দিতে পারতেন অপূর্ব সব গান। ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথা থেকেই উনি অসাধারণ সব গান লিখে ফেলতে পারতেন।' (মান্নাদে ২০০৫ : ১৯৬)। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের বিষয় বিশ্লেষণে আমরা উভয়ের গানেই প্রেম, প্রকৃতি, পূজা ও স্বদেশ এই চারটি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করি এবং এর মধ্যে দু'জনই প্রেমের গান মূলত বেশি লিখেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক দুজনেরই দেশের গান রচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য এই যে, সাধারণত আমরা দেশকে মায়ের মূর্তিতে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম দেশকে প্রেয়সীর মূর্তিতে নির্মাণ করলেন এভাবে– 'কত যে সাগর নদী, পেরিয়ে এলাম আমি কত পথ হলামও যে পার/তোমার মত এত অপরূপ সুন্দর কাউকে তো দেখিনিতো আর/ প্রিয়তমা মনে রেখ, অনুপমা মনে রেখ।'(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ২৯৪) পৌরাণিক চরিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা দু'জনই মূলত রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রের আশ্রয়ের তাঁদের সময়ের মানুষের অন্তগর্ত প্রেম সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গীতবাণীতে গৌরীপ্রসন্ন লিখেছেন, 'ললিতা গো বলে দে, কোন পথে গেল শ্যাম?। বিশাখা গো বলে দে কোন পথে গেল শ্যাম? মূরলীর ধনি তার, আমারে ডাকে আর, আর তো শুনি না রাধা নাম।' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২: ১৩৯) আবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ললিতা গো, ওকে আজ চলে যেতে বল, ও ঘাটে জল আনিতে যাবনা যাবনা, ও সখি অন্য ঘাটে চলনা।' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ৬৭) এখানে ললিতা চরিত্র শ্রীমতি রাধার ষোলশত গোপীদের অন্যতম পৌরাণিক চরিত্র।

এক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণ ব্যবহারে তাদের স্বাতন্ত্য লক্ষ করা যায়। যেমন রামায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সূর্পণখা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতবাণীতে এই চরিত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি শ্লেষাত্মক ইংগিত প্রদান করেছেন, লোভী দোকানদারের কবলে পড়ে খদ্দেরের কি বেহাল অবস্থা হয় তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে এভাবে- 'সূর্পণখার নাক কাটা যায় উই কাটে বই চমৎকার, খদ্দেরকে জ্যান্ত ধরে গলা কাটে দোকানদার।' সূর্পণখা চরিত্রটি পুলকের প্রাণের স্পর্শে লাভ করেছে ভিন্নতর মাত্রা। এভাবেই গৌরীপ্রসন্ন ও পুলকের গানে পুরাণের চরিত্রসমূহ লাভ করেছে অভিনবত্ব ও গভীরতর ব্যঞ্জনা।

গৌরীপ্রসন্ন ও পুলক দুজনেই অনেক উঁচু মানের গীতস্রষ্টা। তাঁদের রচিত গান আমাদের বাংলা গানের ভাণ্ডারকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে, এ দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে দুজনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এই যে প্রকাশ ভঙ্গির দিক দিয়ে গৌরীপ্রসন্নের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল অথচ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ যেমন– 'এই মেঘলা, দিনে একলা, ঘরে থাকে নাতো মন, কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ৯৬), 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু, কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৯২ : ২০২)। আবার পুলকের ভাষা অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর, কাব্যময় এবং অত্যন্ত শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। যেমন– 'কি দেখলে তুমি আমাতে, কত সহজ এ-কথা জানানো কত যে কঠিন কী দেখেছি আমি এ-কথা তোমাকে বোঝানো!' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১৪০), 'আমার ভালবাসার রাজ প্রাসাদে নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে আমার মনের ময়ূর মরেছে ওই ময়ূর মহলেই দেখি শুধু মুকুটটাতো পরেই আছে রাজা শুধু নেই' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯: ১০৬)। এরকম অসংখ্য গান খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে একই বিষয় কখনো কখনো দুজনকে আলোড়িত করলেও তাঁদের দুজনের প্রকাশভঙ্গি এবং অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে বিপুল পার্থক্য চোখে পড়ে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গীত-বাণী রচনায় প্রকরণ-পরিচর্যায় যেমন যত্নশীল থেকেছেন, তেমনি গানের কথায় সার্থকতার সঙ্গে কবিতার দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা ও সঙ্গীতের অন্তর্ভেদী অনুরণন সম্পন্ন করেছেন। সুন্দরের আহ্বানে তাঁরা যেমন সাড়া দিয়েছেন, অসুন্দরের আঘাতেও মুখ ফিরিয়ে নেন নি কখনো। তাই গানের বাণী এই গীতস্রষ্টাদ্বয়ের জীবনার্থের স্মারক হয়ে উঠেছে। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে তাঁরা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সঙ্গীতে জীবনবীক্ষার প্রকাশে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো তাঁদের পরিশীলিত রুচির সঙ্গে আপোষ করেননি। এমন কোনো গানের বাণী তাঁরা রচনা করেননি যে গানটি চোখে পড়ার মতো দুর্বল বা নিম্নমানের। গানে তাঁরা প্রাণের চেয়ে পাণ্ডিত্যকে কখনোই প্রাধান্য দেননি বরং শিল্প-প্রতিভার বিকাশে একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর মতোই শিশুর সরলতায় খেয়ালিপনার প্রভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই তাঁদের গানের বাণী কোন আরোপিত ভাব বা অনুভবের ভারে শ্লথগতি হয়ে পড়েনি। যে গতিশীলতা জীবনের সজীবতানির্দেশক, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গীত-বাণীতে সেই গতিই গভীরতর ব্যঞ্জনায় বিকশিত হয়েছে। তাই বাংলা গানের ইতিহাসে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দুই শিল্পপ্রতিভার জন্য অক্ষয় আসন রচিত হয়ে গেছে। শিল্পসাহিত্যের কিংবা সারস্বত-সাধনার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, ইতিহাসের চেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মানুষের হৃদয়। বাঙালি পাঠক-শ্রোতার অন্তরের গভীরতর প্রদেশে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস সোনার হরফে লিপিবদ্ধ থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

MšcÄ

K. gjMš

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচনা সংগ্রহ-১. (সম্পাদক : শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার), গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : গৌরীপ্রসন্ন গীতিসমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, অসীমা প্রকাশনী. কলকাতা, ২০০৩

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার প্রিয় গান, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৯

L. mnvqK Mš

অনুপ ঘোষাল : গানের ভুবনে, প্রকাশক- শ্রী দেবব্রত কর, কলকাতা, ১৪০৮

আবদুল মান্নান সৈয়দ : ছন্দ, প্রথম প্রকাশ, অবসর প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ২০০১

আবু সয়ীদ আইয়ুব : পান্থজনের সখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

ইসরাফিল শাহীন : পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

করুণাময় গোস্বামী : রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড- দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১

জয়ন্তী ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২

জয়ন্তী গঙ্গোপাধ্যায়	:	তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৯
জীবনানন্দ দাশ	:	কবিতার কথা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা-২০০২
তারেক রেজা	:	কবিতা : কালের কণ্ঠস্বর, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯
	:	সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০
	:	কবিতার মন-মর্জি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১২
	:	রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	:	বাংলা ছন্দ বিকাশ, রূপ ও রীতি, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৩
নরেন বিশ্বাস	:	অলঙ্কার-অন্বেষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কালিকলম, ঢাকা, ১৯৮৮
নীলা গোস্বামী	:	নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকার, প্রকাশক-শ্রীমতি গৌরী চক্রবর্ত্তী, কলকাতা, ২০০৫
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	:	কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ২০০৭
প্রবোধচন্দ্র সেন	:	ছন্দ পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭
প্রথম চৌধুরী	:	প্রবন্ধসংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮
বরুণকুমার চক্রবর্তী	:	গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা ২০০৩,

বলরাম মণ্ডল : পুরাণ বিচিত্রা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩

বর্ণিক রায় : প্রতীক অরণ্য, প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা, ১৯৭৬

: কবিতা : চিত্রিত ছায়া, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৮

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র-স্মৃতি [সম্পা. বিশ্বনাথ দে], ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬১

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : কবিতায় বাকপ্রতিমা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ : নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংরা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

: বাংলাদেশের সাহিত্য, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯

বুদ্ধদেব বসু : স্বদেশ ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০ শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (অনুবাদ গ্রন্থ), প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

: আধুনিক বাংলা কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৩

: কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯

বেগম আকতার কামাল : বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

মান্না দে. : জীবনের জলসা ঘরে, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ২০০৫

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : হারানো দিনের গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

	:	ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
	:	পঞ্চ-গীতিকবির গান, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০০
ক্ষুদিরাম দাস	:	বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪
মঞ্জুভাষ মিত্র	:	আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৬,
মাসুদুজ্জামান	:	বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩
মাহবুব সাদিক	:	বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১
	:	কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	:	বাংলা কবিতার ছন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৯
রফিকউল্লাহ খান	:	বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪
	:	সাহিত্যের পথে, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৮৮
	:	বিচিত্র প্রবন্ধ, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৯

	:	ছন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক-প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬
	:	রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম-সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬
	:	গীববিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭১
রাজ্যেশ্বর মিত্র	:	রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, [সম্পাঃ পুলিনবিহারী সেন], বাক্-সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৬৮
রূপায়ণ ভট্টাচার্য	:	হৃদয়ে লেখো নাম মান্না, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০
শঙ্খ ঘোষ	:	শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২
	:	ছন্দের বারান্দ, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭
	:	নিঃশব্দের তর্জনী, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাসম কলকাতা, ১৩৭৮
	:	এ আমির আবরণ, প্যাপিরাসম কলকাতা, ২০০৮
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	:	উপমা কালিসাদস্য, ন্ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৩
শান্তিদেব ঘোষ	:	রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫
শাজাহান রহমান	:	বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
শাজাহান ঠাকুর	:	বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ প্রথম পুনর্মুর্দ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
শিখা দত্ত	:	আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০২

শ্যামলকুমার ঘোষ : কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ, বইঘর, কলকাতা, ১৩৯৪

শ্রীশচন্দ্র দাশ : সাহিত্য-দন্দর্শন, চতুর্থ সংস্করণ পুনমুর্দ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৯২

সরকার আমিন : বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪

: কবিতার কালান্তর, সান্যাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬

সাঈদ-উর-রহমান : পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অনূদিত) : সঙ্গীতে সুন্দর (মূল : এডুয়ার্ড হ্যান্‌স্‌লিক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : পৌরাণিক অভিধান, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২

সুধীর চক্রবর্তী : আধুনিক বাংলা গান, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯৪

: বাংলা গানের সন্ধানে, অরুণা প্রকাশনী,কলকাতা, ১৩৯৭

: গান হতে গানে, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অক্ষরে অক্ষরে, দ্বিতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৮৪

	:	কবিতার বোঝাপড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩
	:	কেন লিখি, (সম্পাদিত, প্রণব বিশ্বাস সহযোগে), প্রথমমিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিমার্স,কলকাতা, ২০০০
সুমিতা চক্রবর্তী	:	আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৬
	:	আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতয় পর্যায়, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২
সুশীল কুমার রুদ্র	:	বাংলা ছন্দের রূপ ও তত্ত্ব, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ২০০২
সৈকত আসগর	:	বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক, বাংলা একাডেমি একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩
সৈয়দ আকরম হোসেন	:	বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
সৈয়দ আলী আহসান	:	কবিতার রূপকল্প, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯
	:	কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, বইঘর চট্টগ্রাম, ১৩৭৫
	:	আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭০
স্তেফান মালার্মে	:	সাহিত্য ও সঙ্গীত (অনুবাদক : হারুন-উর রশিদ : তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০
হুমায়ুন আজাদ	:	আধার ও আধেয়, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

M. mnvqK Bs‡iwR Mš

C.D. Lweis : The Poetic Image, Jonathan Capc, London, 1968

C.M. Bowra : The Haritage of Symbolism, Macmilan & Co. London, 1977

Herbert Read : Collected Essays in Literary Criticism, 2nd cdition, Reprinted, MCMLiv. Faber & Faber Ltd. London, 1950

I.A. Richards : Practical Criticism, Pclican Books, London, 1960

Lillian Feder : Ancient Myth in Modern Poetry, Princeton University Press. Princeton, 1971

M.H. Abrams : A Glossary of Literary Terms, Reprinted, Macmilan Indian Limited, New Delhi,. 1997

Stephan J. Brown : The World of Imagery, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London. 1927

Stephen Spender : The Struggle of the Modern, University Paperbacks, London, 1965 William J. Handy &

Max Westbrook [ed.] : Twentieth Century Criticism: The Major Statements, Indian Edition, Light & Life Publishers. New Delhi, 1976

N. cÎcwÎKvq cKwkZ mnvqK-ceÜ

জীবেন্দু রায় : আধুনিক কবিতার নানা প্রসঙ্গ, আলোক আসর, ৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯০, কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ : 'কবিতা বিচার', ঐকতান, সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, কলকাতা